হয়ে ওঠা গান

কবীর সুমন

সপ্তর্ষি প্রকাশন

দ্বিতীয় সপ্তর্ষি প্রকাশ | মে, ২০১২
সপ্তর্ষি প্রকাশ | জানুয়ারি, ২০১১
গ্রন্থস্বত্ব | কবীর সুমন
প্রচ্ছদের ছবি | বিবেক কুণ্ডু

শব্দগ্রন্থন | এইম, ৯৮৩৬৭ ৬৭৫৪৫
প্রকাশক | স্বাতী রায়চৌধুরী
সপ্তর্ষি প্রকাশন
৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট,
কলকাতা-৯
মুদ্রক | সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র | ৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ও যোগাযোগ | চলমান ৯৮৩০৩ ৭১৪৬৭
ই-মেল saptarshiprakashan@hotmail.com
ওয়েবসাইট www.saptarshiprakashan.com

সপ্তর্ষির বই পাবেন | দে'জ, দে বুক স্টোর, বুকফ্রেন্ড
চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জী, নব গ্রন্থকুটির, বলাকা (কলেজ স্ট্রিট)
প্রান্তর (বেনাচিতি মার্কেট, দুর্গাপুর)
সেন্ট্রাল বুক হাউস, বুকস্ (শিলিগুড়ি)
পুস্তক মহল (ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন)
মুক্তধারা (গোলমার্কেট, নিউ দিল্লি-১)

দাম | ২০০ টাকা

ভূমিকা

[illegible] গুঠা গান' আমার সাংগীতিক আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব। এটি লিখেছিলাম [illegible]কাল পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অশোক দাশগুপ্তর অনুরোধে ১৯৯৩ সালে, [illegible]কাল শারদীয় সংখ্যার জন্য। ১৯৯৪-এর কলকাতা বইমেলায় সেটি বই আকারে [illegible]শ করেছিলেন আজকাল।

সপ্তর্ষি প্রকাশন বইটি আবার প্রকাশ করছেন।

আধুনিক বাংলা গান, সামগ্রিক ভাবে বাংলা গানের যে দশা এবং বাংলা [illegible] সম্পর্কে অনেক (অন্তত) শহুরে বাঙালির যে মনোভাব ও রকমসকম এখন [illegible]তে পাই, শুনতে পাই, তাতে মাঝেমাঝেই মনে হয় আমি বোধহয় প্রাগৈতিহাসিক [illegible]গের মানুষ, বাঙালি। গান গাওয়ার আগে গান নামে জিনিসটি যে শেখা দরকার, [illegible]লা নামে একটি বস্তু যে তৈরি হওয়া দরকার, আজকের অনেক বাঙালি যেন [illegible] তা মানতেই চাইছেন না। মাপকাঠি বলতে আর কিছুই নেই। গত শতাব্দীর (কথাটা বললেই মনে হয় কত যুগ আগেকার কথা বলছি) আটের দশক অবধি অন্তত আকাশবাণী ছিল এক সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি। তার মানে এই নয় যে আকাশবাণীর অডিশনে (বেতার-প্রচার-যোগ্যতা পরীক্ষা) সব সময়ে সব পরীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করা হত অথবা কোনো কারচুপি কখনোই হয়নি। কথাটা হল, আকাশবাণীর অডিশন বোর্ডের পরীক্ষকরা যদি সাত দশক ধরে তাঁদের দায়িত্ব মোটের ওপর পালন না করতেন, অযোগ্য কণ্ঠ ও গায়কির অধিকারীদের যদি পাস করিয়ে দিতেন, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের যদি সুযোগ না দিতেন তাহলে দীর্ঘকাল ধরে যে অসামান্য কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীদের সংগীত আমরা আস্বাদন করতে পেরেছি তাঁদের আমরা পেতামই না। গ্রামাফোন রেকর্ড করতে গেলেও অন্তত আকাশবাণীর বি-হাই গ্রেডের শিল্পী হতে হত। চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাক যাঁরা করতেন তাঁরাও সকলেই ছিলেন উঁচুমানের বেতারশিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। এইভাবে কণ্ঠ ও গাওয়ার ভঙ্গির দিক দিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য মান বজায় থাকত।

গ্রামাফোন রেকর্ডের যুগ শেষ হয়ে যেই মিউজিক ক্যাসেটের যুগ এল, আমাদের সংগীতের অনেক কিছুই গেল বেবাক পালটে। চারিদিকে গজিয়ে উঠতে লাগল রেকর্ডিং স্টুডিয়ো। সেখানে গিয়ে টাকা খরচ করলে যে কেউ গান বাজনা রেকর্ড করতে পারবেন, মিউজিক ক্যাসেটে সেই রেকর্ডিং-এর কপি বানিয়ে যাকে ইচ্ছে দিতে পারবেন, এমনকি বিক্রিও করতে পারবেন—এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। এর ফলে রেকর্ডিং-এর এক ধরনের গণতন্ত্রায়ণ যেমন ঘটল, চিরাচরিত

প্রথার বাইরে গিয়ে সংগীত নিয়ে নতুন কাজ করার সুযোগ যেমন নতুন [illegible] ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসার কারণে এল, তেমনি ঘটতে শুরু করল অনাসৃষ্টি। বিশৃঙ্খলা। সংগীত হয়ে পড়ল সামাজিক মাপকাঠিহীন। আকাশবাণীর [illegible] ওয়েভ বেতারে মিউজিক ক্যাসেট বাজানো সম্ভব ছিল না, তাই বেতারে [illegible] ক্যাসেটের গানবাজনা প্রচার পায়নি। কিন্তু পত্রপত্রিকা হয়ে দাঁড়াল ক্যাসেট [illegible] গান ও সেই গানের শিল্পীদের সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচারের মাধ্যম। একই [illegible] দেখা দিল মিডিয়াকে হাত করে অযোগ্য ব্যক্তিদের গাওয়া গানের ক্যাসেট [illegible] প্রচার করার রীতি। চার, পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকেও কোনো নতুন [illegible] বাংলা গানের রেকর্ড নিয়ে কলকাতার ক'টা পত্রিকায় কতটুকু খবর [illegible]। আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীদের নিয়ে বিশ [illegible] তিন থেকে আটের দশকের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সাময়িক পত্রগুলিতে ক'টা [illegible] বেরিয়েছে? ন-এর দশকে কিন্তু দেখা গেল বাংলা পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে [illegible] বেশি লেখালিখি হচ্ছে। এসবের কারণ কী? এই বিষয়ে কোনো গবেষণামূলক কাজ এখনও হয়েছে কি?

উল্লেখযোগ্য : সংগীত সমালোচনা বিষয়টি কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার [illegible] গড়ে ওঠেনি আমাদের দেশে। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে [illegible] কোর্স ও স্নাতকোত্তর কোর্সে সাহিত্য পড়ানো হচ্ছে, ফলে সাহিত্য সমালোচনা [illegible] বিষয়টির সঙ্গেও ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হয়ে উঠছেন। তার মানে এই নয় যে ভালো সাহিত্য সমালোচকের সংখ্যা বেড়েছে আমাদের দেশে। সাহিত্যে বি.এ, এম এ, মায় ডক্টরেট করলেই যে দক্ষ সাহিত্য-সমালোচক হওয়া যায় তা নয়। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে জনসমক্ষে দুম করে কিছু উদ্ভট মন্তব্য করে বসলে কেউ না কেউ হাঁসাহাসি করবেই।

বাংলা ভাষায় উপযুক্ত সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে চলেছে অনেকগুলি। হল। সাহিত্য পত্রপত্রিকাগুলিতে তো বটেই, এমনকি সাধারণ নিউজ ম্যাগাজিনে সাহিত্য ও বই সম্পর্কে আলোচনা থাকে। অর্থাৎ সাহিত্যের সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সংগীত-সাহিত্য সেই তুলনায় কিছুই গড়ে ওঠেনি। ফলে, সাহিত্য সমালোচনার যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, সংগীত সমালোচনায় তা সম্ভব হয়ে উঠেছে : নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচার। ১৯৯২ সালে 'তোমাকে চাই' বেরোনোর পর থেকে কলকাতার একাধিক পত্রিকায় নতুন গান নিয়ে যাঁরা নিবন্ধ লিখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সংগীতে কোনোদিনই কোনো প্রশিক্ষণ পাননি, সংগীত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নিতান্তই সীমিত, অন্তত তাঁদের ধারণা, জ্ঞান ও চিন্তা এমন নয় যার ভিত্তিতে গানবাজনা বিষয়ে রসগ্রাহ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্য করা বা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। ন-এর দশকের প্রথম দিকে বহুল পঠিত একটি পত্রিকায় এক ক্রীড়া সাংবাদিককে দিয়েও পেল্লায় নিবন্ধ লেখানো হয়েছিল। বিষয় : নতুন আধুনিক বাংলা গান। এ থেকে বোঝা যায় ওই ধরনের পত্রিকার মালিকপক্ষ ও সম্পাদকমণ্ডলী বাংলা গানকে কোন চোখে দেখেছেন, কোন কানে শুনেছেন। ওই একই মন নিয়ে তাঁরা কি কোনা কাগুজে পেন্টিং-রিভিউকারিকে দিয়ে ফুটবল বা বক্সিং বিষয়ে বড়োসড়ো নিবন্ধ লেখানোর কথা ভাবতে পারতেন যদি না সেই ব্যক্তি এই দুই বিষয়েও সময়োপযোগী আলোচনা-নিবন্ধ লেখার যোগ্যতা রাখতেন?

এরপর এফ এম বেতার এসে পড়ায় ভুঁইফোড় গানের ক্যাসেট ও পরে সি ডি বাজানোর রেওয়াজটা দাঁড়িয়েই গেল। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানের নামে যথেচ্ছাচারিতা যখন-তখন দিকে দিকে প্রচারিত হওয়ার সুযোগও এসে গেল বহুগুণ বেশি মাত্রায়। মনে রাখা দরকার এই সবই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে সংগীত, সংগীত-আলোচনা এবং সংগীত-আস্বাদনের চরম মাপকাঠিহীন অবস্থায়। বিচার বিশ্লেষণের কোনো মাপকাঠিই আর নেই। আমাদের দেশে সাহিত্য সমালোচনা, নাট্য সমালোচনা, পেন্টিং সমালোচনা, চলচ্চিত্র সমালোচনা তবু নিয়মিত চর্চার আলো-হাওয়া পেয়েছে, যদিও যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা এই ক্ষেত্রগুলিতেও সব সময় হয় না। কিন্তু একটা হিসেবে discipline সংগীত-সমালোচনা আজও স্বীকৃতি পেল না।

কেউ যদি বলেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে পাগলা হাতি মাথা নাড়ে' একটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা এবং জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন'-এর চেয়ে এটা উন্নত বা উৎকৃষ্ট তো কাব্যরসিক ও শিক্ষিত মানুষ তা মানবেন না, সম্ভবত তর্কও জুড়ে দেবেন। ওই ধরনের কথা দাবি কেউ করলে লোকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে বা বেচারিকে করুণার চোখে দেখবে। কিন্তু ওই ধরনের সংগীত বা গানবাজনা সম্পর্কে জোর গলায় বলে ও লিখে দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে কত লোক।

বর্তমানে আমরা সব দিক দিয়েই অতি জটিল, দুর্বোধ্য এক যুগে বাস করছি। মূল্যবোধে দেখা দিয়েছে এমনই ঘাটতি যে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে আমাদের সমাজে বিশেষ-বিশেষ মূল্যবোধই আর নেই। মূল্যবোধহীনতার হাত ধরে কালের পথে হেঁটে চলেছে মগজহীনতা। সংগীত তো সমাজেরই অঙ্গ। সংগীতেও হয়তো সেই কারণেই মগজহীনতার প্রকোপ। যা হোক একটা কিছু করে ফেললেই হল। তার পূর্বাপর কিছু না থাকলেই বা কী যায় আসে।

দুনিয়া পরিবর্তনশীল। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনও। আধুনিক বাংলা গান দীর্ঘকাল মোটের ওপর কিছু ধরাবাঁধা ধাঁচের ছিল। তাতে পরিবর্তন এসেছে। ভাগ্যিস। কিন্তু সংগীতের এক প্রৌঢ় ছাত্র ও অনুরাগী হিসেবে আমার বিনীত প্রশ্ন এই যুগের কাছে, বাংলা গান কী এমন দোষ করল যে সংগীতের,

গানের, গান গাওয়ার কোনো তালিম ও পাঠ না নিয়ে, কিচ্ছু না শিখে, [illegible] সংগীতের বিবর্তন সম্পর্কে, আমাদের দেশের নানান আঙ্গিকের গানবাজনা [illegible] কোনো ধারণা না রেখে, কণ্ঠচর্চা না করে, অতীত ও বর্তমানের গানবাজনা যথেষ্টমাত্রায় না শুনে এবং আত্মস্থ না করে, গান লেখা ও সুর করার [illegible] অনুশীলন না করে স্রেফ অনুপ্রাণিত মনমেজাজ নিয়ে বাংলা গান বানাতে, গাইতে ও বাজাতেই হবে এবং এই আশাও দাবি করতেই হবে যে আমার গানবাজনা শোনো? এই একই মাত্রার প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা নিয়ে কী আমরা, ধরা যাক, হঠাৎ একটা গাড়িতে চালকের আসনে বসে গাড়িটি চালাতে শুরু করার কথা সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবি ও সেই কাজটি করে বসি? ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করি? দর্জি হয়ে লোকের জামা বানাই? ঘড়ি বা টেলিভিশন বা মোটরগাড়ি মেরামতের কাজে হাত দিই? সেলুনে ঢুকে বলা নেই কওয়া নেই কাঁচি আর চিরুনি নিয়ে কারুর চুল কাটতে শুরু করি? এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও নিজে হাতে রেঁধে পুরোদস্তুর মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করে থাকি? পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফার্স্ট ডিভিশন ম্যাচ খেলতে নামি? দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধার বিরুদ্ধে বক্সিং করব বলে রিঙে নেমে পড়ি?

এ হেন যুগে আমার সাংগীতিক আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব 'হয়ে ওঠা গান' কার কেমন লাগবে কে জানে। তাও সপ্তর্ষি প্রকাশন বইটি ষোলো বছর পর আবার প্রকাশ করছেন, আমার ভালো লাগছে।

বিনীত
কবীর সুমন

কথামুখ

'ঠিক যেন পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা।' বাংলা গানে সুমনের আবির্ভাব ও জয়যাত্রাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় সম্ভবত। এই হয়ে ওঠার জন্য সুমনের প্রস্তুতি তো বিরাট বটেই, কিন্তু তা আমাদের অজানা ছিল। প্রস্তুতি ছিল না আমাদের। প্রথমে একটু অপ্রস্তুত জড়তা, তারপর বিস্ময়, তারপর নিঃশর্ত গ্রহণ।

পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যাকে বলে শোচনীয়। চল্লিশোর্ধ্বরা পুরোনো বাংলা গানের সোনাঝরা সান্ধ্য স্মৃতি নিয়ে যে যার নিজের আস্তানায় সুখী। অথবা দুখী। অল্পবয়সিরা বাংলা গান শুনছে না। ওদের মুখে গুনগুন হই হই হিন্দি গান। ইংরেজিও। বাংলা গান যতটুকু, সে তো হিন্দিরই ভাইভাতিজা। সুমন এলেন একেবারে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে। তাজা কথা, সুরেলা গলায় প্রথমে পোড়ালেন ওড়ালেন আবর্জনার পাহাড়, তারপর পালটে দিতে চাইলেন আধুনিক বাংলা গানের ভূগোল আর ইতিহাস। এমনিতেই পথ এবড়োখেবড়ো, তাতে কিছু কাঁটা ছড়িয়ে দেওয়া হল। পা কাটল সুমনের, হয়তো একটু রক্তও ঝরল। আর সেই রক্তেই রাঙা হয়ে চাঙ্গা হয়ে গেল বাংলা গানের বিবর্ণ নিষ্প্রাণ শরীরটা।

নতুন টাটকা, জীবন্ত বাংলা গানের মঞ্চ সুমন প্রায় একাই বেঁধে ফেললেন। শুরুতে স্বভাবতই ছোট, তাতে কোনোরকমে একজনের জায়গা হয়। মাত্র দেড়-দুবছরেই মঞ্চটাকে রীতিমতো প্রশস্ত করে ফেললেন একা সুমন। তাতে অনেকের জায়গা হয়। এই মঞ্চেই একে একে এসে বসলেন কয়েকজন। সুমন যাঁদের কান-মন তৈরি করেছেন, তাঁরা নতুন মঞ্চের নতুন গান শুনতে প্রস্তুত। এমন নয় যে এঁরা সকলেই সুমন-সচেতন। বরং ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে কেউ কেউ জানেনই না কার তৈরি কী মঞ্চে গাইতে বসেছেন। জেনেবুঝে শয়তানি ব্যাপারটাও থাকবে। কিন্তু, নতুন বাংলা গানের মঞ্চ এতখানিই সুমন-মোড়া যে কে কী ভাবল তাতে কিছু যায় আসে না। সুমনের গলা কত সুরেলা, উচ্চারণ কত পরিশীলিত— এসব আলোচনা এখন পুরোনো তাই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সুমন চাটুজ্যের সুর কি সত্যিই একঘেয়ে? এখানে একটু ক্রিকেটের সাহায্য নিতে চাইছি। বোলিং-এ বৈচিত্র্য মানে কি একটা গুডলেংথ, একটা শর্টপিচ, একটা ফুলটস বল? বড় বোলারের সব বলই গ্যালারি থেকে একরকম। সূক্ষ্ম রকমফের বোঝে সে-ই, যে ওই বলের কাছে যায়, খেলে। সুমনের গানের কাছে গেলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের ফুল ছড়িয়ে পড়ে, মালা গাঁথা— সে তো শ্রোতার কাজ। তবু, প্রথমত, দ্বিতীয়ত, শেষ

পর্যন্ত সুমন একজন কবি। একজন মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কী হতে পারে?

ক্যাসেট, ঘরোয়া আসরের বাইরে একবারই সুমনকে দেখেছি, শুনেছি বড় অনুষ্ঠানে। নজরুল মঞ্চের সেই অনুষ্ঠান জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এতখানি আলোড়িত যিনি রাখতে পারেন, সেই হয়ে-ওঠা সুমন শতাব্দীর শেষ দশকে বঙ্গসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঘটনা। 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা'-কে যত্নে সতর্কতায়, আবেগে, ভালোবাসায় ঝকঝকে রাখার চেষ্টা করছি মনে মনে। 'আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু-আনা'।

অশোক দাশগুপ্ত

শৈশবের একেবারে গোড়ার স্মৃতির কি কোনও সুর থাকে? আজ আমার চুয়াল্লিশ ছোঁয়া কানেও এতগুলো বছর পেরিয়ে দু'একটি সুর পৌঁছে যায়। সেইসঙ্গে দু'একটি ছবি। পাঁচের দশকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি তখন হাঁটতে শুরু করেছি সবে। তখনও আমরা কটকে। সেখানেই আমার জন্ম। আমাদের বাসার কোনও একটা ঘরে একখানা মিকি মাউসের ছবি ছিল। কেউ জানত না যে আমি গুটগুট করে সেই ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গলা দিয়ে একটা সুর বের করতাম। ছোট্ট সেই সুর কোনও গানের সুর নয়। ছবিটা দেখতে দেখতে সুরটা আপনা থেকেই যেন গজিয়ে উঠত আমার গলায়। সুরটার সঙ্গে ঐ মজার ছবিটার, আশ্চর্য, কোনও মিল ছিল না। তার কারণ, ছবিটা দেখে আমার মজা লাগত না। কেন কে জানে, মন খারাপ লাগত। গলায় তৈরি সুরটাও আমি তাই টেনে টেনে গাইতাম, প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে। সা, শুদ্ধ রে, কোমল গা, শুদ্ধ রে, সা। এই ছিল সুরটা। আজও মনে আছে। ধীরে ধীরে বারবার গাইতাম।

ঐ ছবি,সবার অলক্ষ্যে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে ঐ সুর গাওয়া— এ ছিল আমার একেবারে নিজের ছোট্ট জগৎ। বাবা, মা, বড় ভাই কেউ জানতই না।

সুরের, গানের যে জগৎটা আমার একার সম্পত্তি ছিল না, সেটা বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া। মনে পড়ে: কটকে এক সন্ধেবেলা তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বাবা হারমোনিয়াম বাজিয়ে মা-র সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছেন 'আজি বারি ঝরে ঝরোঝরো ভরা ভাদরে।' রবীন্দ্রনাথের গান। আমি আর দাদা শুনছি। আর শুনছে জুল্‌জুল্‌, আমাদের একরত্তি কুকুরছানা—আজও চোখ বুজে একটু ভাবলেই দৃশ্যটা ভেসে

ওঠে। বাবা-মার গলা ছেড়ে গাওয়া সেই গানটা বেজে ওঠে। 'তালের বনে থেকে থেকে/ ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।'

হারমোনিয়াম আর রেডিয়োটা ছিল মূল্যবান সম্পত্তি। হাত দেবার অধিকার আমার ছিল না। সেই অধিকার অর্জন করলাম ১৯৫৪ সালে কটক থেকে কলকাতায় এসে। এক লাফে অবশ্যই নয়, ধীরে ধীরে।

কটকে থাকার সময়, অর্থাৎ একেবারে ছেলেবেলায় কী ধরনের গান শুনতে ভালোবাসতাম—এই প্রশ্নটা মা-র কাছে করেছি অনেক পরে। মা বললেন—কাজী নজরুলের 'রিম্‌ঝিম্ রিম্ ঝিম্‌ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে' গানটা নাকি আমার বেজায় প্রিয় ছিল। মাকে নাকি বারবার গাইতে বলতাম। মা অন্য গান ধরলেই আমার প্রবল আপত্তি। শেষকালে মা বাধ্য হতেন অন্য গানগুলোও জোর করে নজরুলের ঐ গানটির সুরে তালে গাইতে। আমি নাকি তখন ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে একটা মোড়ায় তবলা বাজাতে শুরু করতাম মনের আনন্দে।

মা-র কাছেই শুনেছি, তাল ও ছন্দের দিকে অতি অল্প বয়সেই আমার ঝোঁক দেখে গিরীন চক্রবর্তী আমার মাকে বলেছিলেন আমায় সরোদ শেখাতে। তাল ও ছন্দের বোধ সহজাত হলে তো তবলা শিখলেই হয়! সরোদ কেন? কে জানে কী ভেবে বলেছিলেন তিনি কথাটা। তাঁকে তো আর জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। গিরিন চক্রবর্তী গত হয়েছেন সেই কবে। তার অনেক অনেক পরে ১৯৮৬ সালে যখন জার্মানিতে এক ইতালীয় মাস্টারমশাই-এর কাছে পাশ্চাত্যের ক্লাসিক্যাল গিটার শেখা শুরু করলাম তখন একদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল গিরিন চক্রবর্তীর কথাটা। আজ যখন গিটার বাজাই, ছ'টি তারে সুর আর তাল একসঙ্গে তুলে আনতে চেষ্টা করি নাইলন বা ইস্পাতের তারে, বাংলার সেই বিরাট গায়কের কথাগুলো মনে পড়ে যায় বৈকি: 'বৌদি, ছোট ছেলেকে সরোদ শেখাবেন।'

না, আমার মা আমায় সরোদ শেখাননি। মা-বাবা শিখিয়েছেন গান। কটকে মা-বাবা আমাকে বা দাদাকে গান শেখাচ্ছেন— এমন দৃশ্য আমার স্মৃতিতে ভাসে না। কিন্তু থেকে থেকেই মা-বাবা গান গাইতেন। শোনাটাই ছিল তখন এক ধরনের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়াও তাঁরা গাইতেন হিমাংশু দত্ত'র গানগুলি। মা-র গলায় শোনা হিমাংশু দত্ত'র গান 'তুমি যে আঁধার তাই বড় ভালোবাসি', 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে,' বাবার কণ্ঠে 'চাঁদ কহে চামেলি গো' ছেলেবেলার গানের স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে। এত অল্প বয়স থেকে এসব গান এত ঘনিষ্ঠতায় শুনেছি যে এগুলির কথা আমার মগজে অদৃশ্য অক্ষরে এমনিই লেখা হয়ে গিয়েছে সেই কোন ছেলেবেলায়। কোনও গানের খাতায় লিখে রাখতে হয়নি।

শুনে শুনে গান শিখলে এবং জোর করে গান না শেখালে বাচ্চারা কি

গানের কথাগুলো ('বাণী' শব্দটা আমার বরাবর অপছন্দ) আরও সহজে মনে রাখতে পারে? —পাঁচের দশকের গোড়ায় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি টেপ রেকর্ডারের মালিক হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারত না। তা, আমার বাবা একটি খাতা করেছিলেন। মুখে কুথা ফোটার পর থেকে আমি কী কী বলতাম, বাবা তা অল্পবিস্তর লিখে রেখেছিলেন। খাতাটার নাম রেখেছিলেন 'প্রথম কাকলি'। এ খাতা বাবা আমায় কোনওদিন দেখাননি। আমি উলটে-পালটে দেখে নিয়েছি চুরি করে। দেখেছি লেখা রয়েছে ছোট্ট আমি গাইছি 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।' আধো আধো উচ্চারণগুলোও বাবা লিখে রেখেছেন যেমনটি শুনেছেন আমার মুখে সেভাবেই। দু' একটি জায়গায় নিজের খেয়াল অনুযায়ী একটি-দুটি কথা বসিয়ে দিলেও বাকি গানটি মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন তেমনই। আমার কিন্তু ঐ সময়টার কথা একদমই মনে নেই। মনে আছে তার পর থেকে কিছু কিছু ঘটনা, মানে গানের ঘটনা। প্রায় প্রতিটি ঘটনাই বাবা-মার গাওয়া গান এবং সে-গান শোনার, অবাক হয়ে শোনার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে।

আমার বাবা-মা দুজনেই গানের মানুষ। সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমা চট্টোপাধ্যায়। বাবা তাঁর ছোটবেলা থেকে গান শিখেছিলেন আমার জ্যেঠাবাবু - জেঠিমার কাছে। সেকালে বাইরের কোনও গুরুর কাছে বাংলা গান শেখার চল ছিল না। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সে বাবা নিজেই গিয়ে হাজির হন একদিন কলকাতায় গার্সটিন প্লেসের রেডিয়ো স্টেশনে। তাঁর 'অডিশন' নিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এক অজ্ঞাত কুলশীল যুবক বেশ ভালোই গাইছে দেখে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বারবার জানতে চান যুবকটি এসব গান কার কাছে শিখেছেন। যুবক শিখেছিলেন শুনে শুনে। বাবা আমায় বলেছিলেন যে, বেশিরভাগ গান তিনি শুনে শুনে শিখতেন। কোথাও হয়তো একটা ভালো গান শুনলেন। তারপর সে-গানের কথা জোগাড় করে তুলে ফেলতেন গানটি।

বেতারে গান গাওয়া আর গ্রামাফোনে গান রেকর্ড করা বাবার প্রায় একই সময়ে। বাবার গাওয়া আধুনিক গানের রেকর্ডগুলি ছিল হিন্দুস্থানের ডিস্কে। তাঁর প্রথম রেকর্ড করা গান 'চামেলির বুকে' নীহারবিন্দু সেনের লেখা, শৈলেন দত্তগুপ্তর সুর। শুনেছি এই গানে হিমাংশু দত্ত-ও সুর দিয়েছিলেন।

নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীন নিয়োগী, সরোজ দত্ত এঁদের লেখায় এবং অনুপম ঘটক, দুর্গা সেন, নীহারবিন্দু সেন, দ্বিজেন চৌধুরি, গোপাল দাশগুপ্ত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে আমার বাবা গান গেয়েছিলেন হিন্দুস্থান কোম্পানির গ্রামাফোন রেকর্ডে। এগুলি ছিল আধুনিক বাংলা গানের যাকে বলে 'বেসিক রেকর্ড'(Basic Record)।

দুর্গা সেনের সুরে বাবার গাওয়া 'ভুলে যেও মোর গান,' 'ফেলে দাও প্রিয় বাসি বাসরের মালা' বোধহয় সে-যুগে বেশ নাম করে গিয়েছিল। আমার জন্মের আগেই বাবা বেতারে ও রেকর্ডে গান গাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু আমি কলেজে পড়ার সময়েও এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে এক প্রবীণাকে 'ফেলে দাও প্রিয়' গানটি গাইতে শুনেছি। ১৯৬৬-৬৭ সালে উৎপলা সেন একবার আমাদের বাসায় এসে 'ভুলে যেও মোর গান' শুনিয়েছিলেন কয়েক লাইন।

১৯৪৭-৪৮ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে আমার বাবা রেকর্ড করেছিলেন 'তুমি কি দেখেছ প্রিয়/ কৃষ্ণচূড়ার ফুলে বনানী গিয়েছে ছেয়ে।'—আরও পরে অনেকটা এই গানের সুরেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বেঁধেছিলেন 'আকাশের অস্ত রাগে/তোমারই স্বপ্ন জাগে' গানটি। এই গানটি রেকর্ডে গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। 'তুমি কি দেখেছ প্রিয়' গানটির সুরও ছিল মনে রাখার মতো। আমার মনে আছে, এই গানটি ছেলেবেলায় প্রথম রেকর্ডে শুনে তুলতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিলাম। একে তো গানের মুখটাই বেশ জটিল। গলা তৈরি না থাকলে 'প্রিয়'র ভাঁজগুলোকে ফুটিয়ে তোলা দুষ্কর। তার ওপর গানের মাঝখানে, সঞ্চারীতে সুরটা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। অনেক বছর পর বুঝেছিলাম যে হেমন্তবাবু এ-গানে tonic change বা খরজ পরিবর্তন করেছিলেন। এর ফলে গানের পর্দা এদিক ওদিক হয়ে যেতে চায় যদি আমরা আমাদের দেশের সনাতন সংগীত পদ্ধতির নিরিখে ভাবি। হিন্দুস্থানি রাগসংগীতেও খরজ পরিবর্তন সম্ভব। এক রাগ থেকে অন্য রাগে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রাগের রূপ, স্বরের নাম পালটে গেলেও স্বরের মূল ধ্বনি বা সুরগুলি পালটায় না। পাশ্চাত্য সংগীতে খরজ পরিবর্তনের পদ্ধতিটা অন্য। তাতে স্বরসমষ্টির আবহটাই যায় পালটে। এই পদ্ধতি আধুনিক বাংলা গানে প্রযুক্ত হয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকেই। রবীন্দ্রনাথের 'সকলই ফুরাল স্বপনের প্রায়' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে' গান দুটি যেমন পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতিতে tonic change-এর দৃষ্টান্ত বহন করছে। হিমাংশু দত্তর 'তুমি যে আঁধার তাই বড় ভালোবাসি' এই প্রযুক্তির আর এক স্মরণীয় নজির। 'তুমি কি দেখেছ প্রিয়' গানটিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় খরজ পরিবর্তন করতে গিয়ে এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। সেকালে ছায়াছবির গানও কিছু রেকর্ড করেছিলেন আমার বাবা সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর, কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত। দক্ষিণামোহন ঠাকুর ছিলেন এক অসাধারণ যন্ত্রশিল্পী। এসরাজ, তার-সানাই বাজাতেন তিনি। আমি তখন খুবই ছোট। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মহারাজার বাড়িতে এক আসরে দক্ষিণামোহনের বাজনা শোনার সুযোগ হয়েছিল। কতকাল আগের ব্যাপার। আমার

আজও মনে আছে। সকলে বসে আছেন ফরাসে। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে। জলসাঘরের দেয়ালে বড় বড় আয়না। আয়নায় ঝাড়লণ্ঠনের আলোগুলো যেন আরও সুন্দর। শ্রোতাদের দিকে মুখ করে দক্ষিণামোহন এসরাজ বাজাচ্ছেন। মুখটা প্রসন্ন। কী সুর তিনি বাজিয়েছিলেন তা আর মনে নেই। তবু বাল্যস্মৃতি তার নিজস্ব সুর তুলে যায় আজও। তাকে ধরতে চেষ্টা করি, পারি না।

হিমাংশু দত্ত বাবাকে গাইয়েছিলেন সেকালের নামজাদা গায়িকা শৈলদেবীর সঙ্গে ডুয়েট। আর কমল দাশগুপ্ত বাবাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'গরমিল' ছায়াছবির গান। সঙ্গে গেয়েছিলেন ইন্দ্রাণী রায়। মূল ছবির সাউন্ড ট্র্যাকে এই গানটি যদিও রবীন মজুমদারের কণ্ঠে, গ্রামাফোন ডিস্কে কিন্তু গেয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এর কারণ কি এই যে সেই যুগমুহূর্তে ডিস্কের বাজারে রবিন মজুমদারের চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের কাটতি বেশি ছিল?

কমল দাশগুপ্তের সুর দেওয়া সেই গানটি ছিল 'দোলে পিয়াল শাখে ঝুলনা।' —অনেক অনেক দিন পর শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'দেওয়া নেওয়া' ছবির একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা।' শ্যামল মিত্রর সুর দেওয়া এই গানটির মুখের সঙ্গে কমল দাশগুপ্ত সুরারোপিত গানটির আশ্চর্য মিল।

নিজের রেকর্ড করা আধুনিক গানগুলি বাবাকে কখনও বাড়িতে গাইতে শুনিনি। আমার মা উমা চট্টোপাধ্যায়েরও আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড ছিল একাধিক। কোনওদিন শুনিনি যে এইসব গান তিনি বাড়িতে গাইছেন।

আমার মা গান শিখেছিলেন নীহারবিন্দু সেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্তর কাছে। তাঁদের কাছে শিখেছিলেন তিনি আধুনিক বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত। আরও অনেক পরে, বেতারে ও রেকর্ডে গান গাওয়া ছেড়ে দেবার বেশ কয়েক বছর পর মা পঞ্চানন ভট্টাচার্যর কাছে কীর্তন শিখতে শুরু করেন। তখন আমরা দক্ষিণ কলকাতার এস আর দাস রোডে থাকতাম । আট-ন'বছর বয়সেই আমার সুযোগ হয়ে গিয়েছিল পাশের ঘর থেকে পঞ্চানন ভট্টাচার্যর কীর্তন শোনার। মা গাইতেন সঙ্গে। এই ভাবে ক্রমাগত শুনতে শুনতে পদাবলী কীর্তনের সুরের টুকরো ঢুকে পড়েছিল আমার মগজে। রাগসংগীতের চেয়ে কীর্তনকেই সে সময় আমার বরং কাছের মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি কখনও কীর্তন শেখার সুযোগ পাইনি। আমার জীবনে এ এক বিরাট অভাব ও ক্ষতি বলে আমি মনে করি। তবু অতি কাঁচা বয়সে যেটুকু পেয়েছিলাম পাত কুড়িয়ে, তারই ছোঁয়া ঢুকে পড়ে আজ মাঝে মাঝে, নিজের গানে সুর করতে গিয়ে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের মধ্য দিয়ে কীর্তনের স্পর্শ তো আমার আবাল্যের সাথি।

মা-র গাওয়া আধুনিক গানের প্রথম রেকর্ডটি বেরোয় ১৯৩৯-৪০ সালে সেকালের 'পায়োনিয়ার' কোম্পানি থেকে। এই একই কোম্পানির লেবেলে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গাওয়া বাংলা গানও শুনেছি ছেলেবেলায়। মা-র প্রথম রেকর্ডটির জন্য গান লিখেছিলেন ও সুর করেছিলেন নীহারবিন্দু সেন। পরবর্তী জীবনে গীতবিতান স্কুলের দৌলতে নীহারবিন্দু সেনের পরিচয় হয়ে ওঠে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক। আমিও তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান শিখেছিলাম। কিন্তু এই শিক্ষকটি যে অনেককাল আগে বাংলা গান লিখতেন ও সুর করতেন তা বোধহয় অনেকেই জানেন না। তাঁর লেখায়-সুরে আমার মা উমা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া 'তোমায় শুধু পেয়েছিলেম হারাতে' ভারি শ্রুতি সুখকর গান। স্থায়ীর সুরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এসে পড়ছে। কিন্তু অন্তরায় রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত স্বকীয়তার ছাপ। সব মিলিয়ে এক অনূচ্চ, অথচ স্পষ্ট আধুনিক কম্পোজিশন।

আগেই বলেছি যে, আমাদের বাড়িতে বাবা-মাকে তাঁদের রেকর্ডে গাওয়া আধুনিক বাংলা গান গাইতে শুনিনি। নিজের থেকে তো নয়ই। অনেক জোর খাটিয়ে তবে বাবাকে দিয়ে একবার 'ভুলে যেও মোর গান' আর 'তুমি কি দেখেছ প্রিয়' গাওয়াতে পেরেছিলাম। আর মা একবার আমার অনুরোধে তাঁর রেকর্ডের একটি গান কয়েক লাইন গেয়ে শুনিয়েছিলেন খালি গলায়। নিজেদের গাওয়া গানগুলি তাঁরা কখনও আমাকে বা আমার দাদা আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায়কে শেখাননি। গান শেখাতে বসলেই রবীন্দ্রনাথের গান। হিমাংশু দত্তর কিছু গান। বাবা একবার আমাকে কাজী নজরুল ইসলামের 'তুমি আমার সকাল বেলার সুর' গানটি শিখিয়েছিলেন, মনে আছে। বাবার সঙ্গে নজরুলের মোটামুটি পরিচয় ছিল। আকাশবাণীতে বাবার চাকরি পাবার ব্যাপারে কাজী নজরুল ইসলাম একটি সার্টিফিকেটও লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার নিভৃত গান গাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ও হিমাংশু দত্তের গানগুলিই ফিরে ফিরে আসত।

একবার মনে আছে, অনেক বছর আগে বাবা হঠাৎ হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে নজরুলের 'সন্ধ্যামালতী যবে' গানটির সুরমিশ্রণের দিকগুলি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন আমাকে, গেয়ে গেয়ে। আর একবার, সেও কত বছর হয়ে গেল, নিখিলচন্দ্র সেন আমাকে নজরুলের 'মেঘলা নিশি ভোরে' গানটি শেখানোর পর বাবা বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন যে, ওভাবে গাইলে ও-গানের বিশেষ আঙ্গিকটি খুলবে না। এই বলে বাবা খালি গলায় গানটি প্রথম অন্তরা পর্যন্ত গেয়ে শুনিয়েছিলেন অনবদ্য এক আঙ্গিকে। তার কয়েক বছর পর একদিন বেতারে শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে ও-গানের রেকর্ড শুনে বুঝতে পেরেছিলাম 'মেঘলা নিশি ভোরের' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাবার ধারণার উৎসটি কোথায়।

Kazi Nazrul Islam,
14/6 Shambazar Street,
Calcutta,

I am extremely pleased to give my personal testimony to Mr. Sudhindra Nath Chatterjee, B.A., who has been known to me for a long time. I am deeply impressed with his ideas in aesthetic culture which for its originality and beauty are only comparable to his fine executions as a practical musician. He is a recognised singer of Bengali songs, especially songs of Rabindranath and his many gramophone records will easily bear him well. He is a fine, sturdy and painstaking young man, quite smart and always alert to his duties. Moreover he has got the ability to write elegant Bengali for which I have got much liking. I shall be very happy to see him well-placed in life.

Kazi Nazrul Islam

26.3.42.

নজরুলের চিঠি

যাই হোক, বাড়িতে বাবা-মার গলায় যেসব গান কখনও শুনিনি, এস আর দাস রোডে চলে আসার পর বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা দম-ঘোরানো গ্রামাফোনে সেইসব গানই রেকর্ডে শুনে প্রথমে ঠিক বিশ্বাসই করতে পারিনি যে বাবা-মার রেকর্ড শুনছি। কটকে কখনও গ্রামাফোন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু কলকাতায় প্রথম যেদিন গ্রামাফোন শুনলাম এবং গ্রামাফোনে দম-ঘোরানোর সুযোগ পেলাম, সেই দিনটি স্পষ্ট মনে আছে। বাবা অফিস থেকে ফিরলেন একটা ভারী বাক্স হাতে। শুনলাম ওটাকে গ্রামাফোন বলে। তখন আমার বয়স বছর আষ্টেক। পুরোনো বাক্স খুলে বাবা গ্রামাফোন বের করলেন। ছোট্ট একটা পিনের বাক্স বেরুল তাঁর পকেট থেকে। বাক্সটায় গাঢ় নীল রঙের ওপর

বোধহয় সাদা রঙে আঁকা চোঙার সামনে কুকুর। গ্রামাফোনের একটা ঢেউ খেলানো চক্‌চকে স্টিলের নলের মুখে লাগানো একটা যন্ত্রে পিন লাগিয়ে, বাঁইবাঁই করে দম দিয়ে রেকর্ড চাপানো হল। রেকর্ড থেকে বেরিয়ে এল রবীন্দ্রনাথের একটি গান— 'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে আসে।' একটি পুরুষ কণ্ঠ, একটি মহিলা কণ্ঠ। আমার বাবা, আমার মা। না,'His parents voice' নামে কোনও লেবেল কখনই ছিল না। লেবেলটি ছিল'His Master's voice'। মনে আছে মা খিলখিল করে হাসছিলেন রেকর্ড শুনতে শুনতে। বাবাকে ছেলেবেলায় হাসতে দেখেছি কমই। শুনছিলেন গম্ভীর মুখেই।— রেকর্ডটি থেমে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে পড়েছিলাম লেবেলের লেখাগুলো। ছাপার অক্ষরে, এইচ এম ভি-র ছাপের তলায় বাবা-মার নাম দেখে একটা অবিশ্বাসমিশ্রিত গর্ব হয়েছিল। আজও মনে আছে বাবা-মার গাওয়া একটি হিন্দি গীতের রেকর্ডও সেদিন প্রথম শুনেছিলাম: 'কিতনি দূর কিনারা'। শ্রী দুর্গা সেনের সুর। ঠাসবুনোট অর্কেস্ট্রার আবহে দ্রুত ছন্দে গাওয়া এই গানটি আমায় চমকে দিয়েছিল, বাবার গলাটি ছিল গম্ভীর, নরম। মায়ের গলা রিন্‌রিনে, চিকন, সুরের প্রক্ষেপে তীক্ষ্ণ। খাসা জুটি। সঞ্চারীর অংশে মা-র গলায় ক্রমান্বয়ে চার পাঁচটি ভাঁজের খেলা ছিল, যা চমকপ্রদ লেগেছিল। মধ্য সপ্তকের সেই সওয়ালের জবাবে বাবার গলা চলে যাচ্ছিল তার গাম্ভীর্য সমেতই অবলীলায় তার সপ্তকের মাঝদরিয়ায়। যেমন সুরের কেরামতি, তেমনি কণ্ঠশিল্পীদের মুন্সিয়ানা। আমার ধারণা,'কিতনি দূর কিনারা' গানটি আজকের যোগ্য গায়ক-গায়িকাদের দিয়ে গাওয়ালে শ্রোতারা বুঝবেন যে এ গানের সুর-ছন্দের আবেদন আজও অম্লান। শুনেছি, সেকালে এ-গানটি অনেকেরই ভালো লেগেছিল। অনেক অনেক বছর পর আমি একাধিক প্রবীণ অবাঙালি শ্রোতার কাছে এ গানের উল্লেখ শুনেছি। অথচ আকাশবাণীর কোনও অনুষ্ঠানে এ রেকর্ড বাজতে শুনিনি। অনেক দিন আগে একবার বেতারে হঠাৎ শুনে ফেলেছিলাম বাবা-মার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড।

রবীন্দ্রসংগীত বাবা যে কটি রেকর্ড করেছিলেন, আমার মনে হয় তার মধ্যে 'খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী' সবচেয়ে মনে রাখার মতো। অন্য পিঠে ছিল 'সে কিভাবে গোপন রবে।' রেকর্ডিং-এ ট্রেনার ছিলেন শৈলজারঞ্জন। 'সে কিভাবে গোপন রবে' গানটিতে নিজের উৎসাহেই বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীপান্নালাল ঘোষ। পান্নালাল ঘোষ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন—এই ব্যাপারটা বাবার কাছে তাঁর বার্ধক্যেও এক বিরাট বিস্ময়। একাধিকবার বাবাকে বলতে শুনেছি 'আমার মতো একটা লোকের সঙ্গে পান্না ঘোষের মতো একটা অত বড় মাপের ওস্তাদ বাঁশি বাজিয়ে দিল।'

রবীন্দ্রনাথের গানে আমার হাতেখড়ি, কানে-খড়ি, গলায়-খড়ি দিয়েছিলেন আমার বাবা। কলকাতায় এস আর দাস রোডের ছোট্ট বাসায় তিনি প্রথম গান শেখাতে শুরু করেন আমায়। রবীন্দ্রসংগীত। মনে আছে, কখনও খাতায় গান লিখতে দিতেন না। তিনি গাইতেন। আমি শুনে শুনে গাইতাম। তিন খণ্ডের গীতবিতান ছিল বাসায়। তখন বা তার পরেও খেয়াল করিনি।—এবং অনেক বছর পর নীহারবিন্দু সেন আমাকে না বলে দিলে কবে খেয়াল করতাম কে জানে—ওগুলো ছিল গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ। অতি মূল্যবান।

বাবার গান শেখানোর পদ্ধতিটা ছিল এইরকম। হঠাৎ একটি গান ধরতেন। হারমোনিয়মটা বাজাতেন মোটামুটি আস্তে। সুরের সঙ্গে লয়ের ওপর গুরুত্ব দিতেন। একটা লয় (Tempo) ধরতেন এবং সেটিকেই গেঁথে দিতে চেষ্টা করতেন আমার মগজে। এক এক গানের এক এক লয়। এর ফলে গানগুলো যেন তালছন্দের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা চরিত্র পেত। একই সঙ্গে দারুণ জোর দিতেন গায়কী, অভিব্যক্তির ওপর। সুরের প্রতিটি কলির খুঁটিনাটির দিকে তাঁর ছিল কড়া নজর। একটি লাইন শুধু ঠিক সুরে তালে গাইলেই চলবে না, ঠিকমতো ভাব দিয়ে গাইতে হবে। ভাব দেওয়ার ব্যাপারটা বাবা কখনও কথায় বোঝাতেন না। বারবার গেয়ে দেখাতেন, তারপর গাওয়াতেন কয়েকবার। আমার আজও মনে আছে একেবারে প্রথম দিকে বাবা আমায় শিখিয়েছিলেন 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি', 'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,' 'সে কিভাবে গোপন রবে।'— আমার জন্মেরও কয়েক বছর আগে গান গাওয়ার অভ্যেসটা ছেড়ে দিলেও পাঁচের দশকের শেষ দিকে বাবার গলাটি ছিল চমৎকার। ভারি সুরেলা গলা। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে ছিল তাঁর রাজ্য। তারসপ্তকেও কোনও অসুবিধে ছিল না। অসাধারণ 'মডিলিউশন'-এর ক্ষমতা ছিল তাঁর। আমাকে গান শেখানোর সময়ে তিনি তাঁর অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগ করতেন; আমি হাঁ করে শুনতাম; তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম। পারতাম না। বাবা কিন্তু লেগে থাকতেন খুঁটিনাটি নিয়ে। রেহাই দিতেন না।

মনে আছে, আমার তখন আট কি ন'বছর বয়স। রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ, বাউলাঙ্গের গানগুলি শেখার সময়ে লয় একটু ঝুলে গেলেই বাবা ভয়ানক বিরক্ত হতেন। হারমোনিয়মের বেলোয় চাঁটি মেরে মেরে লয় বাড়িয়ে দিতেন এবং সেই সঙ্গে নিজেও সেই বাড়ানো লয়ে গাইতে শুরু করতেন বেশ গলা ছেড়ে। একটা স্ফূর্তির ভাব আসত। গান হয়ে উঠত আরও প্রাণবন্ত। এই গানগুলিই পরে নানা জায়গায় নানান শিল্পী ও শিক্ষার্থীকে বেশ ঢিমে লয়ে গাইতে শুনেছি। ভালো লাগেনি।

তেমনি, যে গান ঢিমে লয়ে গাওয়া দরকার তারও গতির বৈশিষ্ট্য বাবা বুঝিয়ে দিতেন গেয়ে গেয়ে। গানের জ্ঞান যে শুধু কথা, সুর তালের ওপর ভর করে নেই, লয়টাও যে সমান জরুরি, এই শিক্ষা আমি বাবা, মা দুজনের কাছ থেকেই পেয়েছি।

মজার কথা হল, আমাকে গান শেখানোর সময়ে লয়ের দিকে কড়া নজর দিলেও মা-র সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাবা কোনও গান গাইলে মাঝেমাঝেই দেখতাম লয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছে। তখন দেখতাম মা-র লয় আরও যেন গতিশীল। বাবা যেন একটু শ্লথগতি। গতিশীল লয় বলতে আমি অবশ্যই দৌড়োদৌড়ির কথা বোঝাচ্ছি না।

ছেলেবেলায়, শুধু ছেলেবেলায় কেন আমার প্রথম যৌবনেও মা-র কণ্ঠে হিমাংশু দত্তর কিছু কিছু গান যেরকম শুনেছি, আর কোথাও তেমন শুনলাম না। বিশেষ করে 'বিদায়ের শেষ বাণী তুমি বলোনা,' 'রাতের দেউলে জাগে বিরহী তারা', 'তোমারই পথপানে চাহি'। আমার বাবা আর মা প্রায় একসঙ্গেই বেতারে রেকর্ডে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা আকাশবাণীতে চাকরি নেবার পর সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁর বা মা-র বেতারে গান গাওয়া উচিত নয়। স্রেফ নৈতিক কারণে তাঁরা গানবাজনার জগৎ থেকে সরে এসে নিজেদের শিল্পীজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেন। অনুষ্ঠানে গান গাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, নিয়মিত রেওয়াজ করা বা গাওয়ার অভ্যেস বজায় রাখার ব্যাপারটাও আর ছিল না। তা সত্ত্বেও মা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের অনুরোধে বাড়িতে যে গান শুনিয়েছেন তার উৎকর্ষ চমকপ্রদ।

'সুরসাগর' হিমাংশু দত্তর সুরের একটি বৈশিষ্ট্য হল ছোট তান, চকিত মুড়কি। সেগুলি যথাযথভাবে গাইতে গেলে রীতিমতো মুন্সিয়ানা প্রয়োজন। তা ছাড়াও তাঁর সুর, কম্পোজিশন এতই অভিনব ও নিরীক্ষামূলক যে সামলানো মুশকিল। মা কিন্তু নিয়মিত চর্চা ছেড়ে দেবার পরেও সাবলীলভাবে কাজগুলি গলায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন সৌষ্ঠব, মাধুর্য বজায় রেখে।

সুরসাগরের কিছু গান মা-র কাছেই শেখা। মা অবশ্য বাবার মতো ধরে ধরে গান শেখাতেন না। মাকে কখনও হারমোনিয়ম বাজাতেও দেখিনি। বাবা-মার কাছে জেনেছি যে, অনেককাল আগে, মায়ের বিয়েরও আগে মা যখন বেতারে গান গাইতেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম বাজিয়ে দিতেন। খুব ছোটবেলায় দেখেছি বাবা বাজাচ্ছেন মা গাইছেন। আমি হারমোনিয়ম বাজাতে শেখার পর আমিও বাজাতাম মা-র সঙ্গে।

হারমোনিয়ম নিয়ে প্যাঁ পোঁ করা শুরু করেছিলাম আমি ১৯৬০ সাল নাগাদ।

হয়তো বা তার কিছু আগে। নিজে নিজেই হাত পাকাতাম। প্রথম প্রথম বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আর সবার মতো। তারপর লেগে থেকে থেকে অল্পকালের মধ্যেই বেশ সড়গড় হয়ে গিয়েছিল।

ভাবলে অবাক লাগে যে আমার বড় ভাই, আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায়, ছেলেবেলায় আমার চেয়ে ঢের ভালো গান গাইলেও হারমোনিয়ম যন্ত্রটি আর বাজিয়ে উঠতে পারলেন না। আমার দাদার মতো সুররসিক মানুষ জীবনে খুব বেশি দেখিনি। যে-কোনও সুর দু'একবার শুনলেই হুবহু তুলে নিতে পারেন আজও। অল্প বয়স থেকেই তিনি অতি সুকণ্ঠের অধিকারী। ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে গায়ক হলেই বোধহয় ভালো হত তাঁর। কিছুকাল বেতারে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন। বাবা-মার কাছে ছাড়া আনন্দরূপ অবশ্য অন্য কারুর কাছেই সেভাবে দেঁড়ে-কষে গান শেখেননি। কিন্তু নানাধরনের বাংলা গান তিনি এই সেদিনও সুন্দর পরিমিতিবোধের সঙ্গে গেয়ে দিতে পারতেন। পেশার চাপে এবং কায়মনোবাক্যে লেগে না থাকার দরুন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাঁর আর বিকাশ হল না। আর হল না হারমোনিয়ম বাজানো। অবশ্য হারমোনিকা বা মাউথ-অর্গ্যান যন্ত্রটি তিনি ছেলেবেলা থেকেই বাজান।

দাদার দেখাদেখি আমিও ছোটবেলায় হারমোনিকা বাজানো শুরু করেছিলাম। দাদার ছিল 'পাক্' নামে ছোট্ট একটি যন্ত্র। কী সুন্দর আওয়াজ তার! দাদা বাজাতও খাসা। আমাকে বাবা একটা অন্য কোম্পানির মাউথ অর্গ্যান দিয়েছিলেন। প্রথম তুলেছিলাম 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে।' দাদার বা আমার যন্ত্রটা 'ক্রোম্যাটিক' ছিল না অর্থাৎ কোমল ও কড়ি স্বরগুলো তাতে বাজানো যেত না। সে ছিল এক বিরাট গেরো। একেবারে কোমল-কড়ি বর্জিত বাংলা গানের সুর খুব কম। ফলে, প্রিয়গানগুলো বাজাতে গিয়ে গোঁজামিল দিতে হত। ভীষণ কষ্ট পেতাম। সংগীতের ব্যাপারে আপস বরদাস্ত করা কঠিন কাজ।

'ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা' আমি প্রথম পেয়েছিলাম ১৯৬২ সালে। বাবা কিনে দিয়েছিলেন কলকাতার নিউ মার্কেটের একটা দোকান থেকে। সে কী আনন্দ আমার। তেড়ে বাজাতে লাগলাম। এবারে আর কোমল বা কড়ি স্বরগুলোকেও কোনওরকমে চেপেচুপে ভ্যাম্পট্যাম্প দিয়ে শুদ্ধ স্বর করে তোলার বাধ্যবাধকতা নেই। মনের সুখে এ গান ও গান তুলতে লাগলাম। এস আর দাশ রোডে আমাদের বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা ধাপ ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বা পুজোর ছুটিতে বসে আমি মেজাজে মাউথ অর্গ্যান বাজাতাম। প্রধান শ্রোতা ছিল আমার বাল্যবন্ধু শোভন (অনির্বিত রক্ষিত)। শোভন খুব গান ভালোবাসত। নিজে গাইতও একটু আধটু। কানটা ছিল ভালো। সুরে এদিক ওদিক হলে আপত্তি করত। শোভনের

প্রসন্ন মুখ ও মুচকি হাসি দেখে বুঝতাম অমুক গানটা মোটামুটি ভালোই বাজালাম।

একসময়ে আমি তেড়েফুঁড়ে স্কাউটিং করতাম। কোথাও ক্যাম্পে গেলে ক্যাম্পফায়ারে বা স্কাউটদের ছোটোখাটো অনুষ্ঠানেও আমি মাউথ অর্গ্যান বাজাতাম।

মাউথ অর্গ্যানে বাজানোরও আগে ছেলেবেলায় একটি পর্যায়ে আমি আর একটি যন্ত্র বাজাতাম। আমার নাক। নাকের ফুটো দুটো কায়দা করে আঙুল দিয়ে টিপে খুলে এবং অন্য হাতের আঙুল দিয়ে টেপা নাকে টোক্কর মেরে আমি কখনও সানাই, কখনও গিটার বাজাতাম। খুব মজা লাগত। কিন্তু মা বকাবকি করতে লাগলেন। অভ্যেস বা বদ অভ্যেসটা ছেড়ে দিলাম।

বাবা-মা আমাকে বা দাদাকে কখনও সরগম করে গান শেখাননি। ১৯৫৮-৫৯ সালের আগে বাবা আমায় নিয়ম করে গানও শেখাতেন না। মাঝে মাঝে শেখাতেন। কাজেই আসল গানগুলো আমরা বেশ নিয়ম করেই শিখে নিতাম আকাশবাণী কলকাতার অনুরোধের আসর থেকে। আধুনিক বাংলা গান। আমার মনে আছে, ১৯৫৪ সালে কটক থেকে কলকাতায় চলে আসার পর প্রথমে আমরা বেহালায় আমার এক জ্যাঠাবাবুর বাড়িতে উঠেছিলাম। কলকাতা কেন্দ্রের অনুরোধের আসর আমি যে জীবনে প্রথম শুনি বেহালায় তাতে আমার অন্তত সন্দেহ নেই। অনুরোধের আসরের গানগুলো যেন আমার গান শোনার অভ্যেসটাকেই তৈরি করে দিয়েছিল। কানদুটোকে দিয়েছিল খুলে। দু'কানের দরজা দিয়ে সেই বাংলা আধুনিক গানগুলো সার দিয়ে ঢুকে যেত আমার মগজে। সেখানে এই গানগুলোই তৈরি করে দিয়েছিল আধুনিক সুর-তাল-ছন্দের এক আশ্চর্য খাসমহল। এক একটা গান শোনার অভিজ্ঞতা যেন শিশুমনের এক একটা আবিষ্কার! আমাদের বিশেষ খেলনা ছিল না। আধুনিক গানগুলোই ছিল খেলনা। ছবির বই আর কটা দেখেছি ছেলেবেলায়? আধুনিক গানগুলোই ছিল রংচঙে ছবির বই। সাধারণ চাকরি করা বাবার আর কত পয়সা ছিল যে তিনি আমাদের নিয়ে ঘনঘন বেড়াতে যাবেন? গানই ছিল আমাদের ভ্রমণ। সফর। আকাশবাণী কলকাতার 'মিউজিকাল ব্যান্ডবক্স'-এ শোনা পাশ্চাত্যের গানগুলোর হাত ধরে আমি যে কতবার বিদেশ পাড়ি দিয়েছি তার কোনও ইয়ত্তা নেই। ছেলেবেলার সবকিছু জুড়েই ছিল গান আর গান। আমার প্রতিটি সুন্দর স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে আছে কোনও-না-কোনও সুর।

গানের কথাগুলোকে ছেলেবেলায় তেমন গুরুত্ব দিতাম না। দিলেও, সেটা ছিল ব্যতিক্রম। আমার কাছে কথাগুলো তখন ছিল কঙ্কাল। সুর-তাল-ছন্দই ছিল গানের রক্তমাংস সব। যে গানগুলি ভালো লাগত, সেগুলির সুর তো বটেই, এমনকি যন্ত্রানুষঙ্গের সুরগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। এই ব্যাপারটা আমি ছেলেবেলায় দাদার

মধ্যে তো বটেই, আমার দু'একজন বন্ধুর মধ্যেও দেখেছিলাম। শনিবার, রবিবার অনুরোধের আসরের সময় দাদা মাঝে মাঝেই বসত রেডিয়োর কাছাকাছি খাতা পেন্সিল হাতে। পরে আমিও এটা করতাম। গান শুনতে শুনতে ডিকটেশন নিতাম বলা যায়। একটা গোটা গানের সব কথা তো আর লেখা যেত না। যতটা পারতাম লিখতাম। এখানে ওখানে ফাঁক ফোকর থেকে যেত। সেগুলো ভরাট করার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হত— আবার কবে অনুরোধের আসরে বাজবে গানটা!

কটক থেকে ফিরে বেহালায় যে একবছর ছিলাম সে সময় শোনা একটি রেকর্ডের গান আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। মৃণাল চক্রবর্তীর গাওয়া 'যমুনা কিনারে শাজাহানের স্বপ্ন শ্বেতদল।' গানটায় কেমন একটা সকাল-সকাল ভাব ছিল। মৃণালেরই গাওয়া আর একটি গানের সুর-তাল-ছন্দ আমায় গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। 'মৃণাল বাহুলতা ঘেরিয়া, কাঁকন রিনিঝিনি বাজে না।' সাত মাত্রায় বাঁধা এই আধুনিক গানটি শুনলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেত। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে তো আর 'বড়দের' গানের কথার মর্ম বুঝতাম না। মজা লাগা, খুশি-খুশি লাগা অথবা চাপা দুঃখের বোধ—সবই ছিল সুর-তাল আর গাওয়ার ভঙ্গিনির্ভর। 'মৃণাল বাহুলতা' গানটি সেসময়ে সুর, তাল আর গাওয়ার ধরনের গুণেই আমার মধ্যে একটা বিষণ্ণতা এনে দিত বলে মনে হয়।

অনেক বছর পর, বোধহয় সত্তর সালে এক বন্ধু আমায় গানটি গুনগুন করে গেয়ে শোনাল, তখন খেয়াল করি, সদ্যবিধবা এক তরুণী এ-গানের বিষয়। মেয়েটির হাত অলঙ্কার রিক্ত। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সবাই মেয়েটিকে গঞ্জনা দিচ্ছে গানে: 'হতভাগিনী, কেন যে আগে তুই গেলি না।' পাঁচ-ছ'বছর বয়সে তো আর এ গানের মর্ম বোঝার কথা নয়, বুঝিওনি। তবু, এ-সবের সুর, তাল, গাওয়ার ভঙ্গি জাগাতে পেরেছিল অদ্ভুত বিষণ্ণতা এক শিশুর মনে। দারুণ আকর্ষণ করত গানটি সেই শিশুটিকে।

মৃণাল চক্রবর্তীর গাওয়া এই গান আমি কখনও তোলার চেষ্টা করিনি। এ-গান সেই ছেলেবেলার পর রেডিয়োয় আর শুনেছি বলেও তো মনে পড়ে না। গানটি কিন্তু আজ এত বছর হয়ে গেল আমার মাথার ভেতরে কোথাও একটা রাখা আছে। গোটা গানের সুর আজও অজানা। তবু তো অব্যক্ত, না বোঝা এক বিষাদের বিমূর্ত প্রতীক হয়ে সুরের কিছু টুকরো থেকে গিয়েছে।

কেন? এ-সুরে তো আহামরি বাহার নেই। নেই তেমন চকচকে চ্যালেঞ্জ। উল্লেখযোগ্য কোনও অভিনবত্ব? তাও বিশেষ আছে কি? তাহলে এর আবেদন কোথায় ছিল? এর উত্তর আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কোন কোন কারণে

মানুষ তার শৈশবে শোনা একটি মোটামুটি সাধারণ সুরও মনে রাখে, কেন তার আবেদন দীর্ঘকাল ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে তার স্পষ্ট উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয় না যে, এককথায় বা সহজে এর উত্তর দেওয়া যাবে।

বয়স যত বাড়ছে, সুর যত করছি, গান যত লিখছি, গান নিয়ে যত ভাবছি, কথা ও সুরের সম্পর্ক নিয়ে ততই ভাবনা উঠছে ফেনিয়ে। শেষ কথা তো কখনই বলা যাবে না, কারণ এ ব্যাপারে 'শেষ কথা' বলে কোনও কথাই যেন থাকতে পারে না। তাহলে গান থেমে যাবে। মানুষ থেমে যাবে। আমার মনে হচ্ছে, গানের কথার ভূমিকা, গুরুত্ব যেই উল্লেখযোগ্য কোনও মাত্রায় চলে আসে, সুরের কোনও আলাদা অস্তিত্ব বা চরিত্র আর যেন থাকতে চায় না। কথা ও বিষয়ের অভিকর্ষে সুরের নিজস্ব গতিবিধিতে টান পড়ে। সুর, তাল ও ছন্দ এবং লয় কি উপযুক্ত?—এটাই তখন আসল প্রশ্ন। গানের সুর এমন কোনও গেরোবাজ পায়রা নয় যে তাকে আকাশে উড়ে গিয়ে কসরৎ দেখাতে হবে। সুর-তাল-ছন্দ কোনও ক্যালাইডোস্কোপের রঙিন কাচের টুকরো নয় যে তাদের ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন বিন্যাসের জেল্লায় অভিনবত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তাছাড়া গানের সুর ফোতোবাবুর পরস্মৈপদী টাকা নয় যে সেটা খোলামকুচির মতো উড়িয়ে দেওয়া যাবে। ভালো সুর বোধহয় এমন একটা জিনিস যেটা ঝিলিক মেরে চোখ ধাঁধায় না 'আমায় দ্যাখো, আমায় দ্যাখো' বলে। টেক্কা মারা তার আসল কাজ নয় বোধহয়। প্রয়োজন অনুসারে গানের মূল বক্তব্য বা বক্তব্যসমূহের সঙ্গে সামুজ্য রাখাই হয়তো ভালো সুরের কাজ। উপযুক্ত সুরের কাজ। কিন্তু এসব হল এখনকার ভাবনা। ছেলেবেলায় এসবের ছিটেফোঁটাও ছিল না। তখন গান শুনতাম সুর, তাল, ছন্দের টানে। কথাগুলোকে এমনিতে খুব গুরুত্ব দিতাম না। তবু কখনও কখনও সুর, গাওয়ার ধরনের সঙ্গে গানের কথাও যেন একটু-আধটু ডাক দিত। ছেলেবেলায় শোনা বেশিরভাগ আধুনিক বাংলা গান ছিল প্রেমের গান। পাঁচ,ছয়, সাত, আট বছর বয়সে বা তার পরেও কয়েক বছর নারী-পুরুষের প্রেমের মর্ম বোঝার ক্ষমতা আমার অন্তত ছিল না। এই কারণেই হয়তো অধিকাংশ আধুনিক বাংলা গানের কথা আমায় কিছু বলত না। কিন্তু যেসব বিষয় বা ব্যাপার আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে তখন এসে গিয়েছিল, সেগুলির ছিটেফোঁটাও আধুনিক গানে জায়গা পেলে কথার সঙ্গেও আমার একটু ঘনিষ্ঠতা হত।

যেমন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ।' মনে আছে, প্রথমবার শুনতে শুনতেই আমার যেন কান্না পাচ্ছিল। তেমনি, ঐ শিল্পীরই গাওয়া আর একটি গান আমায় দখল করে ফেলেছিল বেশ কিছুদিনের জন্য:'মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে লাগছে ভারি মিষ্টি।' দারুণ লাগত

গানটা, আজও লাগে। খুব কম আধুনিক বাংলা গানেই প্রকৃতিকে বিষয় করা হয়েছে। আশ্চর্য! অথচ মাঠ ঘাট-খেঁটুফুল করে করে মধ্যবিত্ত বাঙালির কত না কপট বিলাপ। 'মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে' গানটি অমল চট্টোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া, লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আধুনিক বাংলা গান শোনার এই ছিল আর এক বৈশিষ্ট্য। গানগুলির সঙ্গে মনে রাখতাম শুধু গায়ক-গায়িকাদের নাম। গীতিকার-সুরকারদের নাম। গীতিকার-সুরকারদের নাম নিয়ে বিলকুল কোনও চিন্তা ছিল না। 'রানার' বা 'পালকি চলে' হেমন্তর গান। 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' বা 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' হল সন্ধ্যার। 'অহল্যা কন্যা' সনৎ সিংহ। 'কোন দূর বনের পাখি' গায়ত্রী বসু। এইরকম। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অনুপম ঘটক, সলিল চৌধুরি, বিমল ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ— এদের অস্তিত্বের কথাই জানতাম না প্রথম দিকে। এটা উল্লেখযোগ্য যে পাঁচ-ছ'বছর বয়স ছেড়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে আজ মধ্যবয়সেও অধিকাংশ শ্রোতার মধ্যে একই প্রবণতা দেখতে পাই। অনেক ঐতিহাসিক গান আজও আমরা মনে রাখি কণ্ঠশিল্পীদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। সুরকার, গীতিকারদের নাম আমরা যে একেবারে জানি না তা নয়। কিন্তু কোনও গানের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে (সেই গান যদি পরিচিত হয়) কণ্ঠশিল্পীর নামটাই মনে পড়ে সবার আগে।

তেমনি, অনেক আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ডে আমরা যা শুনি বা যা যা শুনি তার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে যন্ত্রসংগীত। রেকর্ডের যে আবেদন ও আকর্ষণ, তাতে অর্কেস্ট্রার বা অল্পসংখ্যক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও সেগুলির অবদান বিরাট। ধরা যাক শচীন দেববর্মনের গাওয়া 'জানি ভ্রমরা কেন কথা কয় না'— এই গানটিতে কণ্ঠশিল্পীর অসামান্য নৈপুণ্যের পাশাপাশি মাত্র দুটি কি তিনটি যন্ত্রের যে অনবদ্য ভূমিকা, কোনও রসিক শ্রোতার পক্ষে কি সেটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব? এসরাজ বা তার-সানাই-এর মতো ঐ যন্ত্রটি এবং তবলা কারা বাজিয়েছিলেন, তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানতে চান? কার বা কাদের মাথা থেকে বেরোয় এইসব যন্ত্র প্রয়োগের চিন্তা? ইদানীং বাংলা গানের রেকর্ডে ক্যাসেটে 'অ্যারেন্‌জার' বা যন্ত্রানুষঙ্গ-পরিকল্পকের নাম থাকে। কিন্তু আমার তো মনে হয় যন্ত্রশিল্পীদের নামও থাকা উচিত। কখনও কখনও তা থাকেও, কিন্তু সবসময় নয়।

কিছু বছর ধরে কলকাতায় গানের পাশাপাশি 'অ্যারেঞ্জমেন্ট' বা যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে বেশ মাতামাতি হচ্ছে। আমার মনে হয় আটের দশক থেকে লোকে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে এ-ব্যাপারে। অনেক সময় দেখেছি অল্পবয়সিরা (প্রবীণ

শ্রোতাদের মুখে 'অ্যারেন্‌জমেন্ট' কথাটি আজও তেমন শুনি না) মূল গানটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বরং কম। 'অ্যারেঞ্জমেন্টের ' চমৎকারিত্বের দিকেই অনেকের যেন বেশি নজর। এরই সূত্রে শোনা যাচ্ছে 'কর্ড প্রগ্রেশন', 'ওব্‌লিগাটো' ইত্যাদি কথাগুলো। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে আটের দশক থেকে আমাদের দেশে ইলেকট্রনিক কি-বোর্ডের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। আমরা যাকে 'স্প্যানিশ গিটার' বলি (আসলে যেটাকে 'ফোক গিটার' বলাই ভালো), সেই যন্ত্রটির ব্যবহারও অনেক বেড়ে গিয়েছে গত দশক থেকে। কি-বোর্ড ও গিটার এখন পাওয়াও যায় প্রচুর, অনেকে এইসব যন্ত্র শেখেনও। শুধু তাই নয়, রেকর্ডিং-এ তো বটেই, এমনকি বাংলা গানের জলসাতেও এইসব যন্ত্রের অনুপস্থিতিটাই বরং ব্যতিক্রম এখন। অনেকে পেশার ভিত্তিতে এইসব যন্ত্র বাজাচ্ছেন। আমার তো মনে হয় আধুনিক বাংলা গানের বাজারে পেশাদার যন্ত্রশিল্পীর সংখ্যা সাতের দশকের মাঝামাঝিও যা ছিল, আটের দশক থেকে তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়েছে।

এখন, কি-বোর্ড ও ফোক গিটার বানানোর তাগিদে পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতি শেখার ইচ্ছেও বেড়েছে। এইসব যন্ত্র তো আর মূল গানের সুর বাজাবে না সবসময়। এগুলো রচনা করবে সুর তালের বনেদ, কাঠামো। ফলে ইউরোপীয় সংগীতের নানান কর্ড, সেগুলোর পরম্পরা, হার্মোনি ইত্যাদির দিকেও নজর যেতে বাধ্য। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে এ নিয়ে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা করবেন। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন যে বাংলা গানে যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগ নিয়ে আজকের প্রজন্ম আগের প্রজন্মগুলির চেয়ে ঢের বেশি ভাবছেন তো সেটা হয়তো ভুল হয়ে যাবে।

এটা ঠিক যে আটের দশক থেকে আধুনিক বাংলা গানের যন্ত্রসংগীতে মূল সুরের গতি অনুসারে কর্ড-পরম্পরার প্রয়োগবৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে গান যা যা বলতে চায় সেইমতো অথবা গানের কথা ও সুর যা বলে উঠতে পারল না বা ইচ্ছে করেই বলল না সেটা যন্ত্রের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বলে দেওয়ার ক্ষমতা অতীতের তুলনায় বাড়েনি, বরং কমেছে। এর প্রমাণ পেতে গেলে পাঁচের দশকের অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, শচীন দেববর্মন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, পরেশ ধর এবং আরও অনেকের সুর দেওয়া গানের মূল রেকর্ডগুলি শুনতে হবে। ঠিক একইভাবে শোনা দরকার পাঁচ ও ছয়ের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের রম্যগীতির জন্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অলোকনাথ দে, নিখিল ঘোষ, প্রবীর মজুমদার, ভি বালসারা, সলিল চৌধুরি— এঁদের সুর করা গানের স্টুডিয়ো রেকর্ডগুলি। আমার মনে হয় পাঁচ ও ছয়ের দশকে আধুনিক বাংলা গানের বেশ

কিছু রেকর্ডে যন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে কল্পনার জোর, ভাবনা, নৈপুণ্য এবং পরিমিতিবোধ দেখা গিয়েছিল, পরবর্তীকালে তা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হতে থাকে।

আধুনিক গানের আবেদন বা আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য যে যন্ত্রের বন্যা বইয়ে দিতে হবে তার কোনও মানে নেই। আকাশবাণীর স্টুডিয়ো রেকর্ডে সলিল চৌধুরির কথায় সুরে "হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে" গানটি গেয়েছিলেন সবিতা চৌধুরি। পুরো গানটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেজেছে প্রধানত একটি মাত্র যন্ত্র— বাঁশি। শুনলে মনে হয়, যন্ত্রের ব্যবহারটি, তার একটু সরু আওয়াজ, তার একক চাপল্য এতই অমোঘ যে বেশি যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। গানটি রেকর্ডে শুনে আমার বরাবর মনে হয়েছে এ গানের "রূপকুমারী মেয়ে মান করেছে" এবং হলুদ গাঁদার ফুল এনে না দিলে সে চুল বাঁধবে না বটে, কিন্তু তার মনের আসল ইচ্ছেটা হল সে নাচবে। গানে কিন্তু এভাবে বলা নেই যে এ মেয়ে নাচতে চায় চুলে গাঁদা ফুল পরে। কিন্তু বাঁশিটা এমন ছন্দে এমন স্বরপরম্পরায় বাজছে যে আমার অন্তত মনে হয়েছে অভিমানী মেয়ের অন্তরে যে চাপল্য, যে অনাবিল ছেলেমানুষি, সলিল-প্রযুক্ত বাঁশিটি যেন তারই প্রতীক। নজরুলের ভাষা ধার করে বলা যায়, এ হল "চপল মেয়ের ভালোবাসা।" এ বাঁশি যেন আমাদের বলে দিতে চাইছে 'রূপকুমারী'র মনের গোপন ইচ্ছেটা, গানে যা অত ভেঙে বলা হয়নি। ছেলেবেলা থেকে আমার ঐ বাঁশি শুনলেই মনে হত—যাই ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি যেখান থেকে পারি হলুদ গাঁদার ফুল। মেয়েটা নাচতে চাইছে যে!

তেমনি 'সাত ভাই চম্পা' গানটিতে সলিল চৌধুরি গানের শুরুতে ও পর্বের ফাঁকগুলোয় জমজমাট অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করলেও অন্তরা থেকে স্থায়ীতে ফেরার মুহূর্তটিতে একটি অনুচ্চ বাঁশি প্রয়োগ করেছেন যার চরিত্র ও বক্তব্য একেবারেই আলাদা। এই বাঁশিটি প্রায় অস্ফুটে শুধু তার সপ্তকের 'সা'-তে দাঁড়িয়ে আছে একটানা দু-লাইন জুড়ে। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। এ যেন বিস্মিত চোখে রাতের আকাশে দেখা দূরের একটি তারা। আচ্ছা, এমন তো হয়েই থাকে যে জানলার ধারে বসে একটা রূপকথার গল্প পড়তে পড়তে চোখ চলে যায় কল্পনার টানে জানলার বাইরে! রাত হলে দেখে ফেলি হয়তো একটা তারা। মোটেও তাকে দেখতে চাইনি। তবু তাকে দেখে ফেললাম। দিনে হলে হয়তো দেখে ফেলি একটা গাছের ডাল, বা একটা চড়াই পাখি। এই হঠাৎ দেখার মধ্যে দিয়ে একটা আলাদা মাত্রা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে রূপকথার গল্পটির সরাসরি কোনও যোগ নেই। যোগসূত্র তবুও কী করে যেন তৈরি হয়, আলগোছে, অনুচ্চভাবে—ঐ বিশেষ মুহূর্তটিতে। সলিল চৌধুরির "সাত ভাই চম্পার" রূপকথা— গানে অনুচ্চ ও স্থির ঐ বাঁশি (যা দু লাইনের পর মিলিয়ে যায়) ঐ আলাদা মাত্রাটা যেন।

কোত্থেকে একটা আলতো সম্পর্ক তৈরি করে আমরা আবার গল্পের বইয়ে (গানে) মন দিই।

এই সলিল চৌধুরিই আবার "কী যে করি দূরে যেতে হয়" (লতামঙ্গেশকরের গাওয়া) গানটির সঞ্চারীতে একবার বাঁশি প্রয়োগ করেছেন সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশে। গান বলছে: "কী যে করি বল এত আশা নিয়ে/ বোবা হয়ে মরি এত ভাষা নিয়ে।"— এত ভাষা নিয়েও নীরব থাকার যে আকুতি, বাঁশির কাজ এখানে যেন সেটিকেই স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তোলা। বাঁশির সুর এখানে গানের সুরের সম্পূরক। এত ভাষা নিয়েও যে বোবা হয়ে মরে, তার স্বকণ্ঠে আকৃতিময় এই সুরবিহার তো মানায় না। সে চুপ করে গেল। তার মনের কথাগুলো বলে দিল বাঁশি।

আকুতি ও যন্ত্রণা (প্রায় হাহাকার) সলিল চৌধুরি অন্য একটি গানে ফোটাতে গিয়ে প্রয়োগ করেছেন 'টেনর স্যাকসোফোন।' অন্তত আওয়াজ শুনে তো তাই মনে হয়। 'না যেওনা রজনী এখনো বাকি'-র অন্তরায় গানের পটভূমিতে বাজছে এই যন্ত্রটি। যাকে আমি জীবনে মরণে শুধু নয়নে নয়নে ধরে রাখতে চাই সে যে রাত না-পোহাতেই চলে যাচ্ছে। আমি তো তাকে লিরিকের ভাষায় এটুকু বললাম। কিন্তু ভাষা ও গানের সুর কি তাই বলে আমার বাসনার সবটুকু নিংড়ে এনে দেখাতে পারল? স্যাকসোফোনের জন্য পৃথক একটি সুর গড়ে সংগীতকার তাই গানের পেছনেই তাকে রেখে দিলেন। বাসনার তীব্রতাকে তারসপ্তকের সুরে খেলিয়ে এনে না-বলাকে দিলেন বলে।

সাহানা দেবী একবার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে একটি বেতার সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "সুরের ভেতরে সুর।" — তাঁর বক্তব্য ছিল— রবীন্দ্রসংগীত শুধু স্বরলিপি দেখে গাইলে সেটা গান হয়ে উঠবে না। স্বরলিপির সুরের ভেতরে যে সুর রয়েছে, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তবে-না গান!

ঐ "সুরের ভেতরে সুর" কথাটা আমি যখন বেতারে শুনি, তখন আমি কিশোর। তখন থেকেই সাহানা দেবীর এই কথাটা আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। গানে যন্ত্রানুষঙ্গের কথা বলতে গিয়ে "সুরের ভেতরে সুরের" প্রসঙ্গটি টানলাম, কারণ আমার মনে হয় তিনিই বড় মাপের যন্ত্রপরিকল্পক যিনি গানের পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে এই কাজটি করেন। বড় সংগীতকার এমনভাবে যন্ত্র বেছে নেন এবং সেগুলির জন্য সুর রচনা করেন যে গানের সুরের ভেতরকার সুরটি আসে বেরিয়ে। অন্তত লক্ষ্য থাকে সেদিকে।

আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ডে এই সুরের ভেতরকার সুর টেনে আনা

যন্ত্রসংগীত কত বিচিত্র প্রয়োগ পেয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও বোধহয় বিশাল এক গ্রন্থের আকার নিয়ে ফেলবে। আপাতত এটুকুই বলতে চাই যে যন্ত্রপ্রয়োগে কল্পনাপ্রবণতা, বৈচিত্র্য, দক্ষতা এবং চিন্তার সুনির্দিষ্টতা বাংলা গানে অতীতে আরও বেশি মাত্রায় ছিল। পাঁচ ও ছয়ের দশকে আজকের মতো প্রতি লাইনে এতবার করে কর্ড-প্রগ্রেশনের চল ছিল না। ফলে আবহটা ছিল আরও একমাত্রিক। কিন্তু বিভিন্ন যন্ত্রের সুচিন্তিত প্রয়োগে এবং পরিমিতিবোধের মাধ্যমে সুরের ভেতরকার সুরটি আরও বেশি পাওয়া যেত।

গত কয়েক বছরে বাংলা গানের যন্ত্রানুষঙ্গ রচনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্ড-পরম্পরার ব্যবহার এত বেড়ে গিয়েছে যে মাঝে মাঝে তা বাড়াবাড়ি মনে হয়। গানের প্রতি লাইনে এতবার কর্ড পালটালে একটা অনাবশ্যক অস্থিরতা এসে পড়ে। গানের জমিটা হয়ে যায় নড়বড়ে। সুর আর জমার সুযোগ পায় না। কর্ড-পরম্পরা অবশ্যই প্রয়োগ করা দরকার, তবে গানের মূল সুর, কথা আর মেজাজের দিকে কান খোলা রেখে। অনুপাতটা বুঝে নেওয়া জরুরি। অনুপাতে গরমিল হলে গান হয়ে পড়ে যন্ত্রানুষঙ্গসর্বস্ব। সমকালীন আধুনিক গানের এ এক সমস্যা।

তেমনি আবার যন্ত্রপ্রয়োগের ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ততা প্রশ্রয় পেলেও মুশকিল। অনেককে আজও বলতে শুনি— 'অমুক গানে বা অমুকের গানে বিদেশি যন্ত্রের প্রয়োগ বড় বেশি, বড্ড বিলিতি-বিলিতি শোনাচ্ছে। কারুর বসত বাড়িতে একসঙ্গে ছ'সাতটি পয়েন্ট থেকে বৈদ্যুতিক আলো জ্বললে এই আধিক্যহেতু কিন্তু সেই বাড়িটাকে কেউ বিলিতি-বিলিতি বলেন না। অথচ বৈদ্যুতিক আলোটাও তো 'বিদেশি উদ্ভাবন'। নিত্যজীবনে আমরা এমন অনেক কিছুই ব্যবহার করে থাকি, যেগুলি বঙ্গদেশে বা ভারতে আবিষ্কৃত হয়নি। নতুন মডেলের ঘড়ি, রেডিয়ো, মোটরসাইকেলে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কীবোর্ড, সিনথেসাইজারে আপত্তি কেন? দিনরাত আমরা হুদোহুদো 'বিদেশি' (অর্থাৎ ভারতে উদ্ভাবন হয়নি এমন) জিনিস ব্যবহার করছি বা সেগুলোর সংস্পর্শে আসছি। যে বাড়িগুলোয় আমরা থাকি, সেগুলোয় তো 'বিদেশি' স্থাপত্য, প্রযুক্তি মাখামাখি হয়ে আছে। গরমকালে বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে কি আমরা 'বিদেশি' হাওয়া খাই, বই বা খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে কি আমরা ভাবি যে এগুলো ছাপা হয়েছে 'বিদেশি' প্রযুক্তির সাহায্যে? তাহলে কেউ একটা স্যাকসোফোন বা ইলেকট্রিক গিটার বাজালে অমনি 'বিদেশি-বিদেশি' রব উঠবে কেন?

বেছে বেছে শুধু সংগীতের ব্যাপারে এই দেশি-বিদেশি ভেদাভেদের প্রবণতা আমার ছেলেবেলা থেকেই যুক্তিহীন ও হাস্যকর মনে হত।

আমাদের গ্রামের যাত্রায় অনেককাল যাবৎ ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট, ফ্লুট (ধাতুনির্মিত

'বিদেশি' বাঁশি) বাজানো হয়ে আসছে। সেই শিল্পীদের এবং তাঁদের গ্রাম্য শ্রোতাদের তো তাতে কিছু আসে-যায়নি।

'বিদেশি সুরের প্রভাব' কথাটাও বড় ঘনঘন শোনা যায়, পড়া যায়। এ আর-এক বিপদ। গত শতাব্দী থেকে যে আমরা বাংলা ভাষা লেখার সময়ে ইউরোপীয় যতিচিহ্নগুলো ব্যবহার করে আসছি, তার বেলা? পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান আমাদের চিন্তাধারাকে অনেক পালটে দিয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আধুনিক গণিতশাস্ত্র, প্রযুক্তি— এগুলোকে কি আমরা 'বিদেশি' মনে করি? আমাদের চিন্তায় যখন কার্ল মার্কস বা সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রভাব ফেলে, তখন কি আমরা সেটাকে 'বিদেশি চিন্তাধারার প্রভাব' মনে করি? সুর বা তাল তাহলে কী দোষ করল? কোনও সুরকে আলাদাভাবে 'বিদেশি' বলার যুক্তিটাই - বা তাহলে কোথায়?

আমার তো মনে হয় মানুষের মতো সুরতালছন্দেরও কোনও আলাদা জাত নেই। যন্ত্রও তাই। স্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার, ট্রান্সমিটার, টেলিফোন, ক্যামেরা, কলম, বলপেন, পেনসিল, চশমা, কম্পিউটার, রেলগাড়ি, বাস জলের পাম্প, ট্র্যাক্টরের মতোই পিয়ানো, বেহালা, গিটার, ট্রামপেট, সিনথেসাইজার, সাম্‌প্লার, ইলেকট্রনিক ড্রামস ইত্যাদি যন্ত্র। এগুলিকে আলাদাভাবে 'দেশি' বা 'বিদেশি' বলে চিহ্নিত করাটা বাহুল্য।

গানের সঙ্গে কোন যন্ত্র বাজছে, কীভাবে বাজছে সেদিকে ছেলেবেলা থেকেই আমার কান খোলা ছিল। যন্ত্রের ব্যাপারে ছিল আমার দুরন্ত কৌতূহল। একবার, মনে আছে— আমার বয়স তখন বছর আষ্টেক—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি রেকর্ড শুনে আমি একেবারে ক্ষেপে উঠলাম। গানটি ছিল "এল বরষা যে সহসা মনে তাই/ রিমঝিমঝিম রিমঝিমঝিম গান গেয়ে যাই।" তখন আমি বাবা মাকে ভয়ানক জ্বালিয়ে 'টাইসোকোটো' নামে একটি যন্ত্র কিনে ফেলেছি, —মানে কিনিয়েছি। যন্ত্রটি তারের, কিন্তু তাতে একটি কি বোর্ড আছে। কোলে শুইয়ে বাজাতে হয়। এক হাতে প্রেকট্রাম দিয়ে তারগুলোকে আর অন্য হাতের আঙুল দিয়ে কি-বোর্ডটাকে হারমোনিয়মের মতো বাজানো দরকার। কদিন খুব মেতে ছিলাম যন্ত্রটা নিয়ে। এতই মেতে উঠলাম যে আমার প্রিয় গানগুলির যন্ত্রানুষঙ্গে আমি এই 'টাইসোকোটোর' ভূত দেখতে শুরু করলাম। সতীনাথবাবুর ঐ গানটি ছিল দারুণ প্রিয়। ব্যস। আমি ধরেই নিলাম যে এ গানেও 'টাইসোকোটো' বাজানো হয়েছে। বন্ধুদের কাছে এই কথাটা বিজ্ঞের মতো বলেও দিলাম। তারপর, আমিই যে ঠিক বলছি তার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে স্বয়ং সতীনাথবাবুর মুখ থেকে কথাটা শোনার জন্য বাবা-মাকে অবিরাম জ্বালাতে লাগলাম। বাবা-মার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা

ছিল। বাড়িতে কালেভদ্রে আসতেনও। একদিন বাবা আমার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে সতীনাথবাবুকে আমার সামনেই বললেন—'এই যে, আমার ছেলে তোমায় কী যেন বলবে।' আমি সোৎসাহে শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলাম 'টাইসোকোটো' বেজেছে কিনা। সতীনাথবাবু স্মিত হেসে জানালেন— 'না, ওটা ম্যান্ডোলিন।' আমি এমন চুপসে গেলাম যে আমার টাইসোকোটোটাকেই বর্জন করলাম সেদিনই। সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর যন্ত্রটা বাজাইনি। বাসার এক কোণে পড়ে পড়ে নষ্ট হল বেচারি।

টাইসোকোটো তো গেল, কিন্তু সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সেই গানটি চলে এল কান থেকে গলায়। খুব গাইতাম। সালটা বোধহয় ১৯৫৮, টালিগঞ্জের একটি ছোট স্কুলের জন্য একটা চ্যারিটি অনুষ্ঠান হল বসুশ্রী সিনেমা হলে। কলকাতার অনেক নামজাদা কণ্ঠশিল্পী সেখানে গান গাইলেন। শিশুশিল্পী হিসেবে আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম গান গাওয়ার। সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে 'মধুর আমার মায়ের হাসি', আর সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের "এল বরষা যে সহসা মনে।'

'মধুর আমার মায়ের হাসি' গানটি আমায় শিখিয়ে ছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু (আমার বাবার বিশেষ বন্ধু) কণ্ঠশিল্পী নিখিলচন্দ্র সেন। আর সতীনাথবাবুর গানটি তো রেকর্ড শুনে তুলেই ফেলেছিলাম আগে। বিশিষ্ট গীতিকার সুরকার গোপাল দাশগুপ্তর ছেলে বাপ্পা, আমারই সমবয়সি, আমার সঙ্গে তবলা বাজাল। মনে আছে, গোপালবাবুর বাড়িতে কয়েকবার মহড়াও দিয়েছিলাম বাপ্পার সঙ্গে। যতদূর মনে পড়ে, বাবা আমার সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। আর দুই শিশু শিল্পীকে সাহস দেবার জন্য নিখিলচন্দ্র সেন মঞ্চে আমাদের সঙ্গেই বসেছিলেন।

গান শোনানোর ব্যাপারে লজ্জা বা ভয় আমার কোনওদিনই বিশেষ ছিল না। তাছাড়া ঐ অনুষ্ঠানে আমার আগে পরে কত বড় বড় শিল্পী যে গান শোনাবেন সেই বোধটাও ছিল না বোধহয়। তাই দুমদাম গেয়ে দিলাম। বাপ্পাও চমৎকার বাজিয়ে দিল। মনে আছে, বাঁয়া-তবলা ছিল বাপ্পার মাপে নয়, বড়দের মাপে। বাপ্পা কিন্তু সেই বেঢপ উচ্চতাকে আমলই দিল না।

সামনের সারিতে প্রথিতযশা শিল্পীরা বসেছিলেন। মনে আছে তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে হাসিহাসি মুখে গান শুনছিলেন। দুটি গান শেষ করে, প্রচুর করতালির মধ্যে বিজয়ীর মতো বাপ্পা আর আমি নেমে আসার পর শুনতে পেলাম ঘোষক শ্রোতাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে সুপ্রীতি ঘোষ দুই শিল্পীকে দুটি রৌপ্যপদক দেবেন। কিছুদিন পরে রুপোর মেডেল পেয়ে বেজায় আনন্দ হয়েছিল। মেডেলে নাম খোদাই করা

ছিল। ছাপা বা খোদাই করা অক্ষরে নিজের নাম পড়ে পড়ে আমার তো প্রায় চোখ খারাপ হবার যোগাড়!

ঐ ঘটনার পঁয়ত্রিশ বছর পর গ্রামাফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া সেদিনের ঐ দুই শিশুশিল্পীর একজনকে তার প্রথম গানের ক্যাসেট 'তোমাকে চাই'-এর জন্য 'গোল্ড ডিস্ক' দেন ঘটা করে। ততদিনে সে মাঝবয়সি পোড় খাওয়া একটা লোক। দু চোখে চালসে। খালি চোখে সে প্রায় কিছুই পড়তে পারে না। এই শারীরিক অক্ষমতার কারণে লোকটা ১৯৯৩ সালের ১৫ই মার্চ কলকাতায় নজরুল মঞ্চে 'গোল্ড ডিস্ক' টা নেবার সময় পড়তে পারল না সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো সোনার ডিস্কে কী লেখা। রাতে বাড়ি ফিরে চশমা লাগিয়ে পড়ে দেখল।

"Gold Disc Awarded to Suman Chattopadhyay For Outstanding Sale of His First H M V Cassette TOMAKE CHAAI"

"পারফরমেন্স" শব্দটি বোধহয় এই গ্রামাফোন কোম্পানির (এইচ এম ভি) কর্তাদের ঠিক পছন্দ নয়। বিক্রিটাই আসল কথা। "বিক্রি" কথাটা তাঁরা লিখছেন, অথচ ঠিক কটি মাল বিক্রি হয়েছে তা তাঁরা মাল তৈরি করনেওয়ালাকে জানাচ্ছেন না, যদিও জানানোটা, চুক্তি অনুযায়ী, তাঁদের কর্তব্য। সেই সঙ্গে "বিক্রি" কথাটা এত সুন্দর করে লিখেও মাল বেচার রয়্যালটির পুরো টাকাটা দিচ্ছেন না। অনুষ্ঠান শুরু হবার পাঁচ-সাত মিনিট আগে অত বড় কোম্পানির প্রেসিডেন্ট দুই বড় কর্মকর্তার সঙ্গে গ্রিনরুমে ঢুকে পকেট থেকে চল্লিশ হাজার টাকার একটি চেক বের করে ("This is a part royalty payment") শিল্পী'কে দিচ্ছেন। পকেট থেকে।—এই 'শিল্পী'দের মাল বেচার টাকায় কর্তারা ঠান্ডা ঘরে বসেন, ভালো গাড়ি চড়েন, ভালো মাইনে পান। সেই মাইনের টাকাটা যদি তাঁদের কর্তারা পকেট থেকে বের করে দেন তো প্রেসিডেন্ট মহাশয়ের মুখটা কেমন হবে কে জানে!

তাঁর মুখটি যেমনই হোক,আধুনিক বাংলা গানের মুখে যে প্রকারান্তরে কিছু চুনকালি এবং সে গানের এক কারিগরের মুখে যে অপমানের ভূসো মাখিয়ে দেওয়া হল তাতে সেই কারিগরের মনে কোনও সন্দেহ নেই।— বেঁচে থাক এর ৩৫ বছর আগে এক শিল্পীর কাছ থেকে পাওয়া ছোট্ট একটি রুপোর মেডেল যার আড়ালে কোনও ভাঁওতাবাজি, লোকঠকানো কারবার নেই। বেঁচে থাক গান গাইতে গাইতে দেখা সেদিনের সেই হাসিমুখগুলি। কোনও হাসি সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের। কোনও হাসি সুপ্রীতি ঘোষের। কোনওটি বা উৎপলা সেনের, দিলীপ সরকারের, শ্যামল মিত্রের, নিখিলচন্দ্র সেনের, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এতদিনে কত মুখ হারিয়ে গিয়েছে চিরতরে। ছোট দুটি ছেলের চোখে পৌঁছে

দেওয়া সেইসব মুখের প্রশ্রয় ও আশীর্বাদের স্মিত হাসি কিন্তু হারায়নি। তাতে স্নান করে একজন হয়ে উঠেছে গানের কারিগর ও পরিবেশক, আর অন্যজন, বাপ্পা, হয়ে উঠেছে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের গিটার শিল্পী। স্টাফ আর্টিস্ট।

এটাও এক আশ্চর্য যোগাযোগ। দুজনেই কিনা এখন গিটার বাজায়! ছেলেবেলায়, এমনকি প্রথম যৌবনেও আমি কখনও ভাবিনি যে আমি একদিন গিটার শিখব, বাজাব। গিটার যন্ত্রটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই। তবে হাওয়াইয়ান গিটারই বেশি দেখতাম। খুব ছেলেবেলায় একবার উত্তর কলকাতার কোনও এক সিনেমা হলে একটা অনুষ্ঠান শুনতে গিয়ে সুজিত নাথের গিটার শুনেছিলাম। মনে আছে, তিনি দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছিলেন। গিটারটা যে আমার পরিচিত হাওয়াইয়ান গিটার নয় তা আমি তখনই টের পেয়েছিলাম। ওটিকে যে স্প্যানিশ গিটার বলে তা অবশ্য জেনেছি অনেক পরে। এও মনে আছে যে সুজিত নাথ স্থির হয়ে বাজাচ্ছিলেন না, বাজনার তালে তালে মনের আনন্দে দুলছিলেন, প্রায় নেচে উঠছিলেন।

সুজিত নাথের গিটার যাঁরা শোনেননি তাঁরা ভাবতেও পারবেন না কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন তিনি। মঞ্চে তাঁর বাজনা শোনার সুযোগ আমি বেশি পাইনি। কিন্তু মঞ্চের অনুষ্ঠান ও গ্রামাফোন রেকর্ড মিলিয়ে তাঁর যে বাজনা আমি ছেলেবেলাতেই শুনেছি, আমার স্মৃতিতে তার স্পষ্ট ছাপ থেকে গিয়েছে।

সে সময়ে আর এক অসাধারণ গিটার শিল্পী (হাওয়াইয়ান ও স্টিল গিটার) ছিলেন কাজী অনিরুদ্ধ। অকালে মারা গেলেন তিনি।

গিটার শিল্পী হিসাবে বটুক নন্দীর নামও শুনতাম খুব ছেলেবেলায়। তিনিও স্টিল গিটার বাজাতেন।

গিটার শিল্পী সুজিত নাথের কথা বাবা-মার কাছেও শুনতাম। তাঁরা যখন বেতারে ও রেকর্ডে গান গাইতেন সুজিত নাথ তখন বাজাতেন তাঁদের সঙ্গে। তেমনি শুনতাম সুরেন পালের কথা। তিনি বাজাতেন ম্যান্ডোলিন। পরে সুরেন পাল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে চাকরি করতেন। নানান সময়ে দেখা হত তাঁর সঙ্গে। কিন্তু কখনও ম্যান্ডোলিন বাজাতে দেখিনি তাঁকে।

আধুনিক সংগীতের জগতে যন্ত্রশিল্পীদের ভূমিকা যে কত বড় তার পরিচয় প্রথম পাই ১৯৫৮ সালে শিশুমহলে গান গাইতে গিয়ে। আকাশবাণী কলকাতার শিশুমহল অনুষ্ঠানটি তখন পরিচালনা করতেন ইন্দিরাদি। ছোটদের দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়ে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তখন আবার ছিল লাইভ ব্রডকাস্ট। কোথাও ভুলচুক হয়ে গেলে আর শুধরে নেওয়া সম্ভব নয়।

মনে আছে, আকাশবাণীর একটা বড় স্টুডিয়োয় একপাশে ইন্দিরাদি বসে

আছেন, অন্যদিকে বাচ্চারা। মাঝখান একটা ঢাউস মাইক্রোফোন। ইন্দিরাদি প্রথমেই বলতেন: "ছোট্ট সোনা বন্ধুরা আদর আর ভালোবাসা নাও। কী খবর, ভালো আছ তো সব?"— ছোটরা ওমনি সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠত "হ্যাঁ-া-া।"

তারপর ইন্দিরাদি একে একে হাজির করতেন শিশুশিল্পীদের। কেউ বলত কবিতা। কেউ বা ছোট্ট একটা গল্প। কেউ গাইত গান।

বেতারে (শিশুমহলে) আমার গাওয়া প্রথম গানটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বাদল ধারা হল সারা।' বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে গানের বাজনার মহড়া হয়ে গেল ছোট করে। নানান যন্ত্রের সঙ্গে সেই প্রথম গাইছি। বাড়িতে হারমোনিয়মের সঙ্গে গাইতাম। আকাশবাণীতে তখন হারমোনিয়ম বাজত না। দেখলাম তানপুরা, এসরাজ বাঁশি, বেহালা, তবলা ইত্যাদি যন্ত্র নিয়ে শিল্পীরা বসে আছেন।

আমার স্পষ্ট মনে আছে এসরাজ বাজাচ্ছিলেন প্রবীণ শিল্পী বিজলীবাবু। আর হিমাংশু বিশ্বাস বাজাচ্ছিলেন বাঁশি। অন্য যন্ত্রগুলি কারা বাজাচ্ছিলেন, একদম ভুলে গিয়েছি। কিন্তু যা ভুলিনি এবং জীবনেও ভুলব না, একজন শিশু শিল্পীর সঙ্গে ওই বয়স্ক যন্ত্রশিল্পীরা কতটা মন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সঙ্গত করেছিলেন। মনে আছে বিজলীবাবু আমায় সেদিন বলেছিলেন যে এককালে তিনি আমার বাবা-মার সঙ্গেও বাজাতেন।

কোনওদিন ভুলতে পারব না হিমাংশু বিশ্বাসের সেই বাঁশি। না,আকাশবাণীর স্টুডিয়োয় বসে গান গাইতে ভয় পেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আমি গান গাইছি, আর বয়স্ক সব যন্ত্রশিল্পী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একমনে বাজিয়ে যাচ্ছেন— এই ব্যাপারটা আমার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করছিল। হিমাংশু বিশ্বাসকে তার অনেক আগেই আমি মঞ্চে বাজাতে দেখেছি। তাঁর একটি অর্কেস্ট্রাও ছিল। মনে আছে , লোকে খুব পছন্দ করত তাঁর অনুষ্ঠান। সেই হিমাংশু বিশ্বাস কিনা আমার চোখের সামনে আমারই সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছেন এবং অত যত্ন করে বাজাচ্ছেন—এটা আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

ছোটবেলা থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের যন্ত্রশিল্পীদের কাছে যে প্রশ্রয়, স্নেহ,ভালোবাসা পেয়েছি তা ভোলার নয়। তেমনি একটা সময়ে— ততদিনে অবশ্য আমি বড়দের অনুষ্ঠানে গাইছি—এও দেখেছি যে আগেকার সেই সম্পর্কের সুর কোথায় যেন কম লাগছে। সে যাই হোক, ছেলেবেলাটা তো খুব গুরুত্বময় একটা অধ্যায়। সে সময়ে দেখেছি প্রবীণ যন্ত্রশিল্পীরা ছোটদের গানের সঙ্গে বাজাতে বসে তাদের অবহেলা তো করছেনই না, বরং পূর্ণ

নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কখনও দেখিনি কেউ ব্যাজার মুখ করে আছেন।

বিভিন্ন যন্ত্রশিল্পীর পাশে চুপচাপ বসে আকাশবাণী কলকাতার 'বাবাজি' (কপালে তিলকটাও ছিল) প্রাণ দিয়ে মন্দিরা বাজাচ্ছেন, ফণীবাবু সমস্ত অন্তর দিয়ে আনন্দলহরী বা দোতারা বাজাচ্ছেন— এসব দৃশ্য আর কখনও ফিরে আসবে না। হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশি থেমে গিয়েছে সেই কবে। বিজলীবাবু কোথায় জানি না। জানি শুধু এটুকুই যে তাঁদের স্নেহ, ভালোবাসা, নিষ্ঠা আমার সংগীতবোধকে, জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক একইভাবে কালক্রমে আমায় সমৃদ্ধ করেছেন অলোকনাথ দে, শ্যামল বসু, কার্তিক বসাক, অর্ধেন্দু ঘোষ,আলি আহমেদ হুসেন, বরুণ পাল, সমীর চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কত সংগীত শিল্পী, কত শিক্ষক যে চলার পথে আমার হাত ধরেছেন, কত হাত যে আমি আঁকড়ে ধরেছি, কত মানুষের কাছ থেকে যে আমি আমার পুষ্টি সংগ্রহ করে নিয়েছি, কত সংগীতকার ও শিল্পীর কাছ থেকে যে আমি শিক্ষা নিতে চেষ্টা করেছি তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

আকাশবাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, গ্রামাফোন রেকর্ডে বা গানের জলসায় আধুনিক গানের যেসব শিল্পীর গান শুনতাম এককালে, তাঁরা সকলেই গুণী। সাত-আট-ন' বছর বয়সে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় গায়ক। দাদা ছিল তখন থেকেই হেমন্তপন্থী। এ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কখনও কখনও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান গোছের ঝগড়াও হত। আমি বলতাম— কিরে, সতীনাথের অমুক গানটা তোর হেমন্ত পারবে? দাদাও সরোষে পালটা প্রশ্নে ঘায়েল করতে চেষ্টা করত আমাকে। কিন্তু সতীনাথের প্রতি আমার দুর্বলতা সত্ত্বেও সকলের গানই মন দিয়ে শুনতাম। শচীন দেববর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, পান্নালাল ভট্টাচার্য, অখিলবন্ধু ঘোষ, তালাত মাহমুদ, দিলীপ সরকার, সনৎ সিংহ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, মান্না দে, মৃণাল চক্রবর্তী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, বাণী ঘোষাল, গায়ত্রী বসু, গীতা দত্ত, ইলা বসু, লতা মঙ্গেশকর, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়—এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলতে পারি এতগুলো নাম। আরও নাম বলে যাওয়া যায়। অনুরোধের আসরে যখন একের পর এক গান হত, তখন সবগুলোই মন দিয়ে শুনতাম। অসংখ্য গানের সুর এবং অনেক গানের কথা মনে থাকত। নিজের মনে বসে বসে একের পর এক গান গেয়ে যেতাম গুনগুন করে— বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া। পরে যখন বছর দশ-এগারো বয়সে হারমোনিয়মটা বেশ সড়গড় হয়ে গেল তখন তো ঐ

যন্ত্রটি বাজিয়ে নানান শিল্পীর গাওয়া গান একের পর এক গেয়ে গিয়েছি। আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে আজও আমি ওইসব গান গেয়ে দিতে পারি, যদিও বেশ কিছু বছর হয়ে গেল ঐ গানগুলির চর্চা করি না নিয়মিত। পুরোনো গানের কোনও খাতা আমার আজও নেই। কিন্তু সম্পর্কটা এবকমই এতই জোরালো ছিল যে অজস্র আধুনিক গান আমার আজও নির্ভুলভাবে মনে আছে।

ছেলেবেলা থেকে শুরু করে কখনও কোনও শিল্পীর প্রতি নিরঙ্কুশ পক্ষপাতিত্ব ছিল না। গানটা যদি পছন্দ হত, গাইতে ইচ্ছে করত তো গাইতাম। সে গান যাঁরই গাওয়া হোক না কেন। ফলে কোনও বিশেষ কণ্ঠশিল্পীর গায়কীর সুনির্দিষ্ট ছাপ আমার ওপর পড়েনি বোধহয়। যাঁর গায়কীর যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য আমার ভালো লাগত সেটাই নিজের মতো করে গলায় ধরতে চেষ্টা করতাম।

আমি খেয়াল শিখতে শুরু করার কিছুকাল পর বাবা অবশ্য আমায় একাধিকবার বলেছেন : "মান্না দের মতো বড় গলায় গাইতে চেষ্টা করবি।" অর্থাৎ তাঁর মতো দরাজ গলায়, বড় পরিসরে, ছোটবড় কাজগুলির প্রতি পূর্ণ সুবিচার করে, বিভিন্ন আঙ্গিকে দখল রেখে। এইজন্য বাবা রেওয়াজের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার বলতেন। "মান্না দের অমুক জিনিসটা নকল কর বা অবিকল ওইরকম কর অথবা গলার আওয়াজটা বা গানের ভঙ্গিটা ঠিক ওর মতো করেনে"— এমন উপরামর্শ শুধু তিনি কেন, কোনও শিক্ষকই আমায় কারুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করে দেননি। আমি যেন আমি থাকি, আমি যেন হয়ে উঠি, আমার যেন ক্রমবিকাশ হয়— এর ওপরেই বাবা জোর দিতেন। খুব বেশি বক্তৃতা করতেন না এ বিষয়ে। মাঝে মধ্যে, আমাকে গান গাইতে বলে, আমার গাওয়ার ত্রুটিগুলো নিষ্ঠুরভাবে ধরিয়ে দিতে দিতে অল্প কথায় নির্দেশ বা পরামর্শ দিতেন তিনি। ষ্টয়ের দশকে তো তাঁকে বার বার বলতে শুনেছি: "তোর যা গলা, তোর যা টাইপ', তুই সাত তাড়াতাড়ি ফলের আশা করিস না। তুই রেওয়াজ করে যা। গেয়ে যা। একদিন দেখবি হতে শুরু করেছে। তখন তুই অনেকদিন ধরে গাইতে পারবি।" আমার ক্রমবিকাশের দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি

সেই ক্রমবিকাশের পথে ১৯৫৯ সাল নাগাদ পেয়ে গিয়েছিলুম এমন এক সংগীত শিক্ষকের দেখা ও সান্নিধ্য, যাঁর শিক্ষার ফল ধরতে সময় লেগে গিয়েছে প্রায় তিরিশ বছর কি তারও বেশি।

তাঁর নাম ছিল ফাদার পিন্‌টো। কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঐ স্কুলে আমি বছর দুই পড়েছিলাম। সে সময়ে, যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৫৯-৬০ সালে সেন্ট লরেন্স স্কুল প্রযোজনা করেছিল 'ট্রেজার আইল্যান্ড' পালা। স্টিভেনসনের মূল উপন্যাসটি অবলম্বনে পালাটি লেখা হয়েছিল। আমার ধারণা, ফাদার পিন্‌টো যাকে বলে অপেরায় "লিবরেটো" অর্থাৎ গীতিনাট্য লিখেছিলেন। সুর সংযোজনা ছিল তাঁরই। সংগীত পরিচালনার ভারও ছিল তাঁরই হাতে। গোটা পালাটাই হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। সুর রচনা ছিল পুরোপুরি পাশ্চাত্য অপেরার আঙ্গিকে। তবে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী অপেরার আঙ্গিকে নয়, কারণ সেই আঙ্গিক অতি দুরূহ, দীর্ঘ শিক্ষাসাপেক্ষ. স্কুলের ছেলেদের দিয়ে ধ্রুপদী আঙ্গিকে বিলিতি অপেরা প্রায় অসম্ভব। ফাদার পিন্‌টো তাই বেছে নিয়েছিলেন সিরিয়াস লঘু সংগীতের আঙ্গিক। সেটাও কিন্তু ভারতীয় কিশোরদের সহজত হবার কথা নয়। 'ট্রেজার আইল্যান্ডের' অভিনেতাদের তাই 'বিলিতি লঘু আঙ্গিকে গাওয়ার কায়দা, স্বরপ্রক্ষেপের বিভিন্ন ধরন, যথাযথ উচ্চারণ এবং অভিনয় কৌশল শিখতে হয়েছিল নিয়মিত বেশ কয়েক মাস ধরে। তালিমের ধকল ছিল অত্যন্ত কঠোর। ফাদার পিন্‌টো বিন্দুমাত্র মাঝামমতা বা শৈথিল্যের ধার ধারতেন না তালিমের ব্যাপারে। নিজেও ছিলেন নিরলস কর্মী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ানো বাজিয়ে যেতেন, গানগুলো দেখিয়ে দিতেন, নাটকের খুঁটিনাটি দিক বুঝিয়ে দিতেন। কিশোর শিক্ষানবিশদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতেন কড়ায় গণ্ডায়।

জীবনে অনেক সংগীত শিক্ষক দেখেছি। ফাদার পিন্‌টোর মতো এমন ক্লান্তিহীন, অনাপোসী, খুঁতখুঁতে, নাছোড়বান্দা শিক্ষক আমি বেশি দেখিনি। আমার বাবাও সংগীত শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। "ভালো হয়েছে"—কথাটা বাবার কাছে গান শেখার সময়ে অথবা ছেলেবেলা থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত গান শোনাতে গিয়ে আদায় করতে পেরেছি বড়জোর বার চারেক। ফাদার পিন্‌টোর কাছে তো আর অতকাল তালিম নেওয়ার সুযোগ পাইনি। তাঁর শিক্ষা পেয়েছিলাম একটানা কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু তাতেই তিনি কাজখাম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। তখন বয়স কম ছিল। তাড়া খেলে কোলের বাড়ি খেলে 'ভালো হল না' মন্তব্যটা শুনলে অভিমান হত। রাগ হত। কিন্তু আজ, মাঝবয়সে পৌঁছে বুঝতে পারি—ভাগ্যিস অমন তালিম পেয়েছিলাম! ভাগ্যিস বেশি প্রশংসা শুনিনি শিক্ষকদের কাছে। তাঁরা আমার ত্রুটিগুলো ভাগ্যিস নির্মমভাবে ধরিয়ে দিতেন এবং সমালোচনা করলেও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিতেন।

আমি মোটামুটি গান গাইতে পারি শুনে ফাদার পিন্‌টো আমায় ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। তখন 'ট্রেজার আইল্যান্ডের' জন্য গায়ক অভিনেতা নির্বাচন চলছে। বেশ রাশভারী মানুষ। একটা গান শুনতে চাইলেন। আমার মনে আছে আমি তাঁকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া ও গাওয়া "তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ" গানটি শোনালাম। খুব মন দিয়ে শুনলেন। বললেন —"এটা তো

রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়! বাঙালি ছেলেমেয়েদের গান শোনাতে বললে সচরাচর তারা রবীন্দ্রনাথের গান শোনায়। তুমি যে দেখছি অন্যরকম।"

প্রথমে ভাবলাম রবীন্দ্রসংগীত না শুনিয়ে ভুল করে ফেলেছি। তারপর দেখি প্রবীণ সংগীতজ্ঞ ধর্মযাজক তারিফ করছেন। বলছেন —"এটাই তো দরকার। যে গান গাইতে ভালো লাগবে সেই গান গাইবে। বেশি জাতবিচার কোরো না। শুধু রবীন্দ্রসংগীতে আটকে থাকবে কেন? এদেশে, সারা দুনিয়ায় কত অজস্র ভালো ভালো গান আছে। সেগুলো গাইবে কে?"—ফাদার পিন্‌টোর একটি কথাও আমি ভুলিনি। তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর কেটে গেল। তবু, আজও চোখ বুজে একটু ভাবলেই দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। আমি তাঁর প্রতিটি কথা আজও শুনতে পাই, তাঁর চোখমুখের ভাবগুলো দেখতে পাই। সমানে হাতে পাকানো-সিগারেট খেতে খেতে ফাদার পিন্‌টো হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কিশোরকুমারের গাওয়া একটি মজার গান খুব চলেছিল: "শিং নেই তবু নাম তার সিংহ।"—ফাদার পিন্‌টো, সেই পক্ককেশ রাশভারী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষক, আমায় একেবারে হতবাক করে দিয়ে ওই গানটির কথা বললেন। সেই সঙ্গে উপদেশ দিলেন। "ওইরকম নির্লজ্জভাবে গান গাইতে হবে। যে গান যেভাবে গাওয়া দরকার, সেভাবে গাওয়া চাই। নয়তো গান হবে না।"

গান মানেই তো অভিব্যক্তি, ভাবপ্রকাশ, অভিনয়—এই কথাটা ফাদার পিন্‌টো কয়েক মাস ধরে নিয়মিত তালিম দিয়ে দিয়ে আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ করা দরকার যে আমার বাবাও রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর সময়ে বার বার 'ভাব'-এর ওপর জোর দিতেন। শুধু ঠিক সুরে ঠিক তালে গাইলেই হবে না। ঠিক ভাব দিয়ে, ঠিক লয় রেখে গাইতে হবে— এই ছিল তাঁর দাবি। বাবা আমায় বলেছিলেন, নিজে গান গাওয়ার আগে তিনি ভেবে নিতেন কোন্ জায়গাটা কীভাবে গাইবেন। একই অংশ নানাভাবে গেয়ে গেয়ে তিনি যাচাই করে নিতেন কোন্ ভাব, কোন্ ধরনটা বেশি উপযুক্ত। প্রশ্নটা আঙ্গিকের। সাহানা দেবীর বলা সেই কথাটা আবার এসে পড়তে চায়: "সুরের ভেতর সুর।"

আমার বিশ্বাস, তিনিই ভালো সংগীত শিক্ষক যিনি শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীকে ওই ভাব ও আঙ্গিক সম্পর্কে সজাগ করে দেন এবং আঙ্গিকটাকে ফোটানোর পদ্ধতিটাও দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

'ট্রেজার আইল্যান্ড'-এ আমি ছিলাম ডক্টর লাইভ্‌-এসির ভূমিকায়। আর যারা গান গেয়েছিল, অভিনয় করেছিল, তাদের সকলের নাম আমার মনে নেই। তবে একজনকে আমি এখনও ভুলিনি। তার নাম ছিল পরশ দত্ত। কী সুন্দর, কী সাবলীলভাবে পরশ যে গাইত আর অভিনয় করত, কী বলব! আমার ধারণা, অসামান্য সম্ভাবনা ছিল তার মধ্যে।

'ট্রেজার আইল্যান্ড'-এ গাইতে ও অভিনয় করতে গিয়ে (গোটা পালাটার সমস্তটাই ছিল গান আর গান) বিভিন্ন ধরনের স্বরপ্রক্ষেপ, বিভিন্ন আঙ্গিক শিখতে হয়েছিল। শুধু নিজের অংশগুলো নয়, পুরো পালাটাই কণ্ঠস্থ করতে হয়েছিল আমাদের। অল্পবয়সে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুই সহজে শিখে নিতে পারে। বয়সটা কাঁচা ছিল বলেই বোধহয় ইউরোপীয় গায়ন-পদ্ধতি, হরেকরকম ইউরোপীয় সুর ছন্দ, গানের মধ্যে দিয়ে বাচনভঙ্গি ও সংলাপ বলার ধরন, এগুলো অনেক সহজেই শিখে নিতে পেরেছিলাম। ইউরোপীয় সংগীতের ব্যাকরণ একটুও শেখাননি ফাদার পিন্‌টো। শিখিয়েছিলেন লঘু ইউরোপীয় অপেরার গাওয়ার আঙ্গিক ও প্রযুক্তি। এমনভাবে শিখিয়েছিলেন যে সেই পালার অনেক গান আমার আজও হুবহু মনে আছে। প্রয়োগপদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা যে কত দূরপ্রসারী ছিল তা টের পেতে আমার অনেকগুলি বছর লেগেছে।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে তারপর চোদ্দো বছর ধরে আমি কত ধরনের বাংলা গান শিখেছি, বারো বছর খেয়াল শিখেছি, গেয়েছি, ভজন শিখেছি, কত রকমের গান গাইতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু গাওয়ার আঙ্গিক স্বরপ্রক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফাদার পিন্‌টোর কাছে পাওয়া তালিমের কিছুই আমি দীর্ঘকাল কাজে লাগাতে পারিনি। সচেতনভাবে ভাবিনি এগুলো নিয়ে দীর্ঘকাল। গানের ভাব সম্পর্কে বাবা আমায় অনেক সময় যা যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার কোনও কিছুই যেন ধরতে পারিনি কণ্ঠে।— তারপর যেদিন নিজে গান লেখা ও সুর করলাম, তারপর থেকে ধীরে ধীরে অতীতের শিক্ষাগুলো অবচেতন মনের কোনও গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে যেন বেরিয়ে আসতে চেয়েছে বাইরে। আমায় ক্রমান্বয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। সংগীত এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। অতি জটিল তার প্রকৃতি। স্মৃতির কোন্ ফোকর থেকে কোন্ জিনিস যে কখন বেরিয়ে আসে কেউ বলতে পারে না। '—আমার গানের আঙ্গিক নিয়ে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে আমার সচেতনতা, তার মূলে কৈশোরে পাওয়া ফাদার পিন্‌টোর শিক্ষা কাজ করে গিয়েছে টের পাই।

ট্রেজার আইল্যান্ড পালাটি দস্তুরমতো রপ্ত করতে গিয়ে নানান রসের স্বাদ পেয়েছিলাম। তার একটি ছিল 'হিউমর'। —আমরা সচরাচর যেসব বাংলা গান শুনি সেগুলি হয় খুব 'সিরিয়াস' আর নয়তো বেশ চটুল। বেশ কিছু বছর ধরে তো বোকা বোকা ছ্যাবলামোর দিকটাও এসে পড়েছে বাংলা আধুনিক গানে। অন্যদিকে, ছেলেবেলা থেকে যেসব সিরিয়াস বাংলা গান শুনে এলাম তার অধিকাংশই হয় গুরুগম্ভীর, নয়তো ভাবাবেগপূর্ণ। বুদ্ধিদীপ্ত রঙ্গরসিকতা, হাস্য পরিহাস, সূক্ষ্ম হিউমর আধুনিক বাংলার গানে বড় কম। আশ্চর্য, রজনীকান্ত—

যার ভক্তিরসাশ্রিত গানগুলি বেশি শোনা যায়— বেশ মজার গান লিখে গিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও। তাঁর একটি গান তো হাসি নিয়েই। গানটি এমনভাবে বাঁধা যে হাসার মতো করে গাইতে হবে। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে একবার শুনেছিলাম। বেজায় কঠিন গান। রবীন্দ্রনাথেরও মজার গান আছে, ব্যঙ্গের গান আছে—যদিও সংখ্যায় কম। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাঙালি গীতিকার-সুরকাররা 'হিউমর' জিনিসটাকে বিশেষ আমল দেননি। পরে, 'প্যারোডি গান' নামে একটি ব্যাপার চালু হয়। জনপ্রিয় কিছু গানের সুরে কৌতুকময় কথা জুড়ে কোনও কোনও প্যারোডি শিল্পী গান বানিয়েছেন, গেয়েছেন। তবে অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সেই 'কৌতুক গীতি' থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির ভাগ কমে গিয়ে কাতুকুতু দেওয়া হাসি আর কখনও কখনও নির্ভেজাল ছ্যাবলামোর বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেতে থাকে। হিউমরের অভাব আধুনিক বাংলা গানের নানান অভাবের অন্যতম।

'ট্রেজার আইল্যান্ড'-এ গাইতে গিয়ে কিন্তু একাধিক গানে হিউমর ও স্বাস্থ্যকর মজার সন্ধান পেয়েছিলাম। বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিকের ছিল আশ্চর্য সাযুজ্য। তাই বাড়িতে খালি গলায় গাইতেও ভারি ভালো লাগত। দারুণ মজা পেতাম। এই ধরনের মজা পরিচিত বাংলা গানগুলো আমাকে এনে দিত না। তবে অনাবিল মজা, শব্দ নিয়ে, ভাবনা নিয়ে খেলার মজা ততদিনে পেয়ে গিয়েছি—বাংলা গান নয়— অন্য এক উৎস থেকে। সেই উৎসের নাম সুকুমার রায়। দেশ বিদেশের আবহমান সংগীত আমায় যত পুষ্ট করেছে, সুকুমার রায়ের লেখাগুলি থেকে পাওয়া পুষ্টি তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। ছেলেবেলা থেকে এভাবে আমায় আর কেউই যেন ভাবাতে পারেননি বলে মনে হয় আজ এক এক সময়ে।

কৈশোর থেকে আমার কল্পনা ও ভাবনার যে জগৎ, তাতে যত রাজ্যের সুর আর ছন্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে রাজত্ব করে গিয়েছেন সুকুমার রায় এবং অন্য একটি কারণে—অবন ঠাকুর। সুকুমার রায়ের লেখা থেকে পেতাম বুদ্ধিদীপ্ত মজা, আজগুবি চিন্তার অপার আনন্দ, শব্দ আর বাক্য, ভাষা আর ভাবনা নিয়ে নতুন নতুন খেলার খোরাক। অবন ঠাকুরের লেখা থেকে পেতাম অদ্ভুত এক স্নিগ্ধতা, প্রাঞ্জলতা, শব্দ আর বাক্য, ভাষা আর ভাষাময় ছবি বা ছবিময় ভাষার অন্তরঙ্গতম একটা জগৎ। আবোল-তাবোল আর নালক, পাগলা দাশু আর ক্ষীরের পুতুল, হযবরল আর রাজকাহিনি— আমার ভাবনা, কল্পনা, আমার একার জগৎটা ছিল এইসব মেরুর নিরিখে তৈরি। সেখানে শব্দ, বাক্য, ছবি, গল্প, পদ্য, গদ্য, সুর, তাল, ছন্দের ছিল নিরন্তর আসা যাওয়া। এরাই ছিল আমার নিভৃতে খেলার সাথি। বাংলা গান থেকে আমার কথার খিদেতেষ্টা তেমন মেটেনি কখনও। ছেলেবেলা থেকেই আমি বোধহয় সেই কারণেই সুকুমার রায়

আর অবন ঠাকুরের বাক্যে বাক্যে জেড়ে দিয়েছিলাম নিজেকে।

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের মজায় মজতে শুরু করেছি এমন সময়ে একদিন বেতারে শুনলাম জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে আবোল-তাবোলেরই একটি কবিতা 'গন্ধবিচার।' তখন আমার বয়স আট কি ন'বছর। গান শুনে এত মজা, এত আনন্দ তার আগে কখনও পাইনি। গানটি ছিল সমবেত কণ্ঠে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ নিজে। তাঁর সঙ্গে আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা। সকলের নাম আমার মনে নেই। গানটি ছিল আকাশবাণীর নিজস্ব প্রয়োজনা—স্টুডিয়োয় রেকর্ড। কাজেই বেতার ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যমেই ও গান শোনার উপায় ছিল না। রম্যগীতি অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য প্রতি সপ্তাহে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম।

ওই অনুষ্ঠানে তারপর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুর দেওয়া সুকুমার রায়ের আরও দুটি কবিতা-গান শুনেছিলাম: 'রোদে রাঙা ইটের পাঁজা' আর 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম'। তিনটি গান তিন রকমের অভিজ্ঞতা। কবিতাগুলি আগেই পড়া ছিল। সুকুমার রায়ের অমন কবিতা থেকে যে অত উপভোগ্য গান হতে পারে কে জানত! জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে গাওয়া ওই তিনটি গান আমার মগজের একেবারে ভেতরে নাড়া দিয়েছিল। শুনলেই চনমন করে উঠত মাথার ভেতরটা। জানি না এই গানগুলি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ পরে ক্যাসেট আকারে বাজারে ছেড়েছেন কিনা। মূল রেকর্ডিং-এ গানগুলি যেভাবে গাওয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবেই শ্রোতা সাধারণের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া দরকার।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আধুনিক সংগীতে যে অবদান রেখেছেন তার হিসেব আজও নেওয়া হল না। অবশ্য রবীন্দ্রোত্তর যুগে আমাদের দেশে আধুনিক সংগীতের ক্ষেত্রে যা যা হয়েছে, কারা কোন্ কাজ করে গেছেন তার কোনও হিসেবই ভালো করে নেওয়া হয়নি।

খুব ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে বিভিন্ন সময়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি গ্যারিস্টন প্রেসের রেডিয়ো স্টেশনে। তারপর ইডেন গার্ডেনসের আকাশবাণী ভবনে। বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে তো বটেই। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে।

একটা দৃশ্য স্পষ্ট মনে আছে। সে বোধহয় '৫৯-৬০' সাল। এস আর দাশ রোডের বাসায় জ্ঞানবাবু এসেছেন। মা রবীন্দ্রনাথের 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে' গানটি গাইছেন। বাবা হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন । জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তন্ময় হয়ে শুনছেন। ন'দশ বছর বয়সি আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম আর দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে হারিয়ে গিয়ে তাঁরা তিনজন কেমন যেন অন্য একটা জগতে চলে গিয়েছিলেন।

এই জ্ঞানবাবুকেই আমি দেখেছি আকাশবাণীর স্টুডিয়োয়, অন্য মূর্তিতে। তাঁর সুরে নির্মলা মিশ্র গাইছেন 'বসন্ত কি এমনি করে জাগে'। স্টুডিয়ো রেকর্ডিং হচ্ছে। জ্ঞানপ্রকাশ সংগীত পরিচালনা করছেন। অলোকনাথ দে বাঁশি ও পিয়ানো দুটোই বাজাচ্ছেন। বলা বাহুল্য একসঙ্গে নয়, পালা করে। ছ' মাত্রায় বাঁধা আধুনিক গান। নির্মলা মিশ্র গাইছেন আর তাঁর সামনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তাল ও ছন্দ দেখিয়ে যেন দুলে দুলে নাচছেন। সে এক অনবদ্য দৃশ্য। নির্মলা মিশ্র গাইছিলেনও অসাধারণ।

নির্মলা মিশ্রকেও সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তাঁর দাদার সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতেন এস আর দাস রোডের বাড়িতে। নির্মলা গাইতেন। আমরা সব মোহিত হয়ে শুনতাম। বাবাকে লক্ষ্য করতাম। গানের একেবারে ভিতরে ঢুকে গেছেন যেন। সে যে কী গান শুনেছি নির্মলার কাছে কী বলব! 'পাহাড়ে বিকেল নামে হিমেল হাওয়ায়'— এস আর দাস রোডের ছোট্ট ঘরে নির্মলা মিশ্র গেয়েছিলেন সেই কোন যুগে। সেই থেকে তাঁর অসামান্য গায়কী-সমেত গানটি যেন স্থিরচিত্র হয়ে গেছে আমার চেতনায়। ঘরে বসে খুব কাছ থেকে আরও অনেক গান শুনেছিলাম ছেলেবেলায়।

বাবার দৌলতে শিল্পীদের আনাগোনা লেগেই থাকত আমাদের বাড়িতে। পঙ্কজ মল্লিক আসতেন। দীর্ঘদেহী এই মানুষটি ছিলেন এক বিস্ময়। ছেলেবেলায় আর কতটা বুঝতাম নিজে থেকে। তিনি এলে বাবা-মার হাবভাব থেকে টের পেতাম যে এ অতিথি নিশ্চয় খুব বড় মাপের মানুষ।

ছেলেবেলায় একবার শিশুমহলে গান গেয়েছি, তার আগে বা পরেই ছিল পঙ্কজ মল্লিকের সংগীত শিক্ষার আসর। মনে আছে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। পঙ্কজবাবু আমাদের পাকড়াও করলেন। টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। গাড়িতে করে গেলাম নিউ মার্কেটে। পঙ্কজবাবু বললেন কেক খাওয়াবেন তিনি আমাকে। গাড়ির চালক গেলেন কেক আনতে। পঙ্কজ মল্লিক রাস্তার একপাশে দাঁড় করানো গাড়িতে বসে তাঁর কাঠের সুরপেটিটাকে কোলে নিয়ে 'বেলো' করতে লাগলেন। অন্য হাতে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন 'আয় তো বাবা, দেখি সুর লাগা। এমনি করে সুর লাগাতে শেখ।'—এই বলে তিনি নিজে প্রথমে 'সা' স্বরটি গাইলেন। আমাকে দিয়েও গাওয়ালেন বারবার। মনে আছে, বুকের কাছে ন' দশ বছরের একটি ছেলেকে টেনে নিয়ে সেই বিরাট মানুষটি অসীম স্নেহে বলছেন—"বাবা সুর লাগাবি সোজা। 'সা' মানে 'সা'। 'নিসা' নয়। সোজাসুজি সুর লাগাবি।"—আমার কানের কাছে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর আজও বেজে চলেছে যেন। বেজে চলেছে তাঁর কণ্ঠনিসৃত সুর, একটি মাত্র স্বর 'সা'— সেই

কোনকালে যা বেজে উঠেছিল তাঁর ঐতিহাসিক কণ্ঠে একটা মোটরগাড়ির ভেতর সুরপেটির সঙ্গতে কলকাতার রাস্তার ওপর। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সুর শুনছিলাম, গলা মেলাতে চেষ্টা করছিলাম।

অত আদর করে, নিবিড়ভাবে আর কেউ কোনওদিন আমায় সুর লাগাতে শেখায়নি। হয়তো তা সম্ভব নয়। অমন মুহূর্ত জীবনে একবারের বেশি আসবেই বা কেন।

তার বছর বারো-তেরো পর ওই পঙ্কজ মল্লিককেই দেখেছিলাম অন্য রূপে আকাশবাণীর স্টুডিয়োয়। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে আকাশবাণীর বিশেষ প্রযোজনায় গান গাওয়ার ডাক পড়েছিল। পুরুষদের মধ্যে আমি ছাড়াও ছিলেন সুবাস মিত্র। অসাধারণ সুন্দর গান গাইতেন তিনি। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে কে কে ছিলেন আজ আর তা দুর্ভাগ্যবশত মনে নেই। সেই গীতি আলেখ্যটি ছিল বাণীকুমারের লেখা। সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

একাধিক মহড়ায় নিরলসভাবে গেয়ে গেয়ে পঙ্কজবাবু আমাদের শেখালেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে ছাড়লেন আমাদের কাছ থেকে।

রেকর্ডিং-এর দিন এসে গেল। সকাল থেকে শুরু। অনেক যন্ত্রী। মনে আছে 'মন্দ্রবাহার' যন্ত্রটি বেজেছিল। বিরাট একটা এসরাজের মতো দেখতে। মন্দ্র সপ্তকে গম্ভীর স্বরে বাজে এই যন্ত্র। বাবার কাছে শুনেছি, এস এল দাস নামে এক আশ্চর্য যন্ত্রবিদ 'মন্দ্রবাহার', 'কোয়েলা' ইত্যাদি যন্ত্র আকাশবাণীতেই উদ্ভাবন করেছিলেন। গেল কোথায় এই সব যন্ত্র? যাই হোক, একটি গান পঙ্কজবাবু, সুবাসবাবু আর আমি—এই তিনজনে গাইব বলে ঠিক ছিল। রেকর্ডিং-এর সময় পঙ্কজবাবু মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন আমাদের দুজনকে তাঁর দুপাশে রেখে। দুই হাত রাখলেন দুজনের কাঁধে। সুবাস মিত্রর কী অবস্থা হয়েছিল তিনিই জানেন। আমার মনের দশা যা হয়েছিল তা আর বলার নয়। পঙ্কজকুমার মল্লিকের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমি গাইছি—এটা বিশ্বাস করাই ছিল কঠিন আমার পক্ষে। ভয়, উত্তেজনা, সন্দেহ, লজ্জা, আনন্দ—সব তালগোল পাকিয়ে নাচানাচি করে বেড়াচ্ছিল আমার মাথার মধ্যে। আমি গান গাইব কী! আমার কানের পাশ দিয়ে যে কণ্ঠটি বেরোচ্ছে, তার ওজন, তার সৌষ্ঠব, তার অনন্যতার পাশে আমি কোথায়? আমার মতো একটা পোকাকেও কিন্তু সহশিল্পীর পূর্ণ মর্যাদা দিলেন পঙ্কজ মল্লিক। 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।'- কিন্তু অধমের যে কী দশা হয় সেটা অধমই জানে। এবং এ অধমের শেষ পরীক্ষা তখনও বাকি।

ঐ গীতি-আলেখ্যতে একক কণ্ঠে একটি মাত্র গান ছিল। পঙ্কজবাবু গানটি আমাকেই গাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ছোট্ট একটি গান। 'টেকিং' হবে একেবারে

শেষে। সারাদিন নাগাড়ে কাজ হয়েছে। সকলেই বেশ ক্লান্ত। এবারে আমার একা গাওয়ার পালা। পেছনে দিকপাল যন্ত্রশিল্পীরা প্রস্তুত। আমার বাঁদিকে চেয়ারে বসে হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন সহকারী সংগীত পরিচালক অলোকনাথ দে। ফাঁকে ফাঁকে উঠে বাঁশিটাও বাজিয়ে দিচ্ছেন তিনি। আমার সামনে, মাইক্রোফোনের ওপারে একটি চেয়ারে বসে আছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। তখন আর তিনি বারো বছর আগেকার গাড়িতে বসে আদর করে সুর লাগাতে শেখানো মানুষটি নন। তখন তিনি ফ্লোরের বাঘ। সংগীত পরিচালক। যাঁর সুরে, পরিচালনায় কে এল সায়গল গেয়ে গেছেন। গেয়ে গেছেন বাংলার স্মরণীয় শিল্পীরা। এবারে সেই বাঘের সামনে পড়েছে বেড়ালছানা।

তাঁর চোখের দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না। শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার দিকে। আমি কাঁপছি ঠকঠক করে। অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। আমি গান ধরলাম। হল না। আবার গাইলাম। হলনা। ফের গাইলাম। এবারেও ব্যর্থ। পঙ্কজবাবুর কিছুতেই মন ভরছে না। বারবার গেয়ে দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন কোন জায়গায় গলাটা কেমন করতে হবে। 'টেক' । এবারেও হল না। পঙ্কজবাবু উঠে দাঁড়ালেন। রীতিমতো উত্তেজিত। তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। পঙ্কজবাবু আমায় তিরস্কার করতে লাগলেন—'ও শালে, বাঙালিরা লড়ছে, মরছে, আর তুই এখানে একটা সামান্য বাংলা গান ঠিকমতো গাইতে পারছিস না!' আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। পঙ্কজবাবু সমানে বলে গেলেন, বকে গেলেন। শেষে আবেগে তাঁর গলাও ধরে এল। আমি ততক্ষণে কান্নাটা একটু সামলে নিয়েছি, ভেতরে ভেতরে জ্বলছি তখন নতুন উদ্দীপনায় ও সঙ্কল্পে। কোনও এক মুহূর্তে দেখলাম পঙ্কজবাবুর হাত উঠে গেল। সংকেত পেয়ে অলোকনাথ দে যন্ত্রশিল্পীদের সতর্ক করে দিলেন। স্টুডিয়োর ভেতর লাল আলোটা জ্বলে উঠল। অর্কেস্ট্রা উঠল বেজে। আমি গান ধরলাম, যদ্দুর স্মরণে আছে সুবাস মিত্র আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমায় সাহস দেবার জন্যেই হয়তো গুনগুন করে গাইছিলেন গানটি। অমন মরিয়া হয়ে আমি বোধহয় খুব কমই গেয়েছি। রেকর্ডিং শেষ হতেই প্রবীণ সংগীত পরিচালক উঠে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন । তারপর আদর।

সেই রাতে পঙ্কজকুমার মল্লিক আমাকে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। গাড়িতে তিনি সমানে বলেছিলেন, 'খামোকা ভয় পাচ্ছিলি কেন? শেষ পর্যন্ত পারলি তো বাপু।'

এর কুড়ি বছর পর, ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, দমদমে এইচ এম ভি-র স্টুডিয়ো-য় 'তোমাকে চাই' অ্যালবামটি রেকর্ড করতে গিয়ে আমার মনে পড়েছিল পঙ্কজবাবুর সেই কথাটি— 'শেষ পর্যন্ত পারলি তো!'

১৯৭১ সালে আমি একবার বাবার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে চলে গিয়েছিলাম উত্তর কলকাতায় এইচ এম ভি-র সাবেক দপ্তরে। দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন তখন সন্তোষ সেনগুপ্ত। আমি তাঁকে বলেছিলাম হিমাংশু দত্তর গান রেকর্ড করার সুযোগ খুঁজছি। তার আগে পাঁচ বছর ধরে আমি বেতারে গান গাইছি— মূলত রবীন্দ্রনাথের গান ও আধুনিক বাংলা গান। সন্তোষ সেনগুপ্তর হাতে তখন সময় ছিল। কিন্তু তিনি আমার গান শুনতেই চাইলেন না। আমি সবিনয়ে বারবার বললাম —একটা গান শুনে দেখুন। তিনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন। প্রকারান্তরে ভাগিয়েই দিলেন তিনি আমাকে। আমার তখন অল্প বয়স। অপমানে, দুঃখে, রাগে গরগর করতে করতে পুরো রাস্তাটাই প্রায় হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম। সন্তোষবাবুকে তারপর আর কখনও দেখিনি। দেখতাম তাঁকে ছেলেবেলায়।

এস আর দাস রোডের বাসায় সন্তোষ সেনগুপ্ত আসতেন। তিনি থাকতেন তখন বোধহয় ঠাকুরপুকুরের দিকে। মনে আছে, বেশ ছেলেবেলায় মা-র সঙ্গে একবার তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর বাড়ির কাছেই একটা খাল ছিল। সেখানে বাঁধা ছিল একটা ডিঙি নৌকো। আমি আর সন্তোষ সেনগুপ্তর বাড়ির একটি ছেলে (তাঁরই ছেলে কিনা মনে নেই) খেলতে খেলতে ওস্তাদি করে সেই নৌকোয় উঠে দড়িটা খুলে দিয়েছিলাম। নৌকোটা ভেসে যেতে লাগল। আমাদের কান্নামেশা চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসে নৌকোটাকে সামলাল। আমি কানমলা খেলাম। তার বহু বছর পর আনাড়ির মতো গানের ব্যবসার নৌকোয় উঠতে গিয়ে সন্তোষবাবুর কাছেই আবার একধরনের মধুর কানমলা। জীবন বড় বিচিত্র।

আমাদের বাড়িতে যাঁরা আসতেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত সমেত সকলের কাছেই অকৃপণ স্নেহ পেয়েছি। মনে আছে, অনেক বছর আগে, আমার বয়স তখন বছর ছয়েক, আমার এক জ্যাঠাবাবুর বাড়িতে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন সেখানে। যথারীতি কোনও একটা দুষ্টুমি করার জন্য মা-র কড়া বকুনি খেয়ে আমি কাঁদছিলাম বোকার মতো। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় ভোলাচ্ছিলেন। পরে তিনি গান গাইলেন— 'মোর মালঞ্চে বসন্ত নাই রে নাই।'

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বরাবর প্রিয়। তাঁর গাওয়া একটি গান 'নদী ছলোছল, হাওয়া ঝিরিঝির কথা বলে' আমি খুব গাইতাম ছোটবেলায়। ভারি খোলামেলা, অতি সুরেলা, তাজা একটা ভাব ছিল তাঁর গানে। কী যেন ছিল তাঁর কণ্ঠে, যার বর্ণনা দেওয়া দুষ্কর। এ রকম একটা কণ্ঠ বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশে সচরাচর পাওয়া যায় না। উৎপলা সেনের কণ্ঠটি যেমন। ঐ ধরনের কণ্ঠ আর এল না।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে (হয়তো বা তার কিছু আগে থেকেই) কলকাতার গানের জলসাগুলোয় হিন্দি গানের প্রকোপ বাড়তে থাকে। অল্প কিছু শিল্পী ছাড়া একনাগাড়ে পরপর বাংলা আধুনিক গান গেয়ে শ্রোতাদের মজিয়ে রাখার সাধ্য তখন অনেকেরই ছিল না। বিশেষত মাচা-বাঁধা জলসায় দর্শকদের মধ্যে কেউ-না-কেউ খানিকক্ষণ পরপর 'হিন্দি গান হিন্দি গান' বলে চেঁচাতেন। বাংলা আধুনিক গান গেয়ে সেই ডামাডোলের বাজারেও আসর জমানোয় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও জুড়ি ছিল না। বেপরোয়া দাপটে তিনি চষে বেড়িয়েছেন শহর, গঞ্জ—জলসা থেকে জলসায়। বাংলা আধুনিক গান গেয়েই নাচিয়ে ছেড়েছেন শ্রোতাদের।

ছেলেবেলায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই মতো আর এক মিষ্টি স্বভাবের মিশুকে কণ্ঠশিল্পী মাঝে মাঝে আসতেন আমার বাবার কাছে। দিলীপ সরকার। একাধিকবার তাঁর গান ঘরে বসে শুনেছি। মনে আছে, দিলীপ সরকার সবসময়ে বেশ ফিটফাট থাকতেন। চোখে থাকত সোনালি ফ্রেমের চশমা। খুব মিষ্টি ছিলেন মানুষটি। গায়ক হিসেবেও পাঁচের দশকে তাঁর খুব নাম ছিল। জলসায় তিনি গাইতেন 'কাঠ ফাটা রোদে/ পিচ ঢালা পথে/ শীতের রাতে/ রিকশা চালাই মোরা রিকশাওয়ালা।' —তারপরেই 'ঠুং ঠুং ঠুং' বলে ভারি মিষ্টি সুরের তিনটি ধাপ। এই গানটি অনেকেই খুব পছন্দ করতেন। খুব হাততালি পড়ত। হাততালি যাঁরা দিতেন তাঁরা কোনওদিনই রিকশা চালাননি এবং চালাবেন না।

কেন জানি না, এই গানটা আমার ছেলেবেলা থেকে অপছন্দ। শহরের পথে পথে রোদ-বৃষ্টি-হিমে যাঁরা হাতরিকশা চালান, তাঁদের তো দেখছি জন্মাবধি। তাঁদের অবস্থা দেখে যা মনে হত তার সঙ্গে এই গানটির সুর , ছন্দ ও আঙ্গিক যেন একেবারেই খাপ খেত না। গানটা শুনলে মনে হত—কাটফাটা রোদে (খালি পায়ে) পিচ ঢালা পথে, ঝড়বাদলেতে, শীতের রাতে রিকশা চালানোর মতো মিষ্টি-মিষ্টি সুখের কাজ আর দুটি নেই। এ হল তখনকার এমন একটি জনপ্রিয় গান যার স্থায়ী অংশের পর আর কিছুই আমার মনে নেই। সমসাময়িক অন্য অনেক গান কিন্তু আমার আজও মনে আছে—অন্তত গানের পুরো সুর। 'কাঠ ফাটা রোদে' আমায় মহা অস্বস্তিতে ফেলত। 'মোরা' তো মোটেও রিকশা চালাই না!

এই গানটি বাদে দিলীপ সরকারের অন্য কিছু গান কিন্তু আমার খুব ভালো লাগত। তিনি যে শুধু গান গাইতেন তা নয়, সুর করতেন এবং গান লিখতেনও। সুরকার হিসেবে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় পেতে হলে 'মোর মালঞ্চে বসন্ত নাই রে নাই', 'কোন দূর বনের পাখি', 'পদ্মকলি আকাশ খোঁজে', 'তন্দ্রা এল বলো জাগি

কেমন করে', কে যায় সাথিহারা মরু সাহারায়,' 'তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে আমার পরিচয়'—অন্তত এই গানগুলি শোনা দরকার। মনে রাখতে হবে যে অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরগুলির বাহারে আধুনিক গানের বাগান তখন জ্বলজ্বল করছে। সুধীরলাল চক্রবর্তী তখন সদ্যপ্রয়াত। তাঁর সুরে সুরে রচিত হয়ে গিয়েছে এক নিজস্ব চালচিত্র। প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে গানে আধুনিক বাংলা গান অর্জন করছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। সুধীন দাশগুপ্তর প্রতিভার স্বাক্ষর তখন স্পষ্ট। এমনই এক বর্ণাঢ্য আবহে দিলীপ সরকারকে দেখাতে হয়েছিল তাঁর নিজস্বতা—সুরকার ও গীতিকার হিসেবে।

মনে আছে আমাদের এস আর দাস রোডের বাসায় সুদর্শন শিল্পী দিলীপ সরকার একদিন গেয়ে শুনিয়েছিলেন 'তন্দ্রা এল, বলো জাগি কেমন করে।'

সংগীত, সুর এমন একটা জিনিস যার বৈশিষ্ট্য ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। রজার সেশন্‌স্‌-এর মতো বিজ্ঞ, বাকপটু, সংগীতকারও তাঁর *কোয়েশচেনস অ্যাবাউট মিউজিক* গ্রন্থের গোড়াতেই কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন যে সংগীতের মতো এক 'নন্‌ ভারবাল' ব্যাপারকে 'ভারবাল' মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। ততটাই দুরূহ মানুষের মনের সুরের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া। জীবনে যদি একটি জিনিসকেও সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকি তো সেটা সংগীত। আমার এই ভালোবাসার কথাগুলো মানুষকে জানিয়ে দিতে বড় ইচ্ছে করে। অথচ আজ পর্যন্ত কাউকেই ঠিক বোঝাতে পারলাম না। সুর-তাল-ছন্দ আমার ভেতরে কী ঘটিয়ে চলেছে জন্মাবধি, কিছুতেই তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না। কোনওদিন পারব কি? মনে তো হয় না। এ ব্যাপারে সলিল চৌধুরিই যেন আমার শেষ সম্বল: 'কী যে করি বলো এত আশা নিয়ে, বোবা হয়ে মরি এত ভাষা নিয়ে।'

কিছু বছর আগে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ডি ৎসাইট পত্রিকায় ক্লোদ লেভি-স্ত্রাউসের একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। দীর্ঘ সেই সাক্ষাৎকারের শেষ দিকে এই বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, অপূর্ণতা কোথায়? প্রবীণ বিজ্ঞানী লেভি-স্ত্রাউস উত্তর দিয়েছিলেন: 'জগতে এত প্রাণী। কত রকমের জীব, পাখি, পোকামাকড়। মশাই, কোনও একটি প্রাণীর সঙ্গেও যদি কথা বলতে পারতাম। মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনও জীবের ভাষা যদি শিখতে পারতাম!'

দারুণ ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে ঐ কথাগুলো। হ্যাঁ,ঐ ব্যর্থতাবোধে আমিও শরিক। আর ঠিক ততটাই ব্যর্থ মনে হয় আমার জীবন, আমার দেহে-মনে সংগীত যে যে কাণ্ড ঘটায় তার কিছু স্পষ্ট ভাষায় কোনও মানুষকে বলতে পারলাম না

বলে। জার্মান দার্শনিক ভিট্‌গেনস্টাইন তাঁর *ট্রাক্‌টাটুস, লোগিকো-ফিলোজোফিকুস* গ্রন্থে প্রথমেই বলে রাখছেন: 'যা বলা যায় তা স্পষ্ট, স্বচ্ছ ভাষায় বলা সম্ভব। যা বলা যায় না সে—বিষয়ে নীরবতাই কাম্য।' তাহলে কি আমি সংগীত বিষয়ে নীরবতাকে বরণ করে নেব? নাকি চ্যালেঞ্জ জানাব তাকে? বড় বেহাল অবস্থা আমার।

কী করে বোঝাব, বলব 'তন্দ্রা এল, বলো জাগি কেমন করে' গানটি সেই ছেলেবেলায় দিলীপ সরকারের কাছাকাছি বসে শুনতে শুনতে আমার মাথার ভেতর কী ঘটে গিয়েছিল? অখিলবন্ধু ঘোষের গাওয়া 'মায়ামৃগসম' গানটি কোন ফেলে আসা যুগে আমাকে কোন সর্বনাশা নেশায় মজিয়েছিল, তাই বা বলি কোন ভাষায়? এই অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমি শুধু মানুষকে আবেদন করতে পারি ঐ গানগুলোর রেকর্ড/ ক্যাসেট জোগাড় করে শুনে দেখতে। 'তন্দ্রা এল, বলো জাগি কেমন করে' গ্রামাফোন রেকর্ডে গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

সেই বিরাট শিল্পীর মুন্সিয়ানা, অপার কণ্ঠসম্পদ ও সংগীতনিষ্ঠার সামনে নতজানু হয়েও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর উচ্চারণের জড়তা ও দোষ আমায় বরাবর বড় বিপাকে ফেলেছে। বাবার ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। একাধিকবার তাঁর কাছাকাছি যেতে পেরেছি। একবার তো (১৯৮৭সালে) 'ভয়েস অফ জার্মানি'র তরফে জার্মানি থেকে কলকাতায় এসে ধনঞ্জয়বাবুর সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। বাবা আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম, সাক্ষাৎকারে নয়, এমনিই তাঁকে জিজ্ঞেস করব গান গাইতে গিয়ে তাঁর উচ্চারণটা অমন হত কেন। কেন তিনি এ ব্যাপারে আরও ভাবেননি। কিন্তু বাবার সঙ্গে ধনঞ্জয়বাবুর অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পুরোনো দিনের নানান মধুর স্মৃতিচারণে এমনই মশগুল হয়ে পড়লেন, এমনই এক পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল যে, ওই বিশেষ প্রসঙ্গটা আর তুললাম না আমি।

কী নৈপুণ্যে ও নিষ্ঠার সঙ্গেই না কত বছর কত বিচিত্র আঙ্গিকের বাংলা গান গেয়ে গেলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। অথচ তাঁর উচ্চারণটা থেকে গেল আদ্যিকালের। তাঁর গানের এই দ্বন্দ্ব আমার কাছে ছেলেবেলা থেকেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সলিল চৌধুরির কথায়-সুরে 'ঝির ঝির ঝির ঝিরি ঝিরি বরষা' গানটি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর কণ্ঠে শুনেছি তো সেই ছেলেবেলায়। কী আধুনিক, প্রাণবন্ত সুর। গাওয়ার ধরন ও স্বরপ্রক্ষেপণের দিক দিয়ে কত আধুনিক। কোথাও কোনও বাহুল্য নেই, টানটান। এই সুরগত, গায়কীগত আধুনিকতার পাশেই উচ্চারণের গৌরাণিকতা। তেমনি 'এই ঝিরঝির বাতাসে', 'ওগো সুচরিতা', 'এইটুকু এই জীবনটাতে হাঁটতে মানা', 'অন্তবিহীন এই অন্ধকারের শেষ'... ধনঞ্জয়বাবুর গাওয়া নানান স্মরণীয় আধুনিক গানে সেই একই দ্বন্দ্ব।

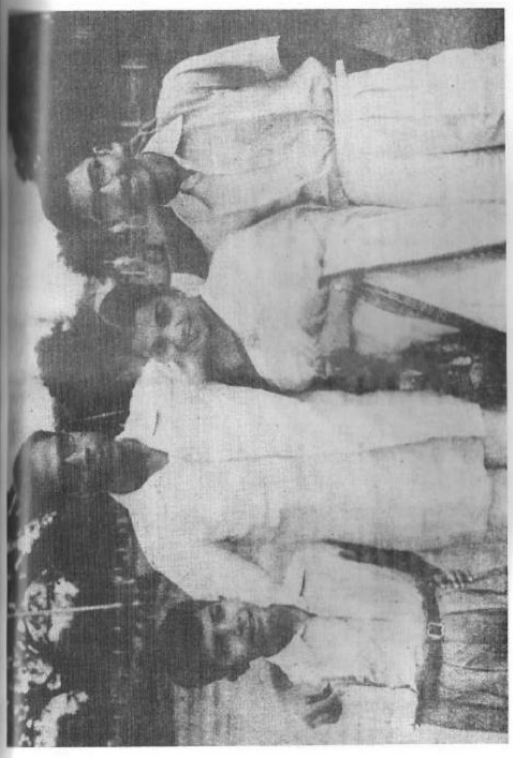

ছেলেবেলায় মা-বাবা-দাদার সঙ্গে সুমন

সুকুমার রায়

হিমাংশু দত্ত

হলি নিয়ার

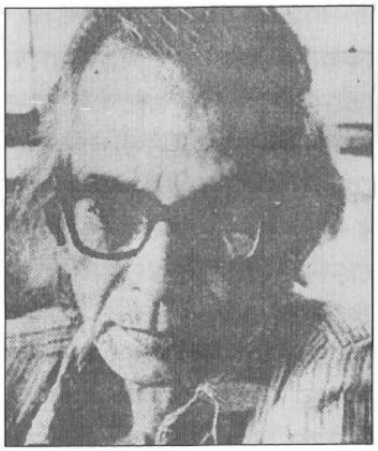

সমর সেন

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মলা মিশ্র

আমীর খান

রবিশঙ্কর

নচিকেতা ঘোষ

শচীন দেববর্মন

ভি বালসারা

ভেবে কূল পাই না—যে শিল্পী কণ্ঠ, সুর-লাগানো, স্বরপ্রক্ষেপ, কণ্ঠচালনা, ছন্দ ও লয়ের ক্ষেত্রে এত মেহনত করে ওই মাত্রার উৎকর্ষ অর্জন করে নিতে পারলেন, তিনি কেন বাংলা উচ্চারণের বেলা পড়ে থাকলেন অতীতের জড়তায়, মায় বিকৃতিতে। 'এই' কেন 'এ্যাই', 'চেয়ে' কেন 'চেইয়ে' 'মেয়ে' কেন 'মেইয়ে' হয়ে থাকবে?

সে যাই হোক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য যে সহশিল্পীদের কাছে, শ্রোতাদের কাছে কত শ্রদ্ধেয় ছিলেন তা ছেলেবেলায় একাধিকবার দেখেছি। মনে আছে—অনেক কাল আগে বাবা-মার সঙ্গে এক জলসায় গিয়েছি: সেখানে ধনঞ্জয়বাবু এলেন। সিল্কের পাঞ্জাবি। ফিনফিনে ধুতি। এক হাতে দামি সিগারেটের টিন (তখন দামি সিগারেট টিনে করেও পাওয়া যেত) । সে কী ভারিক্কি চাল। তাঁকে আসতে দেখে শিল্পীরা উঠে দাঁড়ালেন।

ঐ ধরনের সম্মান পেতে দেখেছি আধুনিক গানের শিল্পীদের মধ্যে আর একজনকে। শচীন দেববর্মন। তখন আমি খুবই ছোট। কলকাতায় এক জলসায় সামনের দিকে বসে বসে গান শুনছি বাবা-মার সঙ্গে। এমন সময় শচীন দেববর্মন এলেন। গাইতে নয়,শুনতে। ওরে বাবা, সামনের সারিতে যাঁরা বসেছিলেন সবাই উঠে দাঁড়ালেন। শচীন দেববর্মনকে বসানো হল। আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জল' আর 'টাক্‌ডুম টাক্‌ডুম বাজে, বাজে ভাঙা ঢোলের' দিকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে গীতিকার পবিত্র মিত্র শচীন কর্তার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসলেন। একটা ব্যাপার আমার ঐ বয়সেই খারাপ লেগেছিল। মঞ্চে তখন শিল্পী গান গাইছেন, আর সামনেই শচীন দেববর্মনকে নিয়ে একটা জটলা হচ্ছে। শচীনকর্তা, চাপাস্বরে হলেও, সমানে কথা বলছিলেন পবিত্র মিত্র এবং অন্যান্য গুণীদের সঙ্গে। তাঁদের সামনেই কিন্তু একজন শিল্পী মন দিয়ে গান গাইছিলেন এবং আর একজন শিল্পী মন দিয়ে তবলা বাজাচ্ছিলেন।

গানের সময়ে এই ব্যাপারটা আমি আদৌ বরদাস্ত করতে পারি না। আমার বাবা, যাঁর কাছে আমার ঋণের সীমা নেই, তিনিও (কেন কে জানে) আমাকে গান গাইতে বলে মাঝে মাঝে অতি বেরসিকের মতো জাঁতি দিয়ে খটাস করে সুপুরি কাটতেন। ভয়ানক বিরক্তিকর ব্যাপার।

মজার কথা হল, ঘরে বসে আমার গান শুনতে শুনতে বাবার ঐ সুপুরি কাটার বদ অভ্যেসটার স্মৃতি এতই বেয়াড়া যে অভিজিতের সুরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর ছড়া 'দূরের পাল্লা'(ছিপখান তিন দাঁড়) শুনলেও একটি জায়গায় আমি আজও শিউরে উঠি। শ্যামল মিত্র কী অনবদ্য ভঙ্গিতেই না গেয়েছেন : 'পান সুপারি পান সুপারি'... 'আমি কিন্তু চমকে চমকে উঠি। এই অংশে গানটির তাল

হয়ে যাচ্ছে আট মাত্রা থেকে ছ'মাত্রা। সম পড়ছে 'পানের' 'পা/'-এ। প্রতিবারই আমার মনে হয় বাবা তাঁর সেই ছোট্ট স্টেইনলেস স্টিলের জাঁতিটা নিয়ে বসে আছেন— সমের মাথায় খটাস করে সুপুরি কাটবেন বলে।

তবে হ্যাঁ, অন্য কেউ গান শোনালে বাবা একেবারে মগ্ন হয়েই শুনতেন। অন্যথা কখনও দেখিনি। কত শিল্পীই তো আসতেন এস আর দাস রোডের সেই দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে। কত শিল্পী কত গান শুনিয়ে গেছেন সেখানে। আমাদের তো আর টেপ রেকর্ডার ছিল না। এখন ভাবি, ঘরোয়া মেজাজে গাওয়া সেইসব অনবদ্য গান যদি টেপ রেকর্ড করে রেখে দেওয়া যেত তো সে হত এক অমূল্য সম্পদ।

টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটি আমি প্রথম দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনে। আমি তখন খুব ছোট। শান্তিনিকেতনে আকাশবাণীর একটা ছোট্ট স্টুডিয়ো ছিল বোধহয়। বাবাকে সেখানে যেতে হত অফিসের কাজে। একাধিকবার তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। শান্তিনিকেতনের কোনও কোনও উৎসব বোধহয় টেপে রেকর্ড করা হত। বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েই প্রথম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখি এবং একেবারে সামনে থেকে সেই প্রথম তাঁর গান শুনি। বাবা-মার সঙ্গে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তাঁর স্বামী বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জাপানি রূপকথার একটি বই দিয়েছিলেন: *সূর্য্যি মামার দেশে*। রূপকথাগুলি তাঁরই অনুবাদ। বইটা পড়ে আনন্দ পেয়েছিলাম, নয়তো অত ছোটবেলা পাওয়া ও পড়া বইটির নাম এবং লেখকের নাম আজও মনে থাকত কিনা কে জানে। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ খুব ভালো লাগলেও যে-সব গান সেখানে শুনেছিলাম সেগুলি আমার মনে খুব একটা দাগ কাটেনি। রবীন্দ্রনাথের গান বাবা-মার মুখে শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের গানই শিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যত গান ছেলেবেলায় শুনেছি তার সবগুলি আমার মনে ধরেনি। তাছাড়া কেবল রবীন্দ্রসংগীত-সর্বস্ব পরিবেশও আমাদের পরিবারে ছিল না। মা তো আপন মনে নজরুলের গান, হিমাংশু দত্তর গানও গেয়ে উঠতেন থেকে থেকে। কমল দাশগুপ্তর সুরও। এমনকি রবির সুরে মহম্মদ রফির গাওয়া 'চওধবি কা চাঁদ' গানটিও গুনগুন করতে শুনেছি মাকে। ভালো লাগা কোনও গানের টুকরো বা সুর— তা সে যে গানই হোক— মা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে গেয়ে উঠছেন, এ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বাবা কিন্তু এ ব্যাপারে একটু চাপা স্বভাবের ছিলেন বরাবর। তবে গানের ব্যাপারে দুজনেই বরাবর উদার। এটা শোনো ওটা শুনো না— এ সবের বালাই ছিল না। সবই শুনতেন, ফলে কোনও বিশেষ ব্যক্তির রচনা বা গান সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ভক্তি আমার ছিল না কখনও।

শান্তিনিকেতনে এসেছ, রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে, চুপটি করে শোনো—এ ধরনের উপদেশ বাবা-মা দিতেন না। একবার, মনে আছে কারা যেন সমবেত কণ্ঠে গাইছিলেন 'বকুল গন্ধে বন্যা এল।' বড় ভালো লেগেছিল। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানও ভালো লেগেছিল মনে আছে। এও মনে পড়ে যে, সেবার শান্তিনিকেতনেই প্রথম দেখেছিলাম মালবিকা কাননকে।

এ টি কানন এস আর দাস রোডের বাসায় আসতেন। দু' একবার তাঁকে গুনগুন করে সুর ভাঁজতেও শুনেছি। কী কণ্ঠই না ছিল তাঁর!

ভরাট, মিষ্টি, সুরভরপুর কণ্ঠের আর-এক অধিকারী ছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত মার্গসংগীত শিল্পী হলেও তাঁর গাওয়া কিছু বাংলা গান শুনে বড় ভালো লেগেছিল ছেলেবেলায়। আভোগী কানাড়া রাগে ঝাঁপতালে একটি বিখ্যাত বন্দিশ আছে। তারই ছাঁচে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বেঁধেছিলেন 'চরণের ধ্বনি শুনে বারে বারে ছুটে যাই।' গানটি রেকর্ড করেছিলেন বোধহয় একটি বাংলা ছায়াছবির জন্য প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। কী অসাধারণ গায়কী কণ্ঠপ্রয়োগ! কেন যে তিনি আরও অনেক বাংলা গান গাইলেন না কে জানে। আমরা বড় বঞ্চিত হলাম।

কণ্ঠের কথা উঠলেই তো এসে পড়েন সেকালের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সে বোধহয় ১৯৬০ সাল। হেমন্তবাবু বাবা-মার অনেককালের পরিচিত। একবার দাদা আর আমি আবদার ধরলাম— হেমন্তকে নিয়ে এসো। ওমা, একদিন আমাদের দুই ভাইকে চমকে দিয়ে সত্যি সত্যিই বাড়ির দরজায় দীর্ঘদেহী মানুষটি এসে ডাক দিলেন, 'বড়দা!' বাবা ছিলেন গানবাজনার জগতে সকলের বড়দা। আকাশবাণীতে তো বটেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান ছেলেবেলা থেকে ভালো লাগলেও, তাঁর গাওয়া অনেক গান মুখস্থ থাকলেও, সে সময়ে আমি ছিলাম সতীনাথপন্থী। তবু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সশরীরে এসে উপস্থিত— সে এক মহা উত্তেজনা আমার মনে!

মনে আছে, একের পর এক সিগারেট খাচ্ছিলেন হেমন্তবাবু। আমাদের হারমোনিয়মটা নিয়ে তিনি বসে গেলেন। আমি আর দাদা তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে। আমি তো সবার ছোট। হেমন্তবাবু আমায় সস্নেহে বললেন—'বলো কী গান গাইব।' আমি বললাম 'তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ।' হেমন্তবাবুর সঙ্গে গানের খাতা ছিল না। তিনি বলে রাখলেন—গানের কথা মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে। সেই সন্ধেবেলা তিনি অন্তত ঘণ্টাখানেক গান শুনিয়েছিলেন আমাদের। মাঝে মাঝেই দাদা আর আমি তাঁকে গানের কথা 'প্রম্পট' করে দিচ্ছিলাম। তিনি ভুলে গেলে কী হবে, আমাদের তো সব মুখস্থ। সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। হেমন্তবাবু একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন আর একের পর এক গান গেয়ে

যাচ্ছেন। আমাদের সবকটি অনুরোধ তিনি তো রাখলেনই, উপরন্তু নিজের থেকেও কিছু গান শোনালেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক আশ্চর্য শিল্পী, আশ্চর্য মানুষ। আমার এক মাসতুতো দাদার স্ত্রী ছিলেন জার্মানির মেয়ে। ১৯৬৯ সালে তাঁরা একবার কলকাতায় আসেন জার্মানি থেকে। বৌদির ভারি শখ হয়েছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান তিনি সামনে বসে একবার শুনবেন। বাবার সঙ্গে হেমন্তবাবুর কোথায় যেন দেখা হয়ে গিয়েছিল, বাবা তখন তাঁকে বলেছিলেন। একটা দিনও ঠিক করেছিলেন দু'জনে মিলে। যাঁদের জন্য এত কাণ্ড, আমার সেই জার্মান বৌদি ও দাদা এসে পৌঁছোলেন না। বিন্দুমাত্র কথার খেলাপ না করে এসে গেলেন কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি একটি ছবির কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। কাজে যাবার পথে এসে গেলেন আমাদের এস আর দাস রোডের বাসায়। বাবা-মা তো মহা অপ্রস্তুত। কী আর করা, বাবা বললেন, 'হেমন্ত, এসেই পড়েছ যখন, তখন একটা গান অন্তত শোনাও। একটা কীর্তনাঙ্গের গান গাও।'—হেমন্তবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার মন মানে না দিন রজনী।' তারপর তিনি আমাকে একটি গান গাইতে বললেন। আমি তাঁকে রবীন্দ্রনাথেরই একটি গান গেয়ে শোনালাম। হেমন্তবাবু বললেন 'বেশ গাইলে, তবে বড়দার মতো গলা তোমার হয়নি।' বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে তিনি কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, 'নিশ্বাসটা ঠিক করো, ও-দোষ আমারও আছে।

জীবনে অনেক শিল্পী অনেক উপদেশ দিয়েছেন আমায়। শিল্পী নন, সংগীতের কিছুই জানেন না এমন অনেক মানুষ আমাকে গানবাজনা বিষয়ে বিস্তর পরামর্শ দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছাড়া কোনও শিল্পী বা শিক্ষককে বলতে শুনিনি একান্তে, 'ও দোষ আমারও আছে।' আমি নিজেই-বা ক'বার কবুল করি নিজের ত্রুটি।

আমার বাবা-মা গড়িয়ার দিকে বাড়ি করে চলে যাবার পর সেই নতুন বাড়িতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলেন। সে অবশ্য বেশ ক'বছর পরে।

দিনটা ছিল রবিবার। আমি যথারীতি আমার মাস্টারমশাই কালীপদ দাসের কাছে তালিম নিচ্ছি খেয়ালে। আমি বসেছিলাম আমার ঘরের দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। তবলা শিল্পী সত্য রায় বিলম্বিত একতালে নিবিষ্ট মনে ঠেকা ধরেছিলেন। আমরা সকালের কোনও রাগ গাইছিলাম। চোখ বুজে, খুব মন দিয়ে গাইছিলাম আমি, তাই টের পাইনি। একবার চোখ খুলেই দেখি মাস্টারমশাই হাসি হাসি মুখে ইশারা করছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি হেমন্তবাবু দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের

দরজায়। পাশে বাবা। চোখাচোখি হতেই হেমন্তবাবু নিঃশব্দে ইশারা করলেন—'গেয়ে যাও।' —আমি তাই-ই করলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়াল শুনলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নিঃশব্দে। গান গাইতে গাইতে আড়চোখে কয়েকবার দেখে নিয়েছিলাম তাঁর মুখ। একজন আনাড়ি শিক্ষানবিশের গানও তিনি শুনছিলেন দু'চোখ বুজে, মন দিয়ে।

মন দিয়ে বাংলা গান শেখানোর চেষ্টা বাবা তো সেই ছেলেবেলা থেকেই করেছিলেন। কিন্তু আমার মন ছিল কতটুকু! আর সব ছেলের মতো আমার মনও বেশি ছিল খেলায়। শিশুমহলে প্রথম গান গেয়ে পাঁচ টাকা পেয়েছিলাম। গান গেয়ে সেই প্রথম উপার্জনের টাকা হাতে ছুটেছিলাম গোলকিপারের জার্সি কিনতে। আমি ছিলাম মোহনবাগান দলের 'সাপোর্টার।' আমার ছেলেবেলায় মোহনবাগানের এক গোলকিপারের নাম ছিল এস চ্যাটার্জি। আমাকে আর পায় কে? আমিও তো এস চ্যাটার্জি। গোল ঠেকানোর সে কী ব্যর্থ চেষ্টা। ফুটবল, ক্রিকেট দুটোই খেলতাম। কালক্রমে ক্রিকেটের দিকেই ঝুঁকলাম বেশি। বাবার বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলার অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য। যত অতিথি আসতেন, তাঁদের মধ্যে গুরুদাসকাকুকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম, কারণ তিনি এসেই আমার সঙ্গে ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিতেন।

নিয়মিত অতিথিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন তখনকার বিখ্যাত খেলা-সাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্য। আর এক অসাধারণ মানুষ। একদিকে কলকাতার ফুটবলের লেখক। অন্যদিকে অনর্গল আউড়ে যেতেন শেক্সপিয়র। ভারি রসিক, কিশোর-বৎসল মানুষটি ছিলেন। আমি তেড়েফুঁড়ে ক্রিকেট খেলছি জেনে তিনি একবার আমাকে নিয়ে গেলেন একটি অনুষ্ঠানে। 'রূপা পাবলিশার্স' তখন ক্রিকেট বিষয়ে কয়েকটি বই প্রকাশ করছে; সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান। সেখানে হাজির লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলি, ডাটু ফাদকার, পঙ্কজ রায়। আমি, কিশোর ক্রিকেট পাগল, ঠাঁই পেয়ে গেলাম তাঁদের মাঝখানে। রাখাল ভট্টাচার্যর স্নেহের সুবাদে। একটা গোটা সন্ধে কাটালাম ক্রিকেটের কয়েকজন দিক্‌পালের সঙ্গে, গল্প করলাম। সে-কী বিপুল উত্তেজনা আমার। মনে আছে, লালা অমরনাথ আমার হাতটা রেখে দিয়েছিলেন মুস্তাক আলির হাতে। বলেছিলেন 'ছুঁয়ে দ্যাখো হে, ধরে দ্যাখো।' কোনওদিন ভুলব না অমরনাথের কথাগুলো: 'মনে রেখো, তুমি মুস্তাকের হাত ধরেছিলে।'

কৈশোরের দিনগুলো কেঁপে উঠছিল রে লিন্ডওয়াল, রয় গিলক্রিস্ট, রমাকান্ত দেশাই, সোনি রামাধিনের বলে। কেঁপে উঠছিল ওনিল আর হার্ভে, সোবার্স আর ডেক্‌সটার, মঞ্জরেকার আর পতৌদির নবাবের মারে। কোন খেলায় কে কত রান

করল, কে কটা উইকেট পেল, আব্বাস আলি বেগ প্রথম সেঞ্চুরি কোথায় করেছিলেন, জিম লেকার কে, কাউড্রে কবে কলকাতায় খেলতে আসছেন, পলি উমরিগড় হাসলে কেমন দেখায়, হানিফ মহম্মদের সর্বোচ্চ রান কত, মহম্মদ নিসারের ছবি কোন বন্ধু জোগাড় করেছে, শ্যামসুন্দর মিত্র কেন টেস্টে সুযোগ পাচ্ছেন না—এইসব বিষয়ে গবেষণা করে আর টেস্ট খেলা দেখে তখন সময় কাটছিল মহা আনন্দে। এমন সময় এক সন্ধেবেলা আমাদের এস আর দাস রোডের বাসায় এলেন কালীপদ দাস। বাবা গম্ভীর মুখে বললেন— 'প্রণাম করো। এঁর কাছে তুমি খেয়াল শিখবে।' তখন আমার বয়স বারো বছর।

একমুখ স্নেহ আর ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়েছিলেন কালীপদবাবু আমার দিকে। তাঁর সেই প্রথম চাহনি আমি জীবনে ভুলব না। বাবার অনুরোধে আমার নতুন গুরু চিন্ময় লাহিড়ীর সুরে একটি ভজন গেয়ে শোনালেন। কোনও শিল্পীর সামনে বসে এত মর্মস্পর্শী গান আমি আগে কখনও শুনিনি। জীবনে সেই প্রথম আমি গান শুনে কেঁদে ফেললাম। কী সুর, কী গান যে বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ দিয়ে!

মাস্টারমশাই শুরু করলেন আমার গলা তৈরির পদ্ধতি দিয়ে। বাবা চেয়েছিলেন আমাকে চিন্ময়বাবুর কাছে দিতে। কিন্তু চিন্ময় লাহিড়ি বাবাকে বলেন, তাঁর ছাত্র কালীপদ দাসের কাছে শিখলে আমার বনিয়াদ আরও মজবুত হবে। চিন্ময়বাবুই কালীপদ দাসকে পাঠিয়ে দেন। এই মূল্যবান সিদ্ধান্তের জন্য চিন্ময় লাহিড়ির কাছে আমি আজীবন ঋণী থাকলাম। রাগসংগীতের বিন্দুবিসর্গ, খেয়াল আঙ্গিকের কণামাত্রও যদি শিখতে পেরে থাকি তো সেটা আমার মাস্টারমশাই কালীপদ দাসের কৃপায়।

বাবা-মা আমাকে কখনও গলা সাধার পদ্ধতি দেখিয়ে দেননি ছেলেবেলায়। তাঁরা শেখাতেন গান। মাস্টারমশাই-এর কাছেই শুরু হল প্রথম গলা সাধা। সহজ থেকে শুরু করে নানান জটিল তান ও সরগম। প্রথমে তানপুরা নয়, হারমোনিয়মে।

আমার ধারণা, অল্পবয়সি শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীদের পক্ষে তানপুরার চেয়ে হারমোনিয়মই প্রথমে উপযুক্ত। অবশ্য হারমোনিয়মটা সুরে থাকা দরকার। প্রথম পর্যায়ে হারমোনিয়মই আমার মতে উপযুক্ত, কারণ তানপুরা সুরে বাঁধা কঠিন ব্যাপার। শিক্ষকের কাছে বসে ছাত্রছাত্রী যখন শিখছে তখন না হয় শিক্ষক নিজে তানপুরা বেঁধে দিলেন। কিন্তু শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রী যখন গলা সাধতে বসবে, তখন কী হবে? একজন কিশোর বা কিশোরী গানের তালিম নিতে শুরু করেই নিখুঁতভাবে তানপুরা বেঁধে নিল—এমন ঘটনা বিরল।

এ-ছাড়াও স্বরগুলো নির্ভুলভাবে গলায় বসানোর সময় শিক্ষার প্রাথমিক

স্তরে ভালোমতো সুরে বাঁধা একটা হারমোনিয়ম (বা আজকের দিনে ইলেকট্রনিক কি বোর্ড অবশ্যই খেলনা নয়, পুরোদস্তুর কি বোর্ড) খুব কাজে লাগে। এক্ষেত্রেও শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বয়ং হাজির থাকলে তিনিই না হয় নিজে গেয়ে গেয়ে প্রতিটি স্বর দেখিয়ে দিতে পারেন। তিনি হাজির না থাকলেই মুশকিল। তখন ছাত্রছাত্রী মোক্ষম সুরে বাঁধা একটা তানপুরা ছেড়েও হয়তো থৈ পাবে না শুদ্ধ, কোমল, তীব্র স্বরগুলোকে শনাক্ত করার বেলা। গলায় স্বরগুলো লাগাতে গিয়েও ভুল হয়ে যেতে পারে। এমনকি বেসুরটাই বসে যেতে পারে কানে এবং গলায়। তার চেয়ে বরং ভালোভাবে 'টিউন' করা একটা হারমোনিয়ম (বেশি জোরে নয়) আস্তে বাজিয়ে বাজিয়ে সপ্তকের স্বরগুলো চিনে নেওয়া ভালো। এক একটা রিড টিপে টিপে সেই সুরে গলা মেলালেও উপকার হয়। স্বরগুলো গলায় মোটামুটি সড়গড় হয়ে গেলে তারপর অবশ্য তানপুরা ব্যবহার করা দরকার।

আমার মাস্টারমশাই প্রথম দিকে হারমোনিয়ম ব্যবহার করে তারপর তানপুরা ধরান আমাকে। এর ফলে গলার দিক দিয়ে, স্বরগুলোকে চেনার দিক দিয়ে তো সুবিধে হয়েছেই, তাছাড়াও হারমোনিয়মে আমার হাতও পেকেছে। স্বরজ্ঞানের বনিয়াদ পাকা হবার পর তানপুরা হাতে পেয়ে যন্ত্রটি নিজে নিজে সুরে বাঁধতেও সুবিধে হয়েছিল আমার।

গলা সাধা, গলায় আড়ষ্টতা ভাঙার অনুশীলন কিছুকাল চলার পর মাস্টারমশাই আমায় ইমন রাগটি শেখালেন। সেই প্রথম একটি রাগের কাঠামো ও রূপের সঙ্গে পরিচয় হল।

হিন্দুস্থানি রাগসংগীত আমার কানে পৌঁছে গিয়েছিল তার অনেক আগেই। রেডিয়োয় কোনও ভালো রাগসংগীতের অনুষ্ঠান হলে বাবা শুনতেন, ফলে আমিও শুনে ফেলতাম। তাছাড়া বাবার কাছে বিস্তর পুরোনো রেকর্ড ছিল। তার মধ্যেও ছিল খেয়াল, ঠুংরি। মাঝে মাঝে গ্রামাফোন ধার করে এনে বাবা আবদুল করিম খান সাহেবের রেকর্ড চালাতেন। তাঁর গাওয়া ঝিঁঝিট-খামাজ রাগটি আমার বড় প্রিয় ছিল। সেই সঙ্গে তাঁর গাওয়া বসন্ত রাগে ছোট খেয়াল। আবদুল করিম খানের গান, তাঁর আঙ্গিক আমাকে ছেলেবেলায় যতটা স্পর্শ করেছিল আর কারুর গাওয়া খেয়াল ঠুংরি ততটা করেনি। এমনকি বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের ঠুংরিও ছেলেবেলায় তেমন ভালো লাগত না। ভালো লেগেছিল বরং রবিশঙ্করের 'রসিয়া' রাগের রেকর্ডটি। আড়াই-তিন মিনিটের ঐ বাজনাটা শুনলেই আমার ভাবনা যেন একজোড়া ডানা পেয়ে যেত কোত্থেকে। 'রসিয়া' শুনলেই মনে হত যেখানে সেখানে উড়ে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' গানটিকে যদি কেউ আমায় এক কথায় প্রকাশ করতে বলেন তো আমি বলব: রসিয়া। রবিশঙ্করের রসিয়া।

আবদুল করিম খানের ঝিঁঝিট-খামাজ কিন্তু আমায় বসিয়ে দিত, ডুবিয়ে দিত সেই ছেলেবেলাতেই। সুরের ছোট ছোট টুকরো প্রায় শিশুর সারল্যে জুড়ে জুড়ে কী কাণ্ডই না করে গেছেন তিনি। কী সারল্য, কী নিষ্পাপ সারল্য তাঁর গানে। ঐ রেকর্ডে একটি জায়গায় একটি সরগম ছিল। তাঁর সপ্তকের সুর বা সা থেকে আলগোছে অবরোহণের স্বরগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মন্দ্র সপ্তকে এসেই চলে গেলেন মধ্য সপ্তকের মুখে। স্বরগুলো উচ্চারণ করছেন বলা ভুল। আদর করছেন তিনি স্বরগুলোকে। তাঁর সরগম সবসময় সমান স্পষ্টতায় উচ্চারিত নয়। অনুভূতি ও তার অভিব্যক্তির তীব্রতার হেরফেরে সরগমের উচ্চারণও কখনও স্পষ্ট, কখনও একটু যেন অস্পষ্ট। তুলির টানের মতো। কখনও খুব গাঢ়, কখনও অতটা গাঢ় নয়, কখনও বা একটু ফিকে, কখনও হালকা। বাবা এই রেকর্ডটা চালালেই আমি উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকতাম—কতক্ষণে সেই সময়টা হবে! এটা কিন্তু বেশ ছেলেবেলার কথা। ঝিঁঝিট ও খামাজ রাগের প্রতি আমার আজও যে দুর্বলতা, খামাজ ঠাটের যে গোপন টান আমি আজও সুর দিতে গিয়ে অনুভব করি, তার মূলে কি ছেলেবেলায় ভালোবেসে ফেলা আবদুল করিম খান সাহেবের সেই রেকর্ডটির ভূমিকা রয়েছে?

অবশ্য ছেলেবেলায় শোনা কিছু কীর্তনে, ভাটিয়ালি ও বাউলে এবং রবীন্দ্রনাথের গানেও খামাজ রাগের আদল মাখানো ছিল। ষড়জ, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম পঞ্চম, শুদ্ধ ধৈবত ও কোমল নিষাদের অনুষঙ্গ আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে সেই ছেলেবেলা থেকে।

মনে আছে আমি তখন খুব ছোট। এস আর দাস রোডে আমরা যাঁর বাড়িতে ভাড়া থাকতাম তাঁর বৃদ্ধা মা মারা গেলেন। সেই বৃদ্ধার স্মরণে কীর্তনের আসর বসেছিল। বাবার অনুরোধে রাধারানি দেবী এসেছিলেন গাইতে। খুব কাছে বসে অবাক হয়ে শুনেছিলাম রাধারানি দেবীর কীর্তন। আমি হলফ করে বলতে পারি যে তাতে খামাজ রাগের রং-রস গন্ধ ছিল।

সত্যি বলতে, কীর্তন শুনতে আমার বেশি ভালো লাগত ছেলেবেলায় রাগসংগীতের চেয়ে। কিন্তু আবদুল করিম খানের গাওয়া কয়েকটি রাগের রেকর্ড ছিল ব্যতিক্রম। যে উৎসাহ নিয়ে আমি দম-ঘোরানো গ্রামাফোনে সতীনাথ, হেমন্ত, শ্যামলের আধুনিক গান শুনতাম, সেই একই উৎসাহ নিয়ে শুনতাম করিম খানের ওই রেকর্ডটি।

এস আর দাস রোডের বাসায় ছেলেবেলা থেকেই অনেক শিল্পীর গান শুনলেও পুরোদস্তুর রাগসংগীত কখনও শুনিনি। পণ্ডিত যশরাজ, — তখন তিনি তরুণ— প্রায়ই আসতেন বাবার কাছে। প্রতি সপ্তাহেই একবার না-একবার তাঁকে

দেখতাম। সোম তেওয়ারিও আসতেন। কিন্তু আমাদের বাসায় গান তাঁরা গাইতেন না। বাবা-মার সঙ্গে গল্প করতেন।

এ কানন আসতেন। গুনগুন করে সুর ভাঁজার বেশি কিছু তাঁর কাছে শুনিনি। তেমনি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকেও গান গাইতে শুনিনি আমাদের বাসায়।

একেবারে সামনে বসে খেয়াল, ঠুংরি শোনার সুযোগ প্রথম হয়েছিল মাধবী ব্রহ্মার বাড়িতে, ভবানীপুরে। তখন আমি বেশ ছোট। বাবা-মার সঙ্গে সেখানে গেলাম এক সন্ধেবেলা। বড়ে গোলাম আলি খান সাহেব গান গাইবেন। তখনও তাঁর গালের কাছে একটা প্রমাণ সাইজের আব ছিল। আর ছিল ইয়া বড় গোঁফ। বিশাল বপু। চেহারাটি সব মিলিয়ে মোটেও আকর্ষণীয় মনে হল না। আমি তাঁর বেশ কাছেই গিয়ে বসলাম। হাসলেন তিনি আমার দিকে চেয়ে।

বড়ে গোলাম আলি খানের গান, মানে ঠুংরি আমি তার আগে রেকর্ডে শুনেছি, কিন্তু বিশেষ ভালো লাগেনি। এবারে একদম সামনাসামনি। কী বলব, সুর যেই লাগালেন আমি তো অমনি মন্ত্রমুগ্ধ। ওরকম একটা চেহারা থেকে যে অত সুন্দর সুর বেরোতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। কী রাগ গেয়েছিলেন তা আর মনে নেই। রাগ চেনার বয়স তখনও হয়নি। কিন্তু দারুণ ভালো যে লেগেছিল, কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার মতো এক অর্বাচীন অবোধ বালককেও যে তিনি অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন—তা আমি এ-জীবনে ভুলব না। কী সুর, কী আনন্দ।

ভাবলে অবাক লাগে যে সেদিনের আসরে কোন শিল্পীরা সঙ্গত করেছিলেন তা আমি শত চেষ্টাতেও মনে করতে পারি না। সেই সন্ধের স্মৃতির সমস্তটা জুড়েই শুধু বড়ে গোলাম আলি খাঁ। মার্গ সংগীতের সারারাতব্যাপী জলসায় ছেলেবেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। বাবা-মা মাঝেমধ্যে যেতেন। দাদা আর আমি বাড়িতে থাকতাম।

১৯৬২ সালে কালীপদ দাসের কাছে খেয়ালে হাতেখড়ি হবার পর থেকে রেডিয়োয় রাগসংগীত শোনার তাগিদ অনুভব করলেও সেটা বড় মাপের ছিল না। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে তখনও বোধহয় 'লাইভ ব্রডকাস্ট' হত। তার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। তেমনি রেডিয়ো সংগীত সম্মেলনও ছিল আকর্ষণীয়। হীরাবাঈ বরোদেকর বা মল্লিকার্জুন মনসুর ভারতের অন্য কোনও শহরে বসে গাইছেন, আমরা সরাসরি শুনছি কলকাতায় বসে। বিসমিল্লা খানের সানাই শুনছি। ঘর অন্ধকার। রেডিয়োর প্যানেলের হালকা আলোয় ছোট্ট, আসবাব বোঝাই, স্যাঁতসেঁতে ঘরটাও যেন মনোরম হয়ে উঠেছে। অনেক পরে বোধহয় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখা একটি কবিতা পড়েছিলাম; "সমস্ত আকাশ যেন মুখরিত সাজ্জাদ হুসেন/ সানাই বাজিয়ে সব বলে দিচ্ছেন বিধাতাকে।"

উদ্ধৃতিটা হয়তো হুবহু হল না, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সাজ্জাদ হুসেনকে ছোট করতে চাই না। কিন্তু ছেলেবেলায় বিসমিল্লার বাজনা শুনে মাথার মধ্যে কী যে হত!

ছ'এর দশকেই, বোধহয় গোড়ার দিকে, বাবা 'শেরপা' নামে একটা ইলেকট্রিক রেকর্ড প্লেয়ার কিনে আনলেন। রেডিয়োর সঙ্গে জুড়ে দিলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যেত রেডিয়োর স্পিকার মারফত। ঘরে বসে নিয়মিত রেকর্ড শোনার সুযোগ জুটে গেল। বাবা মাঝেমধ্যেই রেকর্ড কিনে আনতেন। পুরোনো রেকর্ড তো ছিলই কাঁড়িকাঁড়ি। সেগুলোর মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে ফেললাম দিলীপকুমার রায়ের গাওয়া গান। এক একটি গান এক একটি অভিজ্ঞতা।

দিলীপকুমার রায় এক বিস্ময়। মানুষের গলা অত সুন্দর হয় কী করে? শুধু রেওয়াজ করলেই কি এমন কণ্ঠ সম্ভব? তাই যদি হয় তো সেই কণ্ঠচর্চার পদ্ধতি কী? কোন গুরু সেই পথ দেখিয়ে দেবেন?

একবার আশা ভোঁসলের গান শুনতে শুনতে বাবা মন্তব্য করেছিলেন — "শুধু রেওয়াজ করলে এ-জিনিস হয় না।"—তবে কী করলে, কী থাকলে হয়?

দিলীপকুমার রায়ের গানে যে ভাব, যে অভিব্যক্তি, যে নাটক, কৈশোরে তা আমায় নাড়া দিয়েছিল। ওই ধরনের অভিব্যক্তি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন আর অখিলবন্ধু ঘোষের গাওয়ায় পেয়েছি—যদিও যাঁর যাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

অপার কণ্ঠসম্পদ, ভাব প্রকাশের বিশাল ক্ষমতা সত্ত্বেও দিলীপ কুমার রায়ের উচ্চারণ আমায় কষ্ট দিত। আর —যেটা ভালো লাগেনি তা হল তাঁর অবিরাম গেয়ে যাওয়া, আমার মনে হয়, সংগীতে নীরবতার, যতির ভূমিকা খুব বড়। এমন অনেক গান ও বাজনা আছে যা থেমে গেলেই ভালো লাগে—আমি সে অর্থে বলছি না।

আমার বক্তব্য হল—একটি গান গাইতে গিয়ে শিল্পী যদি বিরামহীন গেয়ে যান, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনিহীনতার একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক যদি গড়ে না তোলেন তো মুশকিল। দিলীপকুমার রায়ের কিছু কিছু গানে তাঁর কণ্ঠ যেন সারাক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। সেই নিরবচ্ছিন্ন, নিরঙ্কুশ চলনে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই, খিঁচ নেই, স্খলন নেই, জড়তা নেই— কিন্তু হাঁফ ছাড়ার অবকাশও নেই। কণ্ঠচালনার, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের নিশ্ছিদ্র বুনোট—তাতে কোথাও একটু ফাঁক নেই। বলি হাওয়া ঢুকবে কী করে। নিঃশ্বাস নেব কী করে। সেই বিরাট শিল্পীর সামনে নতজানু হয়ে, তাঁর দু'পায়ে মাথা রেখেও জন ডান-এর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

"For godsake hold your tongue
And let me love."

তবে এমনও হতে পারে যে গান, সুর ও ছন্দের মাধ্যমে দিলীপ কুমার রায়ের এত অজস্র কথা বলার ছিল যে তিনি হয়তো উজাড় করে দিতে চাইতেন নিজেকে। হয়তো তনি প্রতিটি মুহূর্তের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাইতেন।

কণ্ঠশিল্পী হিসেবে দিলীপকুমার রায়ের ক্ষমতা আমাকে ছেলেবেলাতেই তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তিনটি সপ্তক, হয়তো বা তার বেশি এলাকাজুড়েই তাঁর সাবলীলতার লীলাভূমি। গুনগুন করেও তিনি যে কোথা থেকে কোথায় যেতে পারতেন, ফিরতে পারতেন! আশ্চর্য ওজনে এতটুকু হেরফের হত না।

কণ্ঠ ও গায়কীর দক্ষতার নিরিখে আরও দুজনের গান আমাকে খুব অল্প বয়সেই অবাক করে দিয়েছিল। পঙ্কজকুমার মল্লিক ও পল রোবসন। মানুষ তার কণ্ঠ ও মস্তিষ্ককে সাধারণ গান গাইতে গিয়ে কতদূর ব্যবহার করতে পারে কোন গভীরতায় এবং কোন উচ্চতায় যেতে পারে তার আভাস আমি দিলীপকুমার রায়, পঙ্কজ মল্লিক ও পল রোবসনের গান শুনে টের পেয়ে গিয়েছিলাম সেই ছেলেবেলাতেই।

মহালয়ার ভোরে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে যে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হত, তার রস পাবার পর থেকে মনে মনে সারাটি বছর যেন অপেক্ষা করে থাকতাম ঐ গানগুলি শোনার জন্য। টেপ রেকর্ডার তো আর ছিল না আমাদের। বেতারের ঐ অনুষ্ঠানটির কোনও রেকর্ডও ছিল না বাজারে। কাজেই বেতার সম্প্রচারই ছিল একমাত্র ভরসা।

আমার ধারণা মহালয়ার ঐ বেতার অনুষ্ঠানের গানগুলি সাংগীতিক কারণেই শুধু বাঙালির নয়, গোটা মানবজাতির একটি বড় সম্পদ। এর সঙ্গে ধর্ম বা ভক্তির কোনও সম্পর্ক নেই। আধুনিক বাঙালির সেরা সংগীত-সম্পদের অংশীদার ওই গানগুলি। কম্পোজিশন ও পরিবেশনার হিসেবে পঙ্কজ কুমার মল্লিকের ঐ সুরগুলি, গায়ক-গায়িকাদের গাওয়ার আঙ্গিক-যন্ত্রানুষঙ্গ এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর সুরেলা পাঠের সঙ্গে সংগীত অংশগুলির মেলবন্ধন —সবই অনুপুঙ্খ ও পৃথক আলোচনার দাবিদার। বর্তমান লেখায় তার সুযোগ নেই। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে আমার জীবনে যত অভিজ্ঞতা আমাকে পুষ্ট করেছে ছেলেবেলা থেকে শোনা আকাশবাণীর মহালয়ার অনুষ্ঠানটি সেগুলির অন্যতম। সুর সংযোজনা, পরিবেশনায় যে নিরীক্ষমনস্কতা, বৈচিত্র্য ওই অনুষ্ঠানের গানগুলি আমায় সেই ছোট বেলাতেই উপহার দিয়েছিল, আজও তারা আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

এই অনুষ্ঠানেরই শেষের দিকে ছিল পঙ্কজ মল্লিক, উৎপলা সেন ও

অন্যশিল্পীদের গাওয়া 'রূপং দেহি'। পঙ্কজ মল্লিকই ছিলেন মূল গায়ক। সাধারণভাবে গান, সুনির্দিষ্টভাবে আধুনিক গানের পরিবেশনা, আঙ্গিক যে কোন উৎকর্ষে পৌঁছোতে পারে তা জানতে হলে, আমার মতে, এই গানটিকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বারবার শোনা দরকার।

তেমনি, 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে', 'ওরে চঞ্চল'—পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া এই দুটি আধুনিক গানও দুই পৃথক অভিজ্ঞতা।

কত সময়ে 'আধুনিকতা'র বড়াই করে ফেলি আমরা—সমকালীনরা। কিন্তু বিগত যুগের কিছু কিছু বাংলা আধুনিক গান সংগীত রচনা হিসেবে যে চরম আধুনিকতার নজির বহন করছে , তা আমাদের লজ্জা দিতে পারে।

ইতালীয় সংগীতকার জুসেপ্পে ভের্দি একবার বলেছিলেন "Torniamo al'antico, sera un progresso" —অতীতের দিকে ফিরি, সেটাই হবে প্রগতি।

সাধারণভাবে কথাটা আমি মানি না। কারণ প্রগতির নজির অতীতে থাকলেও প্রগতিবিরোধী বহু উপসর্গও তো রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা গান, মায় আধুনিক সংগীতের ক্ষেত্রে ভের্দির কথাটার গুরুত্ব আমার কাছে অন্তত আছে। বিগত যুগে এমন অনেক বাংলা গান রচিত হয়েছে যেগুলি সমকালের বহু গানের তুলনায় ঢের বেশি প্রগতিসূচক। পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া, অজয় ভট্টাচার্যর লেখা 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে' তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটির রেকর্ডে যে অর্কেস্ট্রা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা থেকে আজ ও আগামীর সংগীতকাররা পাঠ নিতে পারেন। যতদূর মনে পড়ছে—ঐ গানটির একটি হিন্দি সংস্করণও রেকর্ড করেছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক।

মিড়ের প্রয়োগে এবং সুরের পঙ্‌ক্তিতে কোনও কোনও জায়গায় একটু টেনে থাকার ব্যাপারে পঙ্কজ মল্লিকের একটা নিজস্বতা ছিল যেটা আমার বরাবার বাহুল্য মনে হয়েছে। অনেক কাল আগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গায়কীতেও এর প্রভাব পড়েছিল। সেটি তিনি পরে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেন। ঐ বিশেষ 'mannerism' বাদে পঙ্কজবাবুর গায়কী, তাঁর কণ্ঠ প্রয়োগের স্বকীয়তা আমার কাছে ছিল এক বিস্ময়।

একই রকম বিস্ময়কর মনে হয়েছিল পল রোবসনের গান। তাঁর গানের রেকর্ড প্রথম শুনি বেশ ছেলেবেলায়। বাবা দারুণ ভালোবাসতেন রোবসনের গান। রেকর্ডগুলো তিনিই জোগাড় করে এনেছিলেন।

পাহাড় যদি মানুষের মতো গান গাইতে পারত তাহলে তার কণ্ঠ হত বোধহয় পল রোবসনের মতো। কোনও মানুষের কণ্ঠ যে এমন হতে পারে, এত গভীর,

অতলস্পর্শী কণ্ঠে যে কেউ গান গাইতে পারেন, রোবসনের গান না শুনলে আমি তা জানতে পারতাম না। 'ওল্ডম্যান রিভার' আর 'ও মাই ওল্ড কেন্‌টাকি হোম'—তাঁর গাওয়া এই দুটি গানই প্রথম শুনেছিলাম আমি।

কালক্রমে পল রোবসনের আরও বহু গানের রেকর্ড শোনার সুযোগ হয়েছে। আমার মনে হয়, রোবসন সম্পর্কে অনেকের ধারণাই একটু একপেশে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সংগীতকে অনেকেই শুধু রাজনৈতিক মতবাদের আলোয় দেখে থাকেন। আমার মনে হয় না যে কোনও শিল্পীকে শুধুমাত্র তাঁর এবং অন্যদের মতবাদের নিরিখে বিচার করলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব। সেই মানুষটি যে শিল্প মাধ্যমে কাজ করেছেন সেই মাধ্যমটির ওপর তাঁর দখল কতটা, এটাই তো প্রাথমিকভাবে মাপকাঠি হওয়া দরকার।

পল রোবসন এমন অনেক গান গেয়ে গেছেন যেগুলির সঙ্গে কমিউনিস্ট মতবাদের কোনও আলাদা সম্পর্ক নেই। যেমন, তিনি উপাসনাগীতিও গেয়েছেন। প্রেমের গানও গেয়েছেন তিনি। তেমনি গেয়েছেন নানান ধ্রুপদী অপেরার গান।

কোনও আগ্রহী শ্রোতা যদি পল রোবসনের গায়কীর বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা পেতে চান তো তাঁকে আমি অনুরোধ করব 'ওল্ড ম্যান রিভার-এর' পাশাপাশি 'জাস্ট আ উইয়ারিং ফর ইউ' আর 'ও মাই বেবি, মাই কার্লি হেডেড বেবি' গান দুটি অন্তত শুনে দেখতে। দ্বিতীয় গানটি এক নিটোল প্রেমের, বিরহের গান। তৃতীয়টি ঘুমপাড়ানি।

ঐ রকম এক বিশাল, গভীর কণ্ঠ তিনি বিভিন্ন গানে যে বিপুল দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে গেছেন, যে বিচিত্র পদ্ধতিতে তিনি তাঁর কণ্ঠ ও সাংগীতিক মেধাকে প্রয়োগ করেছেন তা গায়কীর দিক দিয়ে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

বড় শিল্পীরা কীভাবে গাইছেন, গলাটাকে কাজে লাগাচ্ছেন, সেদিকে আমার কান খোলা ছিল।

১৯৬২ সালে খেয়াল শেখার জন্য কণ্ঠচর্চা শুরু করে, মাস্টারমশাই-এর দেওয়া 'পালটা'গুলো অভ্যেস করে সুফল পাচ্ছিলাম নিঃসন্দেহে। কিন্তু গলা তৈরি করার জন্য ঠিক কী কী করা দরকার, কোন পদ্ধতিতে রেওয়াজ করা প্রয়োজন সেই শিক্ষা বাবা-মা বা এমনকি মাস্টারমশাইও আমাকে দিতে পারেননি।

নানান ধরনের গান গাওয়ার উপযুক্ত গলা কোন পদ্ধতিতে তৈরি করা যায় এই শিক্ষা আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের সাধারণভাবে আজও পাওয়ার উপায় নেই।

কালীপদ দাসের কাছে গান শিখতে শুরু করার পর কণ্ঠ ও হারমোনিয়ম যন্ত্রটির ওপর আমার দখল বাড়তে থাকে। পালটা'গুলো অনুশীলন করে করে

কয়েকটি দিক দিয়ে আমার গলা হয়ে ওঠে সচল। সেই সঙ্গে হারমোনিয়মটা বাজাতে পেরে নিজের ওপর আস্থাও বেড়ে যায়। ফলে পরিচিত বিভিন্ন গান আমি নিয়মিত গাইতে শুরু করি ঐ সময়ে।

গানের ব্যাপারে আমি বিশেষ কোনও বাছ-বিচার করতাম না। যে গানগুলো শুনে ভালো লাগত, সেগুলোই গাইতে চেষ্টা করতাম। প্রিয় গায়ক-গায়িকাদের গান হলেই যে সেগুলো তুলতে চাইতাম, তা কিন্তু নয়, গানটা শুনতে কেমন লাগল— সেটাই ছিল প্রথম বিবেচনা। শুনে ভালো লাগলে গাইতেও ইচ্ছে করত। তখন চেষ্টা করতাম গানের কথাগুলো জোগাড় করতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেডিয়োয় বা গ্রামাফোন রেকর্ডে শুনে শুনে গানের লিরিক লিখে ফেলতাম।

সুর মনে রাখার ক্ষমতাটা আমার জন্মাবধি প্রখর। খুব ছেলেবেলা থেকেই কোনও গান একবার শুনলে এবং তা মোটামুটি ভালো লাগলে, সুরটা মনে থাকত। শুনে শুনে গান তোলার অভ্যেসটা ছেলেবেলা থেকে রেখেছিলাম বলে পরের দিকে এই ক্ষমতাটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। গান তোলার সময়ে ও গাওয়ার সময়ে কখনও কোনও বিশেষ গায়কের ভঙ্গি বা কণ্ঠবৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতাম না। এই কাজটি আমি ছেলেবেলা থেকে কখনও করিনি। ছোটবেলায় বাবার কাছে গান শিখেছি যথেষ্ট, কিন্তু বাবার গায়কী অনুকরণ করিনি। এহেন নির্দেশ বাবাও কখনও দেননি, এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও নয়। কলেজে উঠেও বাবার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছি, নানান আধুনিক গানে স্বরপ্রক্ষেপ ও খুঁটিনাটি নানান দিক সম্পর্কে বাবা আমায় সুষ্ঠু উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কখনও বলেননি— ঠিক এইরকম গলা করে, এইভাবে গাও।

হিন্দুস্থানি রাগসংগীতে হাতেখড়ি যাঁর কাছে সেই কালীপদ দাসও দীর্ঘ বারো বছরে একটিবারও বলেননি 'অমুক জিনিসটা ঠিক এইভাবে করো বা আমার গায়কী অনুকরণ করো।'

যে কোনও গান তোলার সময়ে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতাম সুর তালের দিকে। কোথায় কোন স্বর লাগছে, কোথায় কোন কাজ রয়েছে, সুর ছন্দের কাঠামোটা কেমন, সেই কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে কোথায় কোন সূক্ষ্ম সুরের খেলা রয়েছে— এগুলোই লক্ষ্য করতাম, অনুশীলন করতাম, শিখতে ও গাইতে চেষ্টা করতাম। কোন জায়গাটা কোন শিল্পী কেমন গলা করে গাইলেন—সেদিকে নজর ছিল না। কিন্তু কোনখানে কোন শিল্পী তাঁর কণ্ঠটাকে কীভাবে প্রয়োগ করলেন, একটা সূক্ষ্ম ও জটিল অংশকে কে কীভাবে সামলাবেন, ফুটিয়ে তুললেন, সেদিকে কান ছিল সজাগ।

ছয়-এর দশক থেকেই আমি খুব সজাগ হয়ে গান শুনতে শুরু করি। কোন

গানে কোন শিল্পী কী কী করলেন, কী কী করার চেষ্টা করলেন অথচ তেমন সফল হলেন না—সে ব্যাপারেও সজাগ হয়ে উঠেছিলাম আমি।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমি ওই বয়সে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলাম। গানের পর গান শিখতে গিয়ে, তুলতে গিয়ে, গাইতে গিয়ে নাকাল হতাম খুব। কিন্তু হাল ছাড়তাম না। প্রতিদিনই অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও গান গাইতাম হারমোনিয়ম বাজিয়ে। কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গান, কিছু আধুনিক গান, দু-একটি ভজন। মাস্টারমশাই আমাকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ছোট খেয়ালের বন্দিশ, ছোট ছোট তান সরগমের পাশাপাশি ভজনও শেখাতে শুরু করেন। তাঁর কাছে শেখা প্রায় সবকটি ভজনেরই সুরকার ছিলেন চিন্ময় লাহিড়ি। কী অনবদ্য সুরই না তিনি করে গিয়েছেন।

ছেলেবেলায় আমার গলা সরু ছিল। সেই গলায় সূক্ষ্ম কাজগুলো তুলতে সুবিধে হত। বয়ঃসন্ধির সময়ে গলা ভেঙে যাবার পর নতুন যে গলা পেলাম, সেটি প্রথমত ভাঙা-ভাঙা। সে বড় যন্ত্রণা ও হতাশার সময় ছিল। গলা ভাঙার আগে গানগুলো সহজেই গাইতে পারতাম, যে কাজগুলো সাবলীলভাবে করতে পারতাম, গলা ভাঙার পর সেগুলো প্রথমে নাগালের বাইরে চলে গেল। আমার গলায় তাদের ফিরিয়ে আনতে আমাকে বছরখানেক ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছিল।

অনেক ধ্বস্তাধস্তির পর আবার যখন একদিন ধীরে ধীরে কিছুটা সহজে গান গাওয়ার ক্ষমতা ফিরে পেলাম, আমার গলা তখন পালটে গিয়েছে। আওয়াজটাই গেল পালটে। কণ্ঠের এই রূপান্তর হতে সময় লেগেছিল। আমার ধারণা আমার কণ্ঠে শারীরিক কারণে রূপান্তর ঘটেছে অনেক বছর ধরে। অনেকগুলো বছর খুব বেগ পেতে হয়েছে আমাকে গান গাইতে গিয়ে। এই রূপান্তরের ব্যাপারটা এক একজনের ক্ষেত্রে হয়তো এক-একভাবে হয়। কতটা সময় ধরে কণ্ঠের চরিত্রে ও ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটবে, সেটিও বোধহয় কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না। এমন মানুষের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে যিনি বয়ঃসন্ধির পর আর গানই গাইতে পারেননি।

গলা ভাঙার পর আমার কণ্ঠ ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। লক্ষ করলাম মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে আমি স্বচ্ছন্দ। সমস্যা দেখা দিল তারসপ্তক নিয়ে। হারমোনিয়মের 'বি ফ্ল্যাট' পর্দাটিকে ষড়জ ধরে তারসপ্তকের মাধ্যমে দাঁড়াতেও আমাকে খুব কষ্ট করতে হত। অথচ মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ পর্যন্ত আমি গলায় কোনও রকম চাপ না দিয়েই নেমে আসতে পারতাম। বাবা বলতেন আমার গলার চরিত্র হল ইউরোপীয় সংগীতের হিসেবে 'ব্যারিটোন'-গোছের।

তারসপ্তক নিয়ে আমাকে দীর্ঘকাল ভুগতে হয়েছে। শুদ্ধ গান্ধার পেরোতে

হলেই আমি অতিরিক্ত সচেতন হয়ে যেতাম। আমার গলার স্বাভাবিক ওজন হারিয়ে যেত। চাপ পড়ত খুব গলায়।

প্রথমদিকে খেয়াল শিখতে গিয়ে আমার খুব অসুবিধে হয়েছিল তারসপ্তকে আমার দুর্বলতার কারণে। আমার মাথার ভেতরে ওই সপ্তকের যে সুরগুলো খেলত, গলায় সেগুলোকে ফোটাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যেতাম।

গলা ভেঙে যাবার সময় বছরখানেক গান গাইতে পারিনি বটে, কিন্তু হারমোনিয়মটা বাজাতাম নিয়মিত। প্রিয় গানগুলি আমি তখন হারমোনিয়মে বাজাতাম। তখন থেকেই আমার খুব শখ ছিল পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাব। কিন্তু ঐ দামি বিদেশি যন্ত্রটি কিনে দেবার আবদার আমি মা-বাবার কাছে করতে পারিনি। আমি জানতাম যে বাবা-মা অত দামি যন্ত্র কিনে দিতে পারবেন না।

অগত্যা আমি বেতারে পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়নের অনুষ্ঠানগুলো হাভাতের মতো শুনতাম। সে-সময়ে মুকুল দাস পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়নে পাশ্চাত্য সংগীত, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকান সুর বাজাতেন। বেশ রাতের দিকে সেই অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। আমি অনেক সময়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে একমনে মুকুল দাসের অ্যাকোর্ডিয়ান শুনতাম আর স্বপ্ন দেখতাম।

হারমোনিয়মে ওইসব সুর বাজাতে চেষ্টা করতাম। সেইসঙ্গে রাগরাগিণীর সুরও বাজাতাম তেড়েফুঁড়ে। প্রিয় আধুনিক গানের 'প্রিলিউড' ও'ইন্টারলিউড' গুলো হারমোনিয়মে বাজিয়ে বাজিয়ে রপ্ত করতাম।

বাবার সংগ্রহে পাশ্চাত্য সংগীতের যে সব রেকর্ড ছিল, তাছাড়া বাবা মাঝে মাঝে যেসব রেকর্ড ধার করে আনতেন সেগুলো শুনে শুনে 'কর্ড' ও 'হারমোনি'র রসও পেয়ে গিয়েছিলাম, বেশি কর্ড তো আর জানতাম না। যেটুকু শুনে শুনে শিখেছিলাম, সেটুকুই মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে প্রয়োগ করতাম এখানে ওখানে। সহজ সরল হারমোনির বোধ আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। মোটামুটি সহজ সুরে একটা বাংলা গান হলে, স্বরসঙ্গতি রক্ষা করে সমান্তরাল একটি সুর গড়ে তোলার ক্ষমতা আমি অল্প বয়সেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম নিজের মধ্যে। ব্যাকরণ জানতাম না। কিন্তু 'হারমোনাইজড' সুর তৈরি করে ফেলতে পারতাম নিমেষের মধ্যে। এর পেছনে ফাদার পিন্টোর তালিম এবং অজস্র পাশ্চাত্য লঘু সংগীত শোনার অভিজ্ঞতার একটা ভূমিকা ছিল নিশ্চয়ই।

আমি ভালো হারমোনিয়ম বাজাতে পারতাম বলে আমাদের পারিবারিক ঘরোয়া আসরে বাবা, মা ও দাদার সঙ্গে আমি প্রায়ই সঙ্গত করতাম। '৬৩/৬৪' সালেই যে-কোনও গানের সঙ্গে দিব্যি হারমোনিয়ম বাজিয়ে দিতে পারতাম আমি। কোনওদিন শুনিনি এমন গানের সঙ্গেও। হাত সমানে নিশপিশ করত গানের

সুরের সঙ্গে কিছু একটা জুড়ে দেবার জন্য। হারমোনিয়মের সাহায্যে মূল সুরের একটা পটভূমি গড়ে দেবার জন্য ছটফট করতাম আমি সেই অল্প বয়সেই। আমার অজান্তেই আঙুলগুলো চলে যেত স্বরসাযুজ্যের সন্ধানে আশপাশের পর্দায়, মায় অন্য সপ্তকে। অল্পস্বল্প শেখা 'কর্ড'গুলো প্রয়োগ করে ফেলতাম। বাবা মাঝে মাঝে বকুনি দিতেন— "কী যে উলটো-পালটা বাজাচ্ছিস!"

আমি কিন্তু দমে যাইনি। সেই 'উলটো-পালটার' দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আমি আকৈশোর সাড়া দিয়ে গিয়েছি, ছুটে গিয়েছি। হাবুডুবু খেয়েছি 'উলটো-পালটার' স্রোতে। প্রাণপণে খুঁজে ফিরেছি স্বর ও সুরের ভিন্নতর অনুষঙ্গ, স্বরের দোসরকে। দিনের পর দিন খুঁড়ে ফেলেছি হারমোনিয়মটা। অপটু, অদক্ষ মগজ ও হাত নিয়ে পর্দায় পর্দায় হাতড়ে বেড়িয়েছি ধ্বনি, নতুন স্বরবিন্যাস, স্বরপরম্পরা ও স্বরসমষ্টির খোঁজে।

এই সব সন্ধান ও অনুশীলনের পথ ধরেই আমি ক্রমশ এগিয়ে যাই সুর রচনা ও সুর সংযোজনার দিকে। বছর তেরো-চোদ্দো বয়সে আমি প্রথম সুর করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে ছোট্ট একটি কবিতায় আমি একদিন সুরারোপ করে ফেলি: 'তোমারে আমি কখনও চিনি নাকো/ লুকানো নহ তবু লুকানো থাকো।' ইত্যাদি।

পাঁচ মাত্রার তালটা কেমন যেন আপনা থেকেই এসে গেল। যে সুর করলাম, সেটি আদৌ সহজ নয়। স্বরপরম্পরার ছোটোখাটো মারপ্যাঁচও তাতে ছিল। মনে আছে খুব বেশি খাটতে হয়নি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সুরটা দাঁড়িয়ে গেল। না, আমি যে একটি কবিতায় সুর দিয়েছি, এই খবরটা আমি কাউকেই দিতে পারিনি।

এর তেইশ বছর পর ওই সুরটির ওপর আমি মরিয়া হয়ে নিজের কথা বসিয়ে দিই। সেই গানটি, 'কোথায় গেলে পাব তোমার দেখা।' আমার এক প্রাক্তন সহশিল্পীকে শিখিয়েও দিয়েছিলাম। নিজে কখনও গাইনি।

প্রথম সুর সংযোজনটা করার পরেই বেশ কিছুদিন ছোঁকছোঁক করেছিলাম নতুন সুর করার জন্য। কিন্তু একবার থেকে আধুনিক গান গেয়ে যাওয়ার তাগিদটাও ছিল সমান জোরদার। সেইসঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের কাছে রাগসংগীতেও তালিম চলছিল। তার পাশাপাশি রাগপ্রধান বাংলা গান আর ভজন এবং কিছু গীতও শিখছিলাম। কাজেই সুর করার দিকে তখন আর ততটা সময় দিতে পারিনি। ইচ্ছেটা কিন্তু উবে যায়নি তাই বলে।

সমানে বাংলা গান, বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে আমি এমন একটা জায়গায় চলে এলাম যে আমি ঘণ্টা দুই-তিন অবিরাম একের পর এক গান গেয়ে যেতে পারি। তখন আমার বছর পনেরো-ষোলো বয়স।

ঐ সময়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে আমি দশটা ঠাটের মূল রাগগুলি শিখে নিলেও, স্বরবিস্তারে ভয়ানক অপটু ছিলাম। সরগম করার ব্যাপারে আমার একটুও নিজস্বতা ছিল না। তানেও তথৈবচ।

মাস্টারমশাই যেসব তান সরগম লিখে দিতেন, সেগুলোই মুখস্থ করতাম। তিনি আমায় সমানে উৎসাহ দিতেন যাতে আমি ওইসব বাঁধা গতের বাইরেও নিজের থেকে তান, সরগম, বাট, বোলতান ইত্যাদি করি। কিন্তু আমি বোকা বোকা হাসি নিয়ে তানপুরা ছাড়তাম মাত্র। সরগম করতে গেলেই উলটো-পালটা হয়ে যেত। বলছি গান্ধার, গাইছি পঞ্চম। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জা পেতাম। মাস্টারমশাই একটুও রাগ করতেন না। হাসতেন। উৎসাহ দিতেন। আমার চরম আনাড়ি অপচেষ্টা দেখে হেসে ফেলতেন, কিন্তু সে-হাসিতে খোঁচা ছিল না, বিদ্রূপ ছিল না।

'৬২/'৬৩ সাল থেকে রাগসংগীতের রেকর্ড শোনার বহরও বাড়তে থাকে। বাবা একটা রেকর্ড প্লেয়ার এবং কিছু রেকর্ড কিনে ফেলায় গানবাজনা শোনার সুবিধেও হয়ে গিয়েছিল।

একদিন বাবা বড়ে গোলাম আলি খানের ঠুংরির একটি 'লংপ্লে' রেকর্ড আনলেন। রেকর্ডটি ক্রমাগত শুনতে শুনতে আমার কেমন নেশা ধরে গেল। আরও ছেলেবেলায় যাঁর গান আমায় টানত না, কৈশোরে তাঁর গানই জড়িয়ে ধরল আমাকে। মাঝেমধ্যেই চালিয়ে দেওয়া হত রেকর্ডটা। আমরা সকলে যে যার কাজ ফেলে জড়ো হতাম, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম।

আমার সবচেয়ে পছন্দ হত জংলা ভৈরবীতে ঠুংরিটি, 'সাঁইয়া বোলো' এবং 'ইয়াদ পিয়া কি আয়ে।'

এমন করে একে একে এল পান্নালাল ঘোষের বাঁশি, সালামাত নাজাকাতের পাহাড়ি ঠুংরি, বিলায়েত খান ও বিসমিল্লা খানের 'ডুয়েট', মিয়াজ আহমেদ ও ফৈয়াজ আহমেদের দ্বৈতকণ্ঠে খেয়াল, ডাগর ব্রাদার্সের ধ্রুপদ, রবিশঙ্কর ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার।

আমি মজতে শুরু করেছি তখন। রাগসংগীতের রূপে রঙে রসে ডোবার পালা আমার তখন শুরু।

একই সঙ্গে শুনছি তখন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান। তাঁর 'শেষের গানটি ছিল তোমার লাগি' আর 'নবারুণ রাগ'-এ সেই যে আমার সঙ্গ নিয়েছে, আজও ছাড়েনি। শুনতাম আর অবাক হয়ে ভাবতাম লোকটা গাইল কী করে!

সংগীতে চির-উদার আমার বাবা এইসব গানের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ডও জোগাড় করে আনতেন। তাছাড়া আকাশবাণী কলকাতার 'মিউজিক্যাল

ব্যান্ডবক্স' অনুষ্ঠানটি তো ছিলই। ফলে প্যাট বুন, জিম রিভস্, ন্যাট কিং কোল, মিনা এন্ড ফ্রেডারিক, কিংসটন ট্রেয়ো, ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা! কাকে ফেলে কাকে ধরি!

যে ভালোবাসা দিয়ে ভীষ্মদেবের 'শেষের গানটি' শুনছি, সেই একই ভালোবাসা দিয়ে শুনছি প্যাট বুনের 'রিমেম্বার ইউ আর মাইন', ন্যাট কিং কোলের 'মোনালিসা' মিনা এন্ড ফ্রেজডারিকের 'কাউন্টিং কালার্স ইন দ্য রেইনবো।'

কতবার ভেবেছি সে সময়ে প্যাট বুন যদি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গাইতেন!

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে আকাশবাণীতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের মাত্রা বেড়ে গেল, রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের সংখ্যাও গেল বেড়ে। চারদিকে রবীন্দ্রসংগীত শোনা যেতে লাগল অনেক বেশি। আমার মনে এই ব্যাপারগুলো বিশেষ রেখাপাত করেনি। রবীন্দ্রনাথের গান আবাল্য শুনছি, শিখছি ঘরে বসে। আমাদের সেই ছোট্ট ঘরে রবীন্দ্রনাথের গান মিলেমিশে ছিল আরও বহু গানের সঙ্গে। কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচনাকে পৃথক কোনও গুরুত্ব দিতে শিখিনি কখনও। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কোনও নতুন কল্লোল তোলেনি আমাদের ঘরোয়া সংগীতচর্চার পরিবেশে।

তবে ১৯৬১ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে লাগলাম আশপাশে। দেখতে পেলাম রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার নতুন নতুন স্কুল। হাওয়াইয়ান গিটারেও টুংটুং করে রবীন্দ্রসংগীতের সুর শোনা যেতে লাগল আরও ঘনঘন। এমনিতে মোটেও সংগীতপ্রেমী নন, গানবাজনার ধার মাড়ান না এমন অনেকে অল্প সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে আহামরি শ্রদ্ধার ভাব শিক্ষিত সমাজে কোনওদিনই দেখিনি। শতবার্ষিকীর পর থেকে কিছু বছরের মধ্যে আধুনিক গান হয়ে পড়ল যেন ব্রাত্য।

১৯৭২/৭৩ সাল পর্যন্ত অনেকের মুখে শুনতে হয়েছে—'এ মা, তুমি এইসব ছাইপাঁশ আধুনিক গান গাও কেন? রবীন্দ্রসংগীত কত ভালো শোনায় তোমার গলায়!'

একরাশ বিরক্তি ও ক্ষোভ নিয়ে লক্ষ করে গিয়েছি, রবীন্দ্রসংগীত কীভাবে বেশ কিছু বেসুরো বেরসিক লোকের সম্পত্তি ও হাতিয়ার হয়ে উঠল। যে সংগীতকার আগাগোড়া 'দস্তুরভাঙা' গান গড়ে গেলেন, তাঁর গানগুলোর ওপরেই কিনা চাপানো হল একগাদা দস্তুরের বোঝা।

ওদিকে মাস্টারমশাইয়ের কাছে রাগসংগীতের তালিম নেওয়াটাও দস্তুরের পর্যায়ে চলে যেতে বসেছে অথচ রাগসংগীত শোনার বেলা আনন্দ পাচ্ছি—

এইরকম একটা টানাপোড়েনের মধ্যে আমার বছর দুয়েক কাটল। প্রধান কারণ: খেয়াল শিখছি অথচ প্রাণ খুলে গাওয়ার মজা পাচ্ছি না, কারণ রাগের স্বরগুলো নিয়ে খেলতে পারছি না। পাখিপড়ার মতো করে গাইছিলাম তখন। গাইছিলাম না বলে ওগরাচ্ছিলাম বলাই ভালো।

রেওয়াজে ফাঁকি দেওয়া শুরু করলাম। তানপুরাটায় বেশ ধুলো জমেছে দেখতে পেয়ে বাবা একদিন আমায় ভয়ানক বকলেন। বেজায় বকুনি খেয়ে রেওয়াজে বসলাম বটে, কিন্তু মন দিতে পারলাম কই!

এমন সময়ে একদিন বাবার দেওয়া একটা টিকিট নিয়ে রবীন্দ্রসদনে রাগসংগীতের একটি অনুষ্ঠান শুনতে গেলাম। সন্ধে থেকে শুনছি তো শুনছিই। শেষ রাতে আসরে এলেন আমীর খান। তিনি গাইলেন ভাটিয়ার। আমার স্পষ্ট মনে আছে; তাঁর গান শুনতে শুনতেই আমি দিব্যি টের পেলাম যে আমার মধ্যে কী একটা ঘটতে শুরু করেছে। ওলট-পালট হয়ে গেল যেন আমার মধ্যে। তাঁর গান শেষ হবার পর ভোরবেলা আমি নেশাগ্রস্তের মতো হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। রবীন্দ্রসদন থেকে এস আর দাস রোড। শুধু মাথা নয়, আমার গোটা শরীরের মধ্যে অবিরাম পাক খেয়ে গেল আমীর খানের গায়কী। ভাটিয়ারে তাঁর ভাবনার প্রতিটি ভাঁজ। আমীর খানের গাওয়াটাকে আঁকড়ে ধরে কাকভোরে আমি বাড়ি ফিরেই জীবনে সেই প্রথম সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে তানপুরাটা বের করে রেওয়াজে বসে গেলাম। ভালোবেসে সেই আমার প্রথম রেয়াজ।

মঞ্চে প্রথমবার শুনেই আমার মনে হল যে আমীর খান প্রধানত দুটি কাজ করেছেন। প্রথমত তিনি রাগরূপটিকে, রাগের মেজাজটাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিরঙ্কুশ ধৈর্য সহকারে। এটা করার জন্য তিনি যেন রাগের স্বরগুলির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে আবিষ্কার ও কায়েম করতে চাইছেন। দ্বিতীয়ত তিনি বিস্তার ও সরগমের মধ্যে দিয়ে নির্মাণ করতে চাইছেন অনাস্বাদিতপূর্ব সব বিন্যাস পরম্পরা, স্বরভিত্তিক ভাবনার হয়ে ওঠার পথ ধরে। আমীর খানের পরিবেশনায় খেয়াল ক্রমশ হয়ে উঠেছে, বেড়ে উঠছে, ধীরে ধীরে— যেন একটা গাছ।

তার আগে অনেকের খেয়াল শুনেছি কিন্তু এমন গভীর ভাবনা, এমন হয়ে ওঠা আর কারুর গানে পাইনি।

আমীর খানের গান আমাকে খেয়াল আঙ্গিকটাকে যেন চিনতে শেখাল মগজ দিয়ে, ভাবনা দিয়ে। এতদিন খেয়াল শিখেও স্বরবিস্তার ও সরগমের বেলায় আমি ছিলাম অক্ষম, ভিতু। বিন্দুমাত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারিনি এতদিন। খেয়ালের পর্যায় বা অংশগুলো যান্ত্রিকভাবে গেয়ে যাচ্ছিলাম।

আমীর খান আমার ভাবনায় লাগিয়ে দিলেন ঝড়ের হাওয়া। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি ধৈর্য ধরে রেওয়াজ করতে শুরু করলাম। স্বরগুলোতে স্থির হতে লাগলাম, তাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক গড়ে নিতে লাগলাম। প্রয়োগ করতে থাকলাম ধীরে ধীরে আমার ভাবনাগুলোকে স্বরের বিস্তারে। সাহস করে আস্তে আস্তে সরগম অভ্যেস করতে লাগলাম, খুঁজতে লেগে গেলাম নতুন নতুন বিন্যাস।

বাবা নিয়ে এসেছিলেন আমীর খানের খেয়ালের রেকর্ড। একপিঠে মারওয়া, অন্যপিঠে দরবারি কানাড়া। বারবার শুনতে লাগলাম রেকর্ডটা। অজস্রবার শোনার মধ্যে দিয়ে মনে হল যেন পথের হদিস পাচ্ছি।

বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই আমার খেয়াল গাওয়ার যে খানিকটা উন্নতি হয়ে গেল তা আমি নিজেই টের পেলাম। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের গায়কীতে চিন্ময় লাহিড়ির ঘরানার যে কাঠামো ছিল, আমীর খানের প্রভাবের ফলে সেই কাঠামোটা আর আমার গায়কীতে থাকতে চাইল না। আমি ক্রমান্বয়ে খুব সচেতনভাবে অনুসরণ করতে লাগলাম আমীর খানের পদ্ধতি প্রকরণ। মাস্টারমশাই এত উদার শিক্ষক ছিলেন যে তাতে তিনি একটুও ক্ষুব্ধ হলেন না। বরং এতদিনে ছোকরা নিজের থেকে স্বরবিস্তার করছে, তান সরগম করছে দেখে তিনি খুশিই হলেন। ধীরে ধীরে আমার গুরু আর আমি একসঙ্গে গাওয়া শুরু করলাম। তিনি ছাড়ছেন আমি ধরছি।

আমীর খানের গায়কীতে ক্রমান্বয়ে মজে গিয়েও আমি কান খোলা রাখতাম মাস্টারমশাইয়ের গায়কীর দিকে। দ্রুত লয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যে সরগম করতে পারতেন তিনি। কয়েকটি জায়গায় এমনভাবে সরগম করতেন যে মনে হত কোনও তারের যন্ত্র বাজছে। এই প্রয়োগটা অভিনব মনে হয়েছিল আমার। এছাড়া তার-সপ্তকে মাস্টারমশাই অসামান্য দক্ষতায় এমন কিছু ছোট ছোট ঠুংরির কাজ করতেন যা আমার চমকপ্রদ লাগত। এই প্রয়োগ-পদ্ধতিটা বড়ে গোলাম আলি খানের আঙ্গিকেও পাওয়া যায়। এই দিকগুলো আমি অনুসরণ করতে ছাড়িনি। আমীর খানের আঙ্গিকে প্রভাবিত হয়েও আমি অন্যান্য আঙ্গিকের প্রতি বধির হয়ে যাইনি কখনও। তবে হ্যাঁ, পুষ্ট হয়েছি আমি সবচেয়ে বেশি আমীর খানের খেয়াল শুনেই।

১৯৬৬ সালেই আমি আকাশবাণীর সংগীত প্রতিযোগিতায় নাম দিলাম। পশ্চিম-বাংলার সব প্রতিযোগীর মধ্যে রাগপ্রধান ও ভজনে আমি হলাম প্রথম, রবীন্দ্রসংগীতে হলাম দ্বিতীয়। প্রথম হয়েছিলেন, যতদূর মনে পড়ে শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত।

নিয়মটা ছিল এইরকম যে প্রতিটি রাজ্যে যাঁরা প্রথম হবেন, তাঁদের গান স্ব-স্ব রাজ্যে রেকর্ড করে দিল্লিতে পাঠানো হবে।

দিল্লির প্রতিযোগিতার জন্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আমায় একটি ভজন শিখিয়ে

দিলেন। মনে আছে, প্রথমে তিনি ভজনটি আমায় শেখালেন টেলিফোনে। খালি গলায় গাইতে লাগলেন এক প্রান্ত থেকে। অপর প্রান্তে আমিও খালি গলায় গাইতে লাগলাম। এ ছিল, বলা যায় ভূমিকা। এর পর একদিন আকাশবাণীতে গিয়ে একটি ফাঁকা স্টুডিয়োয় জ্ঞানবাবুর কাছে গানটি ভালোভাবে শিখে নিলাম।

দুটি রাগপ্রধান ও দুটি ভজন রেকর্ড করা হল শুধু তানপুরা ও তবলা সহযোগে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ নিজে সব তত্ত্বাবধান করলেন। কিন্তু আখেরে— বিশেষ কিছুই হল না। দিল্লিতে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় আমি মার খেয়ে গেলাম।

অতটা মার খেলাম না আকাশবাণী কলকাতার অডিশনে। ১৯৬৬ সালেই অডিশন দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গানে পেয়েছিলাম 'বি-হাই গ্রেড' আর নজরুলগীতিতে 'বি গ্রেড'। নজরুলের গান আমি কিছু কিছু শিখেছিলাম মাত্র। নিজের ওপর তেমন আস্থা ছিল না।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে মোটামুটি একমাস-দেড়মাস অন্তর রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গান গাইতে থাকলাম আমি। রবীন্দ্রসংগীত বাবার কাছে তো শিখতামই, তাছাড়া নীহারবিন্দু সেনের কাছেও মাঝে মাঝে গিয়ে শিখে আসতাম। ভারি যত্ন করে গান সেখাতেন আমায় নীহারবিন্দু সেন। এককালে তিনি আমার মাকেও গান শেখাতেন। মা তাঁকে ডাকতেন 'খোকা কাকা' বলে। আমি বলতাম নীহারদাদু।

ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে শিখে আমার কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের স্বীকৃত গায়কী কিছুটা এসে গিয়েছিল বোধহয়। কেউ কেউ দেখতাম আমার গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান পছন্দ করছেন। আকাশবাণীর বিমান ঘোষ তাঁদের একজন। খুব উৎসাহ দিতেন তিনি।

স্বরলিপি পড়েও রবীন্দ্রনাথের অনেক গান তুলে নিতাম। বাবা সেগুলো শুনতেন। জায়গায় জায়গায় ঠিকঠাক করে দিতেন।

আধুনিক গানের বেতার অনুষ্ঠানে আমি প্রথমে হিমাংশু দত্ত ও সুধীরলাল চক্রবর্তীর কিছু গান গেয়েছিলাম। সুধীরলালের গান কিছু শিখেছিলাম তাঁর এবং বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিখিলচন্দ্র সেনের কাছে।

নিখিল সেনের মতো এত ভালো, এত মিষ্টি স্বভাবের মানুষ এবং এত গুণী শিল্পী কমই দেখেছি জীবনে।

জার্মান লেখক হাইনরিখ ব্যোল্, কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের বন্ধুত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন একবার। অনুরূপ একটি প্রবন্ধ বোধহয় সুধীরলাল চক্রবর্তী ও নিখিলচন্দ্র সেনের বন্ধুত্বের ওপরেও লেখা যায়।

সুধীরলাল অকালে মারা যাবার পর নিখিল সেন প্রতি বছর একবার করে সুধীরলালের স্মৃতিবাসর আয়োজন করে গেছেন কয়েক দশক। শেষের দিকে নিজের অসুস্থতার কারণে আর একা সবদিক সামাল দিতে পারতেন না। তাই ঐ অনুষ্ঠানটি আর নিয়মিত হতে পারে নি। কিন্তু যতদিন নিখিল সেন সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন অনুষ্ঠানটির আয়োজন করতে।

বছরে একবার ঐ একটি দিন একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে সুধীরলালের গানগুলি শোনার সুযোগ হত। সুধীরলাল যে কত বড় মাপের সুরকার ছিলেন, তাঁর সুর যে কত বিচিত্র, ঐ একটি আসরে মিলত তার প্রমাণ। ছেলেবেলা থেকে প্রতি বছর অনুষ্ঠানটি শুনতে গিয়েছি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতাম আর দেখতাম শুনতাম মঞ্চে একের পর এক এসে গেয়ে যাচ্ছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, নীতা সেন। 'স্মৃতি তুমি বেদনা', 'ভুলেছি তোমারে অনেক বেদনা সহি', 'খেলাঘর' 'আশা বাঁধে ঘর অকারণে', 'ওগো মোর গানের পাখি', 'এক হাতে মোর পূজার থালা' 'তব কাঁকনের ছন্দে'... এক একটি গান এক একটি অভিজ্ঞতা।

অনুষ্ঠানটি শুরু হত সুধীরলালের গাওয়া 'মধুর আমার মায়ের হাসি' গানটির রেকর্ড বাজিয়ে। একবার —আমি তখন নেহাতই কিশোর—আসরে আমাকে দেখতে পেয়ে নিখিলকাকু আমাকে আহ্বান করলেন 'মধুর আমার মায়ের হাসি' গানটি উদ্বোধন করতে। আমি তো ভয়ে আর লজ্জায় আধমরা। অপ্রস্তুত অবস্থায় কোনওরকমে গেয়ে দিয়েছিলাম।

সুধীরলালের স্মৃতিবাসরেই প্রথম সামনে থেকে শুনেছিলাম দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের গান। তিনি গেয়েছিলেন সুধীরলালের সুরে একটি হিন্দি গীত। দারুণ লেগেছিল।

তার কয়েক বছর পর দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় রেকর্ড করেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে 'যে আকাশে ঝরে বাদল' আর 'যে গানখানি শুনিয়ে যাই তোমায় বারেবার।'— যেমন সুর তেমন চোস্ত গাওয়া।— দীপঙ্করবাবুর গান আজকাল তেমন শুনি না। এরকম একজন সুগায়ক কেন অবহেলিত?

এখন মনে হয় আমি কী বোকা, নিখিলচন্দ্র সেনের কাছে কেন সুধীরলালের সমস্ত গান শিখে নিইনি। কেন তাঁর কাছে নিয়মিত যেতাম না! বড় রাগ হয় নিজের ওপর।

কণ্ঠচর্চার ব্যাপারেও নিখিলকাকু আমাকে এমন একটি পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যা আমার অন্তত খুব কাজে লেগেছে। আগেই বলেছি যে বাবা-মার

কাছে কত বাংলা গান শিখেছি, কিন্তু গলা তৈরি করার পথ তাঁরা আমায় দেখাতে পারেন নি। খেয়ালের হাতেখড়িও বারো বছরের তালিম যাঁর কাছে, সেই কালীপদ দাস আমাকে কণ্ঠচালনার নানান অনুশীলন দিলেও কণ্ঠচর্চার তেমন কোনও পদ্ধতি দেখিয়ে দিতে পারেন নি। এটি আমায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন একদিন নিখিল সেন।

বয়সে তিনি বাবার চেয়েও কিছু বড় ছিলেন। প্রচুর পানামা সিগারেট খেতেন। বেশি বয়সেও গলার আওয়াজটি ছিল তাজা। দমের অসুবিধে তাঁর ছিল। কিন্তু আমাদের বাড়িতে বসে গান গাইতেন যখন, দেখতাম তিনটি সপ্তকে তাঁর অবাধ গতিবিধি। কত সাবলীলভাবে গাইতে পারতেন তিনি।

আমার তো আবার তারসপ্তকে দুর্বলতা ছিল। মোটা গলায় ছোট ছোট কাজগুলো সহজে আসতে চাইত না। নিখিলকাকুকে একদিন এই সমস্যার কথা বলতে এবং তিনিও ওই বয়সেও গলাটা কী করে অত সাবলীল রেখেছেন তা জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—'খালি তলার দিকে রেওয়াজ করে যাও। সকালে যখনই রেয়াজ করতে বসবে মধ্যসপ্তক থেকে খালি মন্দ্রসপ্তকে নেমে এসো আর ফেরো। অনেকক্ষণ এইভাবে চালাও। তান সরগম দুইই —খালি মন্দ্রসপ্তকে, বড়জোর মধ্য সপ্তকে। দেখবে তারসপ্তকের গলা খুলে যাবে। সব জায়গায় গলা চলবে সহজে। আওয়াজটাও হবে ভালো।'

নিখিলচন্দ্র সেনের দেওয়া এই পদ্ধতিতে আমি আজও রেওয়াজ করি। ১৬ বছর গান না গেয়েও, অত দীর্ঘ সময় গলার বিন্দুমাত্র যত্ন না নিয়েও এবং ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত গানের কোনও অনুষ্ঠান না করেও আমি যে আবার গান গাইছি, পেশাদার গায়ক হিসেবে বেঁচে আছি, এর মূলে কিন্তু কণ্ঠচর্চার ঐ পদ্ধতি। প্রতিদিন অন্তত তিন ঘণ্টা, কখনও কখনও আরও বেশি, আমি ঐ পদ্ধতিতে 'ক্রোম্যাটিক স্কেল'-এ বরাবর রেওয়াজ করি জয়ন্ত চক্রবর্তীর তৈরি ইলেকট্রনিক তানপুরা চালিয়ে। নিখিলচন্দ্র সেনের কাছে আমি চিরঋণী রইলাম।

তাঁর কাছে সুধীরলালের কিছু গান শিখে এবং হিমাংশু দত্তর কিছু গান আকাশবাণীর আধুনিক গানের অনুষ্ঠানে গাওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যেই গানের ভাড়ারে টান পড়ল। আধুনিক গান আমি প্রচুর জানতাম। কিন্তু সবই তো অন্য শিল্পীদের রেকর্ড-করা গান। ১৯৬৬-৬৭ সালে তাঁদের অনেকেই তুঙ্গে। তাঁদের গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলি রেডিয়োয় গাওয়ার চেষ্টা করে লোক হাসানোর দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা আমার ছিল না। কাজেই, প্রধানত বেতারে অনুষ্ঠান করার লক্ষ্যেই আমি আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকারদের লেখা গানে সুরারোপ করা শুরু করলাম মোটামুটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সে।

অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বেশ কিছু গানে সুর দিয়ে বেতারে গেয়েছিলাম আমি। একবার কবিতা সিংহর কাছ থেকে একটি গান চেয়ে নিয়ে তাতেও সুরারোপ করে গেয়েছিলাম। সেই গানটির লিরিক ছিল প্রচলিত আধুনিক গানের অধিকাংশ লিরিকের থেকে আলাদা। গানটির বিষয় ছিল সূর্যবন্দনা। না, ধর্ম বা হিঁদুয়ানির গন্ধ ছিল না তাতে। সাত মাত্রার তালে মোটের ওপর ভাটিয়ার রাগে বেঁধেছিলাম গানটি।

১৯৬৭ সালে আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'কোনদিন গেছ কি হারিয়ে' কবিতাটিতে সুর সংযোজনা করি। দীর্ঘ কবিতা। তার আগে অত বড় লিরিকে সুর করিনি। সে সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মিউজিক ক্লাব'-এর শিল্পীদের গানটি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। একাধিক অনুষ্ঠানে গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছিল।

১৯৬৬ সালে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তে ঢুকি। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা আমি বিজ্ঞান বিভাগেই পাস করি। লেখাপড়ায় আমি চিরকালই নেহাত মধ্যমানের। তেমন ভালো ফল করতে পারিনি উচ্চমাধ্যমিকে। তবু পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর ছিল মোটামুটি। আমি তাও পদার্থ বিজ্ঞানে নাম লেখাতে গিয়েও ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হয়ে এলাম।

যে স্কুল থেকে আমি পাস করি, সেই রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবনের বাংলা শিক্ষক বিশ্বনাথ রায় ছিলেন আমার খুব প্রিয়। কলেজে ভর্তি হবার আগে তাঁর কাছে গেলাম পরামর্শ নিতে। বিশ্বনাথবাবু আমায় বললেন— 'তুই ইংরেজি নিয়ে পড় সুমন। দেখবি ভালো হবে।'

আমি কথাটা বাবাকে বলায় তিনিও সায় দিলেন। মা তুললেন প্রবল আপত্তি। আমি ইংরেজিতে ভর্তি হয়ে গেলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজিতে আমার নম্বর ছিল ভালো।

সাহিত্য নিয়ে পড়তে শুরু করে একটা সম্পূর্ণ নতুন জগৎ খুলে গেল আমার সামনে। আমার এক বন্ধু ছিল— সুভাষ ঘোষাল। আমার সঙ্গেই যাদবপুরে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে ঢুকেছিল। সুভাষ ছিল কবি। ভালো কবিতা লিখত। অয়ন নামে একটি কবিতার পত্রিকাও চালাত। কবিতাই ছিল ওর সব।

সুভাষই আমায় কবিতার পাঠক করে তুলল। স্কুল জীবনে আমি পাঠ্যবইয়ের পদ্যের বাইরে কোনও আধুনিক কবিতার বই পড়িনি। গদ্য পড়তাম প্রচুর। কিন্তু কবিতার জন্য কোনও আলাদা টান অনুভব করিনি।

সুভাষ ঘোষালের পাল্লায় পড়ে আমি আধুনিক বাংলা কবিতা পড়তে শুরু করলাম এক ধার থেকে। সেই সঙ্গে ইংরেজি ও ইউরোপীয় কবিতাও (ইংরেজি

অনুবাদ)। কবিতা পড়তে শুরু করেই যেন ডানা গজিয়ে গেল। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম সব। মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে লাগলাম এ-কবিতায় সে-কবিতায়। কবি-কবি একটা ভাবও এসে পড়েছিল হয়তো সে-সময়ে সুভাষের ছোঁয়াচ লেগে! সেই একই কারণে আমি নিজেও পদ্য লিখতে শুরু করলাম। সে-কি ভয়ানক, মর্মান্তিক চেষ্টা! বেচারা সুভাষ না জানি কত কষ্ট পেয়েছিল সে-সময়ে আমার লেখা যাচ্ছেতাই সব পদ্য পড়তে বাধ্য হয়ে!

প্রথমদিকে আমায় ভীষণ পেয়ে বসেছিল সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। সমর সেন যে আমায় পেড়ে ফেললেন। তাঁর কবিতার নাগরিক মাত্রাটি দখল করে ফেলল আমায়। আমার নাগরিক অভিজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতায় সামিল হয়ে গেল সমর সেনের কবিতা। খিদিরপুর ডকে কোনওদিন রাতে যাইনি। তবু এস আর দাস রোডের বাসায় টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনতে লাগলাম। পাশেই বাবা-মার ঘর, তাই ঘুম না এলেও সিগারেট টানার উপায় ছিল না সতেরো বছর বয়সে। বাইরে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতুম।

টি এস ইলিয়টের কবিতাও ভালো লেগে গেল বড়। জে আলফ্রেড প্রুফ্‌ফ্‌ আর সমর সেন মিলিয়ে খাড়া করলাম আমার আইডিয়াল। সন্ধেবেলা পদ্য লিখতে থাকলাম। সে সব কথা ভাবলে আজও শিউরে উঠি।

তার অনেক বছর পর সমর সেনের *ফ্রন্টিয়ার* পত্রিকায় লেখার সুবাদে প্রথম যৌবনের কাব্যগুরুকে বলেছিলাম সেইসব পুরোনো কথা। বলেছিলাম—আমার বারোটা আপনিই বাজিয়েছেন। —সমরবাবু গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে ফিক্ করে হেসে ফেলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, কলেজে ঢোকার পর আমার সামনে খুলে গেল ভাবনা, শব্দ, বাক্যের এক নতুন দুনিয়া। পাঠ্যবই ফেলে যত রাজ্যের বই পড়া শুরু করলাম। আ-দেখলের মতো, হাভাতের মতো, মরিয়ার মতো পড়তে লাগলাম আমি। এমনকি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রেওয়াজ করার সময়েও আমি বই পড়তাম। নিখিলচন্দ্র সেনের উপদেশ অনুসারে প্রথম একঘণ্টা যে মধ্য ও মন্দ্র সপ্তকে স্বরগুলি একের পর এক অনুশীলন করতাম তার পদ্ধতিটা ছিল মোটামুটি যান্ত্রিক। সে তো আর গান গাওয়া নয়। তাতে আবেগ অনুভূতির কোনও স্থান নেই। পদ্ধতিটা সড়গড় হয়ে যাবার পর আমি ডান হাতে তানপুরা ছেড়ে স্বরগুলো, স্বরপরম্পরা বিভিন্ন লয়ে কখনও আ আ করে, কখনও সরগম করে গাইতে গাইতে বাঁ হাতে একটা বই ধরে পড়তাম। এই ব্যাপারটা আমি অভ্যেস করে ফেলেছি দীর্ঘকাল ধরে। আজও আমি এটা করে থাকি প্রতিদিন সাতসকালে।

টানা দেড় ঘণ্টা আমি মন্দ্র মধ্য ও তার সপ্তকে 'ক্রোমাটিক স্কেল'-এ গলা সাধি, অতি ধীর থেকে অতি দ্রুত লয়ে যাই, একের পর এক সাপাটে তান ও সরগম করি এবং সেইসঙ্গে বই পড়ি, চিঠির উত্তর দিই মায় গানও লিখি। সময় যে বড় কম।

প্রথম যখন এই পদ্ধতিটা শুরু করি তখন এক হাতে প্রকাণ্ড তানপুরা এবং অন্য হাতে বইসহ আমাকে নিশ্চয়ই বেশ উদ্ভট দেখাত। কারণ লক্ষ করতাম আমাদের আদরের কুকুর কাটুম হতভম্ব মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার রেওয়াজের চোটে প্রতিবেশীরাও নিশ্চয়ই হকচকিয়ে যেতেন। এস আর দাস রোডের বাড়িগুলো ছিল প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। ১৯৬৭ সাল থেকে আমি তো তেড়ে রেওয়াজ করতাম সুযোগ পেলেই। কলেজ ছুটি থাকলে এমনকি দুপুরেও। রেওয়াজের গুঁতোয় বিরক্ত হয়ে কোনও এক প্রতিবেশী বেনামে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন ডাকে। তাতে লেখা ছিল; "প্রিয় কোকিলবাবু, দয়া করে আপনার চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ করুন।"

কাঁচুমাচু মুখে এবং খুব আহত হয়ে বাবাকে দেখিয়েছিলাম চিঠিটা। বাবা মুচকি হেসে বলেছিলেন—'দেখবি, তুই যদি গান চালিয়ে যেতে পারিস তো একদিন এই লোকটাই লাইন দিয়ে টিকিট কেটে তোর গান শুনতে যাবে।'

সেই চিঠির লেখক ইদানীং সত্যিই লাইন দিয়ে টিকিট কাটছেন কিনা জানি না তবে সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে আমি যোগ দিয়েছিলাম সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রদের সারিতে। ঐ সময়ে সতীন্যুথবাবু একদিন এলেন আমাদের বাসায়। আমার গান শুনতে চাইলেন। মনে আছে তাঁকে আমি তাঁরই গান 'বালুকা বেলায় কুড়াই ঝিনুক' গানটি শুনিয়ে দিলাম জয় মা বলে। সতীনাথবাবু বেজায় খুশি হয়ে বললেন তিনি আমায় গান শেখাবেন। এক বছরেরও ওপর আধুনিক গান শিখেছিলাম সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

কী স্নেহশীল মানুষ ও শিক্ষক যে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। খুব যত্ন করে, ধরে ধরে গান শেখাতেন। গান শিখব, গাইব কি? তাজ্জব হয়ে সামনে বসে শুনতাম তাঁর গান। ওরকম গান শুনে শুনে গাইতে গিয়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করত। কোনওদিন ভালো করে গাইতে পারিনি তাঁর সামনে। কত সাহস তিনি দিতেন, তবু লজ্জা করত বড়। আমার অক্ষমতার নজির তাঁর সামনে রাখব কোন সাহসে?

একদিন সন্ধেবেলা সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে একটু থেকে যেতে বললেন। অন্য ছাত্ররা চলে যাবার পর অনেককালের একটা ইচ্ছে প্রকাশ করে ফেললাম। তিনি কি আমায় একটু গান শোনাবেন। এক গাল হেসে বললেন— 'শোনাব যদি

আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিস।' তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছুটে গিয়ে সিগারেট এনে দিলাম। তিনি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন। বললেন—'নে বাজা দেখি।' আমি হারমোনিয়ম নিলাম, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ভাবে দাঁড়িয়েই গাইলেন 'এখনও আকাশে চাঁদ ঐ জেগে আছে।' সে-গান, তাঁর বাড়িতে তাঁর গানের ঘরে হারমোনিয়ম সংগত করতে করতে সমস্ত সত্তা দিয়ে একা একা শোনা তাঁর সেই গান সারা জীবনের মতো আমার ভেতরে রয়ে গেল।

এরকম একা একা না হলেও খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এস আর দাস রোডের বাড়িতে শোনার সুযোগ হয়েছে পান্নালাল ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরি ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক একজন এক এক বিস্ময়। ছেলেবেলা থেকে এই সব বিস্ময় বুকে নিয়ে বেঁচে আছি।

বেঁচে আছি উৎপলা সেনের কাছে একটি মাত্র গান শেখার অমূল্য অভিজ্ঞতা নিয়েও। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান শেখার সময়ে উৎপলা সেন একদিন বললেন 'রোজ তুই সতীনাথের কছে শিখিস, আজ তোকে আমি শেখাব।' তিনি আমায় 'আকাশ ছেয়েছে ঐ কাজল মেঘে' গানটি শিখিয়েছিলেন। কোন জায়গাটা কীভাবে, কেমন ভঙ্গিতে গাইতে হবে, গলার ওজন কেমন হবে—এমনকি সেই অনুপুঙ্খ ব্যাপারগুলোও বার বার দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। থেকে থেকেই বলছিলেন, 'এক্‌সপ্রেশন চাই সুমন, এক্‌স্‌প্রেশন চাই।'

ঐ বস্তুটি আমার গানে কম ছিল। রেয়াজ প্রচুর করতাম, গান খুব গাইতাম। কিন্তু 'এক্‌সপ্রেসন'?—বেতারে নিজের গানের রেকর্ডিং শুনে বুঝতাম কিচ্ছু হচ্ছে না। যা ভাবছি, যা চাইছি তা হচ্ছে না। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে শোনাচ্ছে। এত কষ্ট করে গাইলাম, কিন্তু গানটা আমায় কিছু বলছে না কেন।

'বলা'র ব্যাপারে আরও একটি দিকে আমার দুর্বলতা ছিল—উচ্চারণ। আমার গানের উচ্চারণ আমার পছন্দ হত না। কিরকম যেন! ঠিক যেন আধুনিক নয়। আধুনিক গানে উচ্চারণের ব্যাপারে আমার আদর্শ মনে হয়েছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। তিনি আমার বাবার যুগের মানুষ। বাবাদের যুগে গায়ক-গায়িকাদের উচ্চারণে অনেক দোষ ছিল, গ্রাম্যতা ছিল। এককালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উচ্চারণও ছিল সাবেকি। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে হেমন্তবাবু কিন্তু তাঁর উচ্চারণ পালটে দেন। উচ্চারণ, স্বরপ্রক্ষেপ ও গায়নভঙ্গি অনেক ভেবে, অনেক খেটে-খুটে পালটে নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সাবেককাল থেকে সমকালে চলে আসেন। আমার বরাবর মনে হয়েছে যে বাংলা গানের উচ্চারণ নিয়ে এবং আধুনিক গানের গায়কী নিয়ে হেমন্তবাবুর যুগের আর-কোনও শিল্পী তাঁর মতো ভাবেননি, খাটেননি।

আমার বাবা বহু বছর আগে গান গাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু বাড়িতে তো অনেককাল অল্পস্বল্প গেয়েছেন। অত সংগীতমনস্ক, সুরপ্রেমী মানুষকেও দেখেছি পুরোনো যুগের উচ্চারণে পড়ে থাকতে। জিজ্ঞেস করলে এই সেদিনও বলেছেন 'আমাদের যুগে গানে এরকম উচ্চারণই মোটামুটি হত।'

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কিন্তু তাঁদের যুগ থেকে আমাদের যুগে এসেছেন যুগোপযোগী উচ্চারণ ও গায়নভঙ্গি নিয়ে। ১৯৮৭ সালে ভয়েস অফ জার্মানির জন্য হেমন্তবাবুর সাক্ষাৎকার নিতে কোলোন থেকে কলকাতায় এসে তাঁকে যখন প্রশ্ন করলাম, তিনি আমার ধারণাতেই সায় দিলেন। বললেন... "জানো, আগে পালটালাম উচ্চারণটা।"

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে আদর্শ মেনেও '৬৬ থেকে ' ৭৩ সাল পর্যন্ত আমার উচ্চারণে নানান ত্রুটি ছিল। গোলমাল ছিল স্বরপ্রক্ষেপেও। গলাটাকে কোথায় ঠিক কতটা চালাতে হবে, কতদূর যেতে হবে, কোথায় গলাটাকে মিলিয়ে দিতে হবে, থামতেই বা হবে কীভাবে এবং কোথায়—এই হিসেবগুলো আমি তখনও যেন ঠিক করে উঠতে পারিনি। বড় শিল্পীদের গানের পাশাপাশি নিজের গান শুনলে প্রযুক্তি ও আন্দাজের হেরফেরটা খুব কড়াভাবে ধরা পড়ত আমার কানে। গানের ওজন, কথা ও সুরের হেরফের, ওজনের তারতম্য, কণ্ঠ, উচ্চারণ, স্বরপ্রক্ষেপ, কণ্ঠের ধ্বনি কমানো-বাড়ানো— এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সচেতন না হলে এবং এগুলো আয়ত্তে না এলে গানে প্রাণে আসে না। আমার গানে হয়তো সুর তাল মোটামুটি ছিল, কিন্তু প্রাণের, ভাবের, ব্যক্তিত্বের ছিল অভাব।

আরও একটা জিনিসের অভাব আমি অনুভব করতে লাগলাম ক্রমান্বয়ে। কোন সময়ে আমি কী গান গাইছি, কেন গাইছি—এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব।

গান তো গাইছিলাম খুব। রেওয়াজ তো করছিলাম জোরে জোরে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম যে, যে সব গান শিখেছি, শিখছি, গাইছি, এমনকি যে সব গানে সুর দিচ্ছি সেগুলোর সঙ্গে আমার সময়ের, আমার অস্তিত্বের, আমার পরিবেশের তেমন সম্পর্ক নেই। ১৯৬৮ সালে আমি মণি চক্রবর্তীর কাছে নিয়মিত হিমাংশু দত্তর গানও শিখতে শুরু করি। যত পারছি শিখছি, খাটছি, গাইছি, — কিন্তু এসব গান কি আমার সময়ের কথা, আমার কথা বলছে?

আধুনিক কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, সাংবাদিকতায়, গ্রুপ থিয়েটারের নাটকে, নতুন ধারার চলচ্চিত্রে আমাদের সময়, যুগমুহূর্ত, যুগচেতনা প্রতিফলিত

হচ্ছে। কত নতুন বিষয়, কত বিচিত্র কথা,ভাবনা, কত ধরনের আবেগ, ভাব,— কত কিছু ঐসব ক্ষেত্রে সামিল, শরিক হয়ে উঠল। কিন্তু বাংলা গানে?

১৯৬৬-'৬৭ সালে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রেও শুরু হয়ে গিয়েছিল জোরালো পরিবর্তন। নকশালবাড়ি আন্দোলন সি পি আই (এম এল) পার্টিগঠন, মাওবাদী চিন্তাধারার ধাক্কা আমার চেনাজানা শহরে পরিবেশটাকেই দিচ্ছিল পালটে। ছ'-এর দশকে তো সারা দুনিয়াজুড়েই চলছিল যুবশক্তির অভ্যুত্থান। কলকাতাই বা তার বাইরে থাকবে কেন? 'তোমাকে আমাকে দিচ্ছে নাড়া/ মাও সে তুঙের চিন্তাধারা'— স্লোগানটা সে-সময়ে অমূলক ছিল না। কলকাতার ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ নাড়া খাচ্ছিল বৈকি।

স্কুল জীবনে আমি রাজনীতির বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। কলেজে ঢোকার দু'এক বছরের মধ্যে আমাকে এক ধাক্কায় দাঁড় করিয়ে দিল একটা জোরালো রাজনৈতিক চেতনাস্রোতের মুখে। রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েও বুঝতে পারছিলাম, চারপাশে ছাত্রছাত্রীদের চেতনা, ভাবনা-চিন্তার স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়ে অনেক ভাঙাগড়া, রদবদল হয়ে চলেছে।

অন্যদিকে ভিয়েতনামে চলছিল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ও হো-চি-মিনের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে কলকাতার ছাত্র-সমাজের একটা বড় অংশে উঠছিল আলোড়ন।

লাতিন আমেরিকার চিরবিপ্লব, চিরবিদ্রোহ, চিরযৌবনের প্রতীক চে গেভারার মৃতদেহের ছবি—গুলিবিদ্ধ। আমার মনে আছে একটি বিলিতি পত্রিকায় নিহত চে'-র সেই অসহায়ভাবে পড়ে থাকার ছবিটা প্রথম দেখে এক লহমায় মনে হয়েছিল যীশুর কথা। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর যেসব ছবি দেখেছি, গুলিবিদ্ধ চে-গেভারার সঙ্গে তার সাদৃশ্য প্রচুর।

গুলির আওয়াজ বাড়তে লাগল কলকাতাতেও। '৬৮ থেকে '৭১/৭২ সাল মাও-এর উদ্ধৃতি, কাঁচাপাকা হাতে লেখা অজস্র দেয়াললিপি, স্লোগান, পেটো আর গুলির আওয়াজ, পুলিস ও সি আর পি'-র উৎপাত, 'মধ্যরাতে বদল হওয়া ফুটপাত', কলেজ ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া সহপাঠীদের গল্প, কলেজ ক্যাম্পাসে বিপ্লবী ছাত্র সমাবেশ, অজ্ঞাতপরিচয় যুবকদের মৃতদেহ, রোগা রোগা ট্র্যাফিক কনস্টেবল খুন হওয়ার খবর। এনকাউন্টারে নিহত তরুণদের কথা, ভয়, সন্দেহ, পাড়ায় হঠাৎ পুলিশের তল্লাশ, কালো কালো ভ্যান, ভ্রাতৃহত্যা, সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান, কবিতার লাইনে লাইনে স্ফুলিঙ্গ, জোতদার খতম, অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ, সন্ত্রাস, ধরপাকড়, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন—সব মেশানো এক অদ্ভুত জটিল ব্যাপার।

'তখন আমি ফ্রন্টিয়ারে গদ্য পড়ি সমর সেন-এর।' পত্র-পত্রিকায়, লিটল ম্যাগাজিনে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ইস্তাহারে, দেওয়ালে দেওয়ালে, নতুন নাটকে, কিছু উপন্যাসে, সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'-এ সময়ের ছবি, সমকালের কথা, ধ্বনি, ভাবনা উচ্চারণ। কিন্তু বাংলা গান?

আজন্ম চেনাজানা শেখা বাংলা গানগুলোর সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে, আমার আমিকে। কী গান গাইছি? যে ভাষায়, যে সব বিষয়ে কথা বলি, তর্ক করি, আড্ডা দিই, ভাবি, ভাবতে বাধ্য হই, কখনও হয়তো একটু-আধটু লিখি, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দুটোই দেখি, সেগুলো কি কোথাও আমার গাওয়া গানে স্থান পাচ্ছে? আমার সময়, অস্তিত্ব, কাম, ক্রোধ, লালসা, লোভ প্রেম, মায়া-মমতা, বিরক্তি, ঘেন্না, অসহায়তা, সংকল্প, লজ্জা, ব্যর্থতা, ভীরুতা, ছোটোখাটো সাহস, আমার চিন্তা, আমার পড়াশুনো, আমার সহনাগরিকরা, আমার শহর কোথায় সেইসব গানে? অথচ আমি গান গেয়ে যাচ্ছি।

গান নিয়ে আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব, আমার মগজের যন্ত্রণা, ব্যর্থতার কথাগুলো তখন বলতে পারিনি কাউকেই। ভেতরে ভেতরে গানে-আমাতে যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল তার খবর একমাত্র বাবাকেই দিয়েছিলাম, তাও ১৯৭২-৭৩ সালে। দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু '৬৭-'৬৮ সাল থেকেই।

সে সময়ে বরং একাত্ম-বোধ করতাম আমীর খানের গান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনার সঙ্গে। আমীর খানের একটি অনুষ্ঠানও বাদ দিতাম না। একমাত্র তাঁর খেয়াল শুনলে মনে হত কোথায় যেন তারই মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি সমকালটাকে, নিজেকে, জটিল চিন্তাগুলোকে।

খেয়ালে কথার গুরুত্ব কম। বন্দিশের অর্থ নিয়ে কখনও ভাবিনি তেমন। কিছু কথার কাঠামো নেহাত না-হলেই নয়, তাই কথাগুলোকে মেনে নিতাম প্রথমদিকে। খেয়াল শোনা বা গাওয়ার সময় স্বরবিস্তার, স্বরের নানান বিন্যাস, ছন্দ ও সুরের সম্পর্ক, স্বরে স্বরে সম্পর্ক খোঁজা, সরগম ও তানের প্যাটার্ন, বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাঠামোগত সম্পর্ক, নতুন অংশ বা স্তরবিন্যাসের অন্বেষণ— এগুলোর দিকেই মন দিতাম। কথাটাকে আমল দিতাম না।

কিন্তু বাংলা গানের বেলা তো সেটা হবার জো নেই। কথার সেখানে অনেক গুরুত্ব। আর, গানের কথাগুলোই আমাকে ফেলত ঝামেলায়।

যুগ যুগ ধরে বাংলা গানের সুরে ছন্দে কত ভাঙাগড়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়াও নজরুল, হিমাংশু দত্ত, সুধীরলাল, শচীনদেব বর্মন, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, রবিন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি, নচিকেতা ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, শ্যামল মিত্র... কত সুরকারের বিচিত্র ভাবনায়, নৈপুণ্যে

উথালপাথাল হয়ে গিয়েছে আধুনিক বাংলা গানের সুরের দুনিয়া। কী দুরন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না হয়েছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি বালসারা, অলোকনাথ দে, নিখিল ঘোষ—এক একজন যেন সুর রচনার এক এক জাদুকর। সুরে সুরেই তো মজে থেকেছি আজন্ম।

গীতিকারদের মধ্যে তেমনি অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরির লেখায় পেয়েছিলাম কাব্য আধুনিকতা। "পরাধীন দেশে প্রেম চির অভিশপ্ত"—মোহিনী চৌধুরির লাইনগুলো, তাঁর শব্দচয়ন, বাক্য, লিরিক উচ্চারণ আমায় আজও ভাবায়।

সলিল চৌধুরি দিলেন একের পর এক ধাক্কা। তাঁর সুরে-কথায় অর্কেস্ট্রা-চিন্তায় বাংলা গানের দুনিয়া দুলে দুলে উঠল, নতুন নিশানা পেল। কিন্তু ক্রিয়াপদের শুদ্ধ ও চলিত রূপের সহাবস্থান তাঁর গানেও ভালো লাগত না।

এক সময়ে আধুনিক কবিতাতেও এই ব্যাপারটি চলত। সমকালেও কদাচিৎ চলে হয়তো। কিন্তু কালক্রমে আধুনিক কবিতাও তো আর আগের অবস্থায় নেই। গত তিরিশ বছরে দুই বাংলার প্রথম সারির ক'জন কবির কবিতায় কতবার আমরা 'মোর', 'রবে'—একই কবিতার দেহে ইচ্ছেমতো, ছন্দ মেলানোর স্বার্থে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত প্রকরণের সহাবস্থান পেয়েছি? এহেন উদাহরণ বিরল। বাংলা গানের লিরিকে কিন্তু উদাহরণগুলো ঢের বেশি হাজির।

আধুনিক কবিতা, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার পথে '৬৭-৬৮' সাল থেকেই আমি আধুনিক কবিতার কথা এবং আধুনিক গানের কথাগুলোকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক বিচার করতে থাকি। সব কবিতা গান হয়ে উঠতে পারে না। তেমনি সব গান কবিতা হিসেবেও আলাদাভাবে গ্রাহ্য হয়ে উঠুক—এ দাবিও নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়। কিন্তু আমার খালি মনে হত, যে দেশে কবিতা নিয়ে এত ভাঙাগড়া, এত ভাবনা, এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সে-দেশে গানের লিরিক নিয়ে ভাবনার এত অভাব কেন?

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিমল ঘোষের লেখা কিছু গানে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি গানে বরং পেয়ে গিয়েছিলাম অন্যান্য মাত্রা।

ভাষার জাড্য ও বিষয় বৈচিত্র্যের অভাবে বাংলা আধুনিক গানের কথা, লিরিক আমাকে ক্রমশ হতাশ করে তুলেছিল। বড় অসহায় লাগছিল। ১৯৭০-৭১ সালে আধুনিক গান তখনও গেয়ে চলেছি, গীতিকারদের লেখায় তখনও সুর দিয়ে চলেছি বেতার-অনুষ্ঠানের জন্য—মনে মনে সমানে ভাবছিলাম: চারপাশে এই যে এত কিছু হয়ে গেল, হয়ে চলেছে, এই যে আমি, আমরা, এই যে এত মানুষ, এত জটিলতা, আধুনিক নাগরিক জীবন, আধুনিক বাংলা গানের লিরিক কি তার একটা দিককেও ধরতে চাইবে না, চেষ্টা করবে না?

এমন সময়ে একদিন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গান শুনলাম; 'এ কোন্ সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার।' আর একদিন শুনলাম বেতারে তিনি গাইছেন 'এ কেমন রাত পোহাল দিন যদি আর এল না।'

একদিন ভোরবেলা ললিত রেওয়াজ করে বাইরে বেরিয়েছি। তখন আমরা বৈদ্যবঘাটায় থাকি। বড় রাস্তার ওপারে খাল। দেখি—সেই খাল দিয়ে এক যুবকের মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। জামাকাপড় পরা। পিঠে কী-একটা বেঁধা। সারা পিঠে রক্ত নিয়ে উপুড় হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। এ লখিন্দরের সঙ্গে নেই কোনও বেহুলা।

সাল ১৯৭০। নাকি '৭১। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ক্যাজুয়াল কনট্রাক্টে প্রোডাকশান অ্যাসিসটেন্টের কাজ করছি। আমি ছিলাম ইংরেজি ভাষণ বিভাগে। একদিন টেপ এডিট করছি বিকেলের দিকে, এমন সময় সেই ঘরে পঙ্কজ সাহা এলেন। তিনিও তখন বোধহয় প্রোডাকশান অ্যাসিসটেন্ট—যুববাণী বিভাগে। চাপা গলায় পঙ্কজদা বললেন—"সুমন, শুনে রাখ— তিমির মারা গেছে। আজ সন্ধেবেলা ওর মৃতদেহ পৌঁছে দেবে ওরা ওর বাড়িতে। যাদবপুরের দিকে সাবধানে যাস।"

জানি না পঙ্কজ সাহার সেই বিকেলের কথাগুলো, ঘটনাটা আজও মনে আছে কিনা। পঙ্কজদা, তিমির আর আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। তিমির বরণ সিংহ, আমার সহপাঠী (ও ছিল বাংলা বিভাগে) নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। গ্রামে চলে গিয়েছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। নৃশংসভাবে খুন হয় তিমির জেলখানায়। আমি তো চিরকাল গা-বাঁচানোর দলে। তিমির আমার চেয়ে ঢের বড়মাপের মানুষ ছিল। "দিন বদল করতে গিয়ে শহীদ হল শেষে।"

সাল ১৯৭১। আমি পরীক্ষা দিয়ে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় কেরানির চাকরি পেলাম। তিনশো সাতষট্টি টাকা মাইনে। ল্যান্সডাউন রোড শাখায় যাচ্ছি কাজ করতে। যাদবপুরে এইট-বি বাস টার্মিনাসে ঢুকেছি— কোত্থেকে একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। আমার পেটে পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে হিস্‌হিস্ করে উঠল; "কিরে কোথায় যাচ্ছিস।"—সাদা পোশাকে পুলিস। আমি তখন ধুতি পরতাম। ধুতি প্রায় খুলে যাবার জোগাড়। টিফিন বাক্সটা হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। রুটি তরকারি ছিটকে পড়ল। মহা আনন্দে উড়ে এল কয়েকটা কাক। লোকটা কয়েকটা গুঁতো মারল আমার পেটে। আমি অফিস যাচ্ছি, কোথায় অফিস ইত্যাদি জেনে নিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল; "যাঃ ভাগ্। " বোধহয় কাউকে খুঁজছিল লোকটা।

"এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার।"— গানটি শুনে মনে হয়েছিল জটিলেশ্বরবাবু অন্তত আমাদের সময়টাকে ধরতে চেষ্টা করলেন আধুনিক গানে। এ-লিরিকের ভাটিয়ার রাগের প্রয়োগও বড় অমোঘ যেন।

সুগায়ক , সুন্দর মানুষ দীনেন চৌধুরি একবার জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন আমাদের বৈষ্ণবঘাটার বাসায়। বাবা তখন জটিলেশ্বরের গানে মজে আছেন। আমি তো বটেই। জটিলেশ্বরবাবুকে দেখেই বাবা বলে উঠলেন—"আপনি তো খুনে মশাই। গান গেয়ে খুন করে দিলেন যে আমাকে।"

পরে, বাইরে বেরিয়ে জটিলেশ্বরবাবু ভাবাবেগে ভরপুর হয়ে আমাকে বললেন "এমন স্বীকৃতি আমি কখনও পাইনি।" সেই সন্ধেবেলা বাংলা গান নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম আমরা উত্তেজিত হয়ে। জটিলেশ্বরবাবু তাঁর কিছু নতুন গানও শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল 'আমি ফুলকে যেদিন কেঁদেসেধে আমার সাজি ভরেছি/ আমি সেদিন থেকে জেতা বাজি হেরেছি।'

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানগুলি শুনে মনে হচ্ছিল এই তো, আমরা যে ভাষায়, যেভাবে কথা বলি, তিনি সেই ভাষায় সেভাবেই গান লিখছেন। অনেক দিন পর মনে হচ্ছিল 'স্বাভাবিক' গান শুনছি। সেই সঙ্গে খুঁজে পাচ্ছি তাঁর গানে মেধার পরিচয়, বুদ্ধিবৃত্তি, শব্দের অন্য অনুষঙ্গ। — 'তোমায় কে বা মন্দ বলে, ছি ছি অমন কথা মুখে আনতে নেই।'—'আমি শুনি ঝড়ের পূর্বাভাস।'—'তুমি আখর না চেনালে আজও কিছুই লেখা হত না।'—নতুন মুদ্রার মতো ঝকঝক করছিল, টুংটাং করছিল। বেচারা বাংলা আধুনিক গানের অধিকাংশ লিরিকে যে বড্ড বেশি "ঘষা পয়সা"-র বোবা।

সেই ঘষা পয়সাই রগড়ে যাচ্ছিলাম আমি, আর ভেতরে ভেতরে চলছিল ভাঙন, প্রত্যাখ্যান, দ্বন্দ্ব। কাউকেই সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না।

১৯৭২ সালে তখনকার হিন্দুস্থান কোম্পানির ডাকে প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ড করতে গেলাম কলকাতার অক্রুর দত্ত লেনে। রবীন্দ্রনাথের দুটি গান- 'হেলাফেলা সারাবেলা' আর 'ফিরবে না তা জানি।' প্রথম গানটি আমিই পছন্দ করেছিলাম। প্রতি বছর এত শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এত গান রেকর্ড করে যাচ্ছিলেন যে, নতুন রেকর্ডের জন্য গান বেছে নেওয়া হয়ে পড়েছিল খুব কঠিন কাজ। যতদূর জানি, 'হেলাফেলা সারাবেলা' গানটি আমার আগে আর কেউ রেকর্ড করেননি।

'ফিরবে না তা জানি' গানটি বেছে দেন বাবা। রেকর্ডিং-এর আগে বাবা আমাকে সুবিনয় রায়ের কাছে নিয়ে গেলেন গান দুটি ভালো করে দেখে নেওয়ার জন্য। সুবিনয় রায়ের গান আমার ভালো লাগত। তাঁর গানে একটি ঝরঝরে, সচল সাবলীল ব্যাপার পেতাম। তাছাড়া তিনি তো কত অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ ও নিপুণ শিল্পী, শিক্ষক। তিনি যে সময় করে আমাকে দুটি গানের আঙ্গিক দেখিয়ে দিলেন, এ আমার এক বিরাট পাওয়া। শুধু একটি ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি। তাঁর মতো এক শিল্পী ও শিক্ষককে অকারণে ছোট করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

আমার মতো এক অর্বাচীনের জন্য তিনি যে সময় দিয়েছিলেন, এটাই তো অনেক। তবু, দুটি গান দেখিয়ে দেবার পর বাবার সঙ্গে নানান কথা বলতে বলতে তিনি যখন বললেন যে, তাঁর কাছে না শিখলে রবীন্দ্রসংগীত ঠিকমতো গাওয়া হবে না, আমি তখন খুব দমে গিয়েছিলাম। আমি তো তাঁর কাছে গান শিখিনি (দুটি গান রেকর্ডিং-এর আগে দেখে নিয়েছিলাম মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে) তাহলে কি আমি কখনও ঠিকমতো রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারব না? তাঁর কাছে শেখার সুযোগ পান না এমন অন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীদেরই বা কী হবে? তবে তিনি পণ্ডিত মানুষ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁর। নিশ্চয়ই বুঝেই বলেছিলেন কথাটা।

রেকর্ডিং-এ আমার সঙ্গে বাঁশিতে ছিলেন চানুবাবু, গিটারে সমীর খাসনবিশ। আমি লজ্জিত যে, বেহালা ও তবলা যাঁরা বাজিয়েছিলেন তাঁদের নাম আমার মনে নেই। তাঁদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। নীরদবাবু রেকর্ড করছিলেন।

বাবা ছিলেন রেকর্ডিং-এর সময়। স্মৃতিচারণ করছিলেন বাবা। বলছিলেন, অক্রুর দত্ত লেনের এই স্টুডিয়ো-য় কত বড় বড় শিল্পী গান গেয়ে গেছেন।

সত্যি বলতে, আমার বেশ ভয় করছিল। দুটি গান রেকর্ড করতে প্রায় সারাদিন লেগে গেল।

চানুবাবু ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র যন্ত্রশিল্পী। বাবা বলছিলেন চানুবাবু নাকি শচীন দেববর্মনের গানের রেকর্ডিং-এও বাঁশি বাজিয়েছিলেন। সেই শিল্পী এবারে কিনা আমার মতো আনাড়ির সঙ্গে বাজাচ্ছেন! ভয় করবে না তো কী!

কত সহযোগিতাই না করেছিলেন সেদিন যন্ত্রশিল্পীরা আমার সঙ্গে। জীবনে ভুলব না। সমীর খাসনবিশের সঙ্গে আজও দেখা হয় মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানে। কত বড় শিল্পী, কত ভালো মানুষ।

মিথ্যে বলব না, আমার প্রথম রেকর্ডখানা প্রথম যেদিন শুনলাম, বেশ আনন্দ হচ্ছিল। আমার তখন বাইশ বছর বয়স। আমার অবশ্য মনে হয়েছিল যে গাওয়ার ত্রুটি রয়ে গিয়েছে।

বরং তার পরের বছর, ১৯৭৩ সালে, হিন্দুস্থানেই আমি রবীন্দ্রনাথের যে দুটি গান রেকর্ড করি, সে দুটি গাওয়া হয়েছিল ভালো। 'নাচ্ শ্যামা তালে তালে' আর 'হার মানালে গো, ভাঙিলে অভিমান' এই দুটি গান রেকর্ড করেছিলাম।

রেকর্ড দুটি কেমন বিক্রি হয়েছিল কে জানে। কোম্পানি কোনওদিনই কিছু জানায়নি। একটি পয়সাও পাইনি হিন্দুস্থান থেকে।

বোধহয় ১৯৭৩ সালেই কখনও একবার হিন্দুস্থান থেকে নীরদবাবু আমায় ডেকে পাঠালেন একটা অডিশনের জন্য। বললেন, রামকুমারবাবুর পরিচালনায় একটা রেকর্ডিং হবে, তাতে বিভিন্ন শিল্পীকে দরকার। সেই অডিশনেই আমি প্রথম

সামনে থেকে হৈমন্তী শুক্লার গান শুনি। অসাধারণ লেগেছিল। আজও আমি তাঁর ভক্ত। অডিশনের পর আমাকে আর কেউ কিছু জানালেন না। বুঝে নিলাম আমাকে প্রয়োজন নেই।

১৯৭২ কি '৭৩ সালেই প্রথম অনিল বাগচির সংগীত পরিচালনায় গাওয়ার সুযোগ পাই আকাশবাণীর একটি বিশেষ প্রযোজনায়। সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ গীতি আলেখ্য হচ্ছিল। ডাক পেয়ে গেলাম। সেখানে অনুপ ঘোষালকে দেখলাম। তিনিও এসেছেন গাইতে। একক, দ্বৈত কণ্ঠ, সমবেত কণ্ঠ মিলিয়ে বেশ কয়েকটা গান ছিল। অনিল বাগচি গানগুলো তুলিয়ে দিলেন। কোনও একটি গান যেন আমার শুরু করার কথা ছিল। আমার ভালো হচ্ছিল না। অনুপ ঐ জায়গাটা আমার চেয়ে ঢের ভালো গাইলেন। তিনিই রেকর্ড করলেন ঐ অংশটা।

ছোট ছোট কাজ গলায় ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে প্রায়ই বেশ বিপাকে পড়তাম আমি সে সময়ে। কখনও হয়তো এসে গেল, কখনও আবার কিছুতেই এল না। দিনরাত অত রেওয়াজ করতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলার কসরৎ করতাম। পুরোদস্তুর বড় খেয়াল গাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিলাম ততদিনে। কিন্তু—কী আপদ। আধুনিক বাংলা গান গাইতে গিয়ে অনেক সময়ে দেখতাম ছোট্ট একটা 'মুড়কি', সামান্য একটা মোচড় আমায় পেড়ে ফেলছে। রাগ হত নিজের ওপর, গলার ওপর।

আসলে, বয়ঃসন্ধির সময়ে গলা ভেঙে যাবার কালক্রমে আমার কণ্ঠ ভারী হয়ে গিয়েছিল। পুরুষের ভারী গলার আবেদন হালকা বা সরু গলার চেয়ে হয়তো বেশি, কিন্তু মোটা গলায় সূক্ষ্ম কাজ ফুটিয়ে তোলা, ভারী গলা চালানো যে কত আয়াসসাপেক্ষ তা এ-ধরনের কণ্ঠের অধিকারীরা হাড়ে হাড়ে টের পান।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য, তালাত মাহমুদ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে'-র মতো কণ্ঠশিল্পীরা কীভাবে কণ্ঠ প্রয়োগ করছেন, দুরূহ স্বরসমষ্টির মোকাবিলা করছেন, জটিল সমস্যাগুলোকে কীভাবে সামলাচ্ছেন, তার হিসেব কষতাম মনে মনে। চেষ্টা করতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, আর অদৃশ্য দেয়ালে মাথা ঠুকতাম। নিজের ব্যর্থতার নিরিখে আমি আকৈশোর মেপে নিয়েছি বড় বড় কণ্ঠশিল্পীর বিপুল ক্ষমতা।

অবিরত চেষ্টা আর ভুলের মধ্যে দিয়ে সামান্য কিছু ক্ষমতা অর্জন করে নিতে নিতে আমার বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, কেটে যাচ্ছে। স্বকণ্ঠের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বুঝে নিয়ে স্বরপ্রক্ষেপের কৌশল রপ্ত করতে আমার পঁচিশটা বছর লেগে গেল। জীবনের চল্লিশটা বছর কাটিয়ে যখন গান বাঁধা—গাওয়াটাকে

পেশা করলাম, তখনও আমি কত জায়গায় অক্ষম। কোনওদিন কি আমি আমার দুর্বলতা, অক্ষমতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারব?

প্রথম যৌবনের দিনগুলোয় যখন এখনকার মতোই দেঁড়েকষে রেওয়াজ করছিলাম, নানান ধরনের বাংলা গান (তখন তো আর নিজে গান বাঁধতাম না) নিয়মিত গাইছিলাম, তখন কিন্তু আমায় সচরাচর কেউ অনুষ্ঠানে ডাকছিল না।

প্রথম রেকর্ডটি বেরোনোর পর দু'একটি ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাচ্ছিলাম। সবই নিখরচার আমন্ত্রণ। গান গাওয়ার জন্য আমায় কেউ টাকা দেবে, এ আমি ভাবতেও পারতাম না।

একবার '৭২ কি '৭৩ সালে যাদবপুর পলিটেকনিকের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে গাইতে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি সাগর সেন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রয়েছেন। হেমন্তবাবুর তখন একটা পা ভাঙা। প্লাস্টার করা পা-টি একটা চেয়ারে তুলে, বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। একজন এসে জানালেন যে প্রথমে সাগর সেন গাইবেন, তারপর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তারপর আমি। আমার তো হার্ট অ্যাটাক হবার যোগাড়। হেমন্তবাবুর পর আমি গাইব। শ্রোতারা যে আমার হাড়গোড় আর আস্ত রাখবেন না। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। কিন্তু হেমন্তবাবু বললেন যে, ওখান থেকে তাঁকে আর একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে তাই তিনি আগেই গাইবেন। আমি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে যাওয়ায় হেমন্তবাবু আমায় বললেন—'আরে আসরটা দেখছ না! এখানে আমার গানই কেউ শুনবে না তো তোমার গান। ভয় পেও না। চোখকান বুজে গেয়ে দিও।'

হেমন্তবাবু গাইতে উঠলেন। কত কষ্ট করে ভাঙা পা নিয়ে চেয়ারে বসে বসে তিনি গাইলেন। অসাধারণ গাইলেন তিনি। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন, গালগল্প, হট্টগোল চলতেই লাগল। অনেকে বোধহয় দেখতে বা শুনতেই চাইছিল না কে গাইছেন। ঠিকই বলেছিলেন আমাকে হেমন্তবাবু। তাঁর গানই কেউ শুনল না, আমি তো কোন ছার। স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া মঞ্চে আমি উঠলাম, খান দু-তিন গান গাইলাম। পালিয়ে বাঁচলাম। আমার মনে আছে, সামনের সারিতে অনেকে পেছন ফিরে গল্প করছিল। সারা প্যান্ডেল জুড়ে চলছিল অবিরাম হট্টগোল।

আজও কোনও কোনও অনুষ্ঠানে গাইতে গিয়ে দেখতে পাই সামনের সারিতে কেউ কেউ দিব্যি কথা বলেছেন, এটা ওটা খাচ্ছেন, দু'একটি বাচ্চা ছোটাছুটি করছে, কেউ তাদের বসাচ্ছে না, বা তাদের বাবা-মা তাদের নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন না।

বাইরে যাবার সুযোগ একটা পেয়ে গেলাম ১৯৭৩ সালে। ফ্রান্সে গেলাম

কয়েক মাসের জন্য গানেরই কাজে। হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। গানের সঙ্গে নিজেকে বা আমার সময়টাকে কিছুতেই আর মেলাতে পারছি না, অথচ গেয়ে যাচ্ছি। কী করব! গান ছাড়া আর তো বিশেষ কিছু শিখিনি জীবনে। '৬৭ থেকে '৭৩ সাল প্রতিদিন প্রচণ্ড রেওয়াজ করে গিয়েছি। অনেক সময়, অনেক শক্তি, অনেক শ্রম দিয়েছি রেওয়াজে, সংগীতশিক্ষায়, গাওয়ায়। অথচ বুঝতে পারছি, যে গান গাইছি সে-গান আমার নয়। অক্ষম আক্রোশ, যন্ত্রণা, হতাশা বয়ে বেড়াচ্ছি মাথার ভেতরে। কাউকেই বলতে পারছি না কিছু।

এ রকমই এক মুহূর্তে ফ্রান্সে গিয়ে আমার এক ফরাসি বন্ধুর বাড়িতে শুনলাম রেকর্ডে বব্ ডিলানের গান: 'A Hard Rain's agonna Fall.' কীরকম যেন খোনা-খোনা গলায় একটা গিটার নিয়ে বব্ ডিলান গাইছেন তাঁর স্বরচিত গান। সে গানের কথা, সুর, আঙ্গিক একেবারে আমার মগজের ভেতরে গিয়ে নাড়িভুঁড়ির ভেতরে গিয়ে কীসব ঘটাতে লাগল। পাগলের মতো শুনতে লাগলাম ডিলানের গানগুলো। শুনলাম ফিল্ অক্সের রচনা। শুনতে লাগলাম পর্তুগিজ গান 'ফাদোস্'। ফ্রান্সে গিয়ে পড়েছি, সেখানকার গান 'শাঁসোঁ' তো শুনবই।

এইসব গান শুনে প্রথমেই যা খেয়াল করলাম— আরে, এরা তো এদের গানে এদের নিত্য জীবনের কথা, আটপৌরে অভিজ্ঞতার কথা, হালকা থেকে শুরু করে ভারী ওজনের ভাবনার কথা, যে কোনও কথা বলে চলেছে। এদের গান তো এদের সময় ও জীবনের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। এদের গানগুলো তো নেহাত কিছু আপ্তবাক্য আর 'গেনো-কথা', সাজানো-গোছানো বাহারি কথায় ঠাসা নেই। পাশ্চাত্যের মানুষ তো বটেই, এমনকি আমিও যে নিজের ভাবনাচিন্তাকে খুঁজে পাচ্ছি এইসব গানে। এই তো, আমাদের বাংলা গান কেন এমন হতে পারবে না। কেন লেখা যাবে না, গাওয়া যাবে না এমন গান, যে গান আমার কথা, আমার সময়ের কথা, মানুষের কথা, পোকামাকড়-কুকুর-বেড়াল-গান-পাখির কথা, রাস্তার কথা, সবকিছুর কথা বলবে।

সুকান্তর 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় আছে 'নিষ্কণ্টক বর্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগিদ।' ফ্রান্সে আমার জীবন নিশ্কণ্টক ছিল না, কিন্তু সেখানেই আমি পেয়ে গেলাম আমার ঘরে ফেরার তাগিদ। আমার ঘর মানে তো গান। মনে হল— সেই ঘরটাকে বানাতে হবে। গড়ে নিতে হবে। গান যদি গাইতেই হয় তো সে গান নিজেকেই বাঁধতে হবে। ফ্রান্সে আমি যত পেরেছি শুনেছি। কিছু বাদ রাখিনি। পথে পথে অ্যাকোর্ডিয়ন বাজিয়ে গাওয়া আটপৌরে গান যেমন শুনেছি, তেমনি প্যারিসের নত্র্-দাম গির্জায় নিয়মিত গিয়ে শুনেছি সেখানকার বিশাল, জলদগম্ভীর পাইপ-অর্গানে বাজানো মার্গসংগীতের সুর।

সংগীত শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অল্পবিস্তর। একবার একটা ছোট দোকানে বসে খাচ্ছি, পাশের টেবিলে খাচ্ছেন কয়েকজন তরুণ ফরাসি। তাঁরা সংগীত শিল্পী। আলাপ হয়ে গেল। একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন— পান্নালাল ঘোষকে আমি চিনি কিনা। জানলাম সেই তরুণ নিজেও বাঁশি বাজান।

প্যারিসেই প্রথম সিনথেসাইজার দেখেছিলাম আমি '৭৩-এ। বাজানোর সুযোগও হয়েছিল। তখনও সিনথেসাইজার ছিল 'মোনোফোনিক'। 'পলিফোনিক সিনথেসাইজার' উদ্ভাবিত হয় আরও পরে।

সে যাই হোক, সদ্য শোনা গানগুলো, সেইসব গানের ধাক্কায় আমার মগজে গজিয়ে ওঠা চিন্তাগুলো ছিল আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি। বাংলা গান নিয়ে আমার ভেতরে যে বিপুল দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, হতাশা জমে উঠেছিল, তারই ফাঁক দিয়ে জেগে উঠল ছোট্ট একটুকরো বোধের অঙ্কুর। নিজের গান নিজেকেই লিখতে হবে, সুর করতে হবে। আমার জীবন, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ, ভাবনাচিন্তা হবে তার ভিত্তি।

কলকাতায় ফিরে, আনুষ্ঠানিক গানবাজনার সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক হয়েছিল, সেটুকুও দিলাম কেটে। আকাশবাণীকে জানিয়ে দিলাম অত ঘন ঘন আর গাইব না বেতারে। বছরে বড়জোর দু'বার।

মাস্টারমশাইয়ের কাছে আরও কিছুকাল তালিম নিয়ে গেলাম খেয়ালে। ১৯৭৪ সালে তাঁকে অকপটে জানালাম, খেয়াল গাইতেও আমার কষ্ট হচ্ছে। খেয়ালের কথাগুলো বাংলায় হলেও বা একরকম হত। কী যে হিজিবিজি বলছি। কিছুতেই আর মেলাতে পারছি না নিজেকে প্রচলিত গানের সঙ্গে। মাস্টারমশাই, যাঁর কাছে বারো বছর খেয়াল শিখেছি, বুঝলেন তাঁর মতো করে।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় এক মোটর দুর্ঘটনায় আমীর খান মারা গেলেন।

১৯৬৬ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমীর খান কলকাতায় যতগুলো অনুষ্ঠান করেছিলেন তার কয়েকটি বাদে সবগুলোই আমার শোনা। অতগুলো বছর তো তাঁর গানেই ডুবে ছিলাম, তাঁর আঙ্গিকই আমায় ভাবতে শেখাচ্ছিল। তাঁর সংগীত ভাবনাই ছিল আমার সংগীত সন্ধানী মগজের প্রধান অবলম্বন। চেনা-জানা-শেখা বাংলা গানগুলোর সঙ্গে আমার দূরত্ব যখন বাড়ছিল, দ্বন্দ্ব যখন হয়ে উঠছিল ক্রমশ তীব্র, আমীর খানের গানেই তখন খুঁজেছিলাম আশ্রয়। তারই মধ্যে তো ধীরে ধীরে খেয়াল আঙ্গিকটার সঙ্গেও দেখা দিচ্ছিল বিরোধাভাস।

আমীর খানের আকস্মিক মৃত্যু ডেকে আনল আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি ,অদ্ভুত শূন্যতা, অবলম্বনহীনতা। অন্য দিকে, আমার জীবন ও চেতনার ঘটনাধারায় সেই

মৃত্যু পেয়ে গেল যেন একটা বিশেষ প্রতীকী মাত্রা। একটা বড় অধ্যায়ের ওপর নেমে এল যবনিকা। সংগীতের অনেক বাঁধন তো ফুটিফাটা হয়ে এসেছিল। এবারে পড়ল অমোঘ চূড়ান্ত কোপ।

১৯৭৪ সালটা মোটামুটি কেটে গেল একঘেয়ে চাকরি আর মানসিক বাউন্ডুলেপনা করে। রেওয়াজ তখন আর করছি না আগের মতো। বই পড়ার সময় তাই বেড়ে গেল অনেকটা।

নিজের গান নিজেকেই লিখতে হবে—এই বোধ তাড়া করে বেড়াচ্ছিল আমাকে ভেতরে ভেতরে। একটি লাইনও লিখতে পারছিলাম না। মাথার মধ্যে অনেক স্বকীয় সুর ঘুরে বেড়াত। সেগুলোকে বেঁধে রাখার মতো কথা লিখতে গিয়ে প্রচুর কাগজ আর সময় নষ্ট করলাম। কিছুই দাঁড়াল না।

কবিতা লেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার স্বভাব হল, মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সহজে আমি রণে ভঙ্গ দিই না, লেগে থাকি। কবিতা তো হচ্ছিল ঘোড়ার ডিম, কিন্তু আমি লিখেই গেলাম প্রায় প্রতিদিন। সাহিত্য, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে ছোট বড় প্রবন্ধও লিখতে থাকলাম। এ সব লেখা অবশ্য কোনওদিন কাউকে দেখাইনি। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। দু'একজন প্রাণের বন্ধুকে কখনও কখনও বরং আমার লেখা কবিতা শোনাতাম। তাঁরা বোধহয় আমার কষ্ট হবে ভেবে তেমন কোনও মন্তব্য করতেন না। আমি অবশ্য নিজেও বুঝতে পারছিলাম যে আমার কবিতা মোটেও দাঁড়াচ্ছে না। তবু লিখে যাচ্ছিলাম, কারণ সুর আর কথা তো দীর্ঘকাল ধরে আমার প্রধান অবলম্বন।

অনেকগুলো বছর প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা নাগাড়ে রেওয়াজ করার পর সেই অভ্যেসটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় আমার নানান অসুবিধে হচ্ছিল। মানসিক ও শারীরিক অস্বস্তি হত খুব। প্রচুর পড়াশুনো করে আর নিয়মিত লিখে আমি নিজেকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছিলাম। কথা, ভাষা যে আমার জীবনে কত জরুরি তা আমি ঐ সময়ে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

গানবাজনা যে একদম করছিলাম না এমন নয়। বাবা মাঝে মাঝে গান শুনতে চাইতেন। দোতলার বারান্দায় সন্ধের আলো-আঁধারিতে কখনও কখনও তাঁকে খালি গলায় কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে শোনাতাম। গান সম্পর্কে আমার নানান অমীমাংসিত প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের কথা বাবা জানতেন। তিনি আমাকে কোনও যন্ত্র শিখে বাজানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। 'গানবাজনা ছেড়ে তুই বাঁচবি কী করে?'

আমার সঙ্কটের কথা জানতে পেরে মা আমায় একদিন সরাসরি বলেছিলেন—'দ্যাখ, গান তোর 'ট্রেড', এটা তুই ছাড়িস না।' কথাটা যে কত সত্যি, তখন তা বুঝিনি।

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মে, শ্রেণিগত আনুকূল্যের জোরে আর সবার মতো আমিও স্কুল কলেজে পড়েছি। ঐ পর্যন্ত। পরীক্ষা দিয়ে আমার শ্রেণির আরও অনেকের মতো ব্যাংকে একটা চাকরি পেয়েছি। সে-জন্যে তো বনিয়াদি শিক্ষা ছাড়া আর কিছু তেমন দরকার হয় না। লোকে যেমন হাতের কাজ শেখে, আমি তেমনি গলার কাজ, গান শিখেছি। কুশলী হাতের কাজের যেমন একটা বাজার আছে, গানেরও তেমনি। সেইভাবে দেখতে গেলে, দীর্ঘকালের কঠোর প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রমের জোরে রপ্ত করা গানই তো আমার 'ট্রেড' হবার কথা। তবে হ্যাঁ, ছুতোর কামার-কুমোরদের মতো গাইয়েরও 'বাজার' হয়ে ওঠার একটা প্রক্রিয়া আছে।

১৯৭৩, '৭৪ সালে অতি ছোট পরিসরে হলেও নবীন গায়ক, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের উঠতি গায়ক হিসেবে আমার অল্প একটু নাম হয়েছিল। বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধের আসরে বাজানো হচ্ছিল আমার রেকর্ড। মনে রাখা দরকার বড় বড় শিল্পীর নামডাক তখন তুঙ্গে। নতুন শিল্পীদের চিরকালই খুব লড়তে হয় নামের জন্য। কিন্তু সে-সময় আবার বড় মাপের গুণী শিল্পীরা চারপাশে হাজির। কোথায় দেবব্রত বিশ্বাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর সেন, কোথায় আমার মতো চুনোপুটি! '৭২,'৭৩ সালে কয়েকবার এমন আসরে গাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, যেখানে সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। ঐ মাপের শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতেই তো লজ্জা করে। তবু, অনেক অক্ষমতা, অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা নিয়েও আমি তখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছিলাম। লেগে থাকলে গানের একটা 'ট্রেড' আমি ছোট আকারে হলেও গড়ে তুলতে পারতাম নিশ্চয়। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে, সংগীতে-আমাতে, সংগীতে-সমাজে নানান মৌলিক প্রশ্নের ঝাপটায় আমি তখন দিশেহারা।

ফ্রান্সে গিয়ে নানান নতুন গান শুনে আমার মধ্যে লিরিক ও কথা-সুরের কাঠামো সম্পর্কে যে বোধ জেগে উঠেছিল তার ধাক্কায় কিন্তু একটা গোটা গান তো দূরের কথা, একটা লাইনও বেরিয়ে এল না আমার মাথা থেকে।

গোপনে গোপনে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম রোজ। প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা লড়ে যাচ্ছিলাম—একটি গানের একটি লাইনও যদি বেরোয়। পাতার পর পাতা নষ্ট। কাটাকুটি। আঁকিবুকি। তারপর ব্যর্থ, নিস্ফল পৃষ্ঠাগুলোকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

সে-সময়ে, ১৯৭৪ সালের কোনও এক দিন, বাবার রেকর্ড সংগ্রহটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করে ফেললাম এলভিস প্রিস্‌লির একটি গান। এলভিসের গান ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি বেতারে। কে না জানে যে তিনি ছিলেন 'রক-

এন্-রোল'-এর রাজা। সেসব গানের পরতে-পরতে ছিল নাচের ছন্দ। বিষয় ছিল প্রধানত প্রেম। বাবার সংগ্রহ থেকে যে গানটি বের করলাম, তার বিষয় ও আঙ্গিক কিন্তু অন্য ধরনের। 'গেটো' নামে সেই গানের বিষয় ছিল: শিকাগোর এক বস্তিতে আর একটি শিশু জন্মাল এক দরিদ্র মায়ের কোলে। শিশুটি জন্মাল তার মায়ের কান্নার মধ্যে। মা কাঁদছেন, কারণ ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে হবে এমন আর-একটি মুখ তো তাঁর দরকার নেই। রাস্তায় রাস্তায় বড় হতে লাগল ছোট্ট ছেলেটা খালি পেটে। একদিন সে বড় হল, হয়ে উঠল এক রাগি ছোকরা। একটা বন্দুক চুরি করে সে মিটিয়ে দিতে গেল তার আজন্ম ক্রোধের ঋণ। সংঘর্ষেই মারা গেল ছেলেটি। পুরো গানটির লিরিক আমার মনে নেই। মনে আছে শুধু কয়েকটি স্তবক।

As the snow flies
In a cold and grey Chicago morn
Another little baby child is born'
in the ghetto,
And his mama cries
'Cause it's one more thing that
She don't need
is another hungry mouth to feed
in the ghetto...
A hungry little boy with a runny nose
He plays in the street as the cold wind blows
in the ghetto....

সে এক প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। এলভিস প্রিস্‌লির গানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত এবং এই গানটিও যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে 'গেটো'র গায়ক যেন অন্য এক এলভিস।

হ্যারবের্ট মারকুসে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন যে সার্থক শিল্পকর্মে বিষয়বস্তু আঙ্গিক হয়ে ওঠে। এলভিসও গানের কথা ও সুরের বিষয়বস্তুকে যে আঙ্গিকে গেয়েছেন তা মারকুসের অভিমতের সত্যতা প্রমাণ করে।

প্রযোজনার দিক দিয়েও গানটি আমার ওপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল, আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল। ফ্রান্সে গিয়ে বব্ ডিলান ও তাঁর সমগোত্রীয় গানের কারিগরদের যে-সব গান শুনেছিলাম, সেগুলোয় সংগীত প্রযোজনার কোনও আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। এলভিসের এই গানে অর্কেস্ট্রা ও কোরাসের ভূমিকা খুব বড়। এখানে যেমন মেয়েদের কোরাস ব্যবহার করা হয়েছে। গানের একেবারে শেষে এই

কোরাস যেন আর্তনাদ করছে, হাহাকার করছে,—সুর আর সমবেত কণ্ঠে স্বরপ্রক্ষেপের ভঙ্গিটা যেন আকাশছোঁয়া কান্না।

এলভিস প্রিস্‌লির গাওয়া এই গান আর কোরাসের সেই বিপুল কান্না আমাকে অনেকদিন তাড়া করে বেরিয়েছে। থেকে থেকেই আমার মাথার মধ্যে জেগে উঠত সেই কান্নার সুর।

আমার, আমাদের সকলের চারপাশেও তো কত কান্না, কান্না। কান্না অঢেল।

প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম কান্নাটাকে কথায় সুরে ধরতে। নিজের কথায় সুরে। মাসের পর মাস কেটে গেল লাইনের পর লাইন লিখে আর কেটে।

অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে আমি আমার জীবনের প্রথম গানটির প্রথম ছয় লাইন লিখি। তার বেশি এগোতে পারিনি। ঐ ক'টি লাইনের সুরও দিয়েছিলাম—

এ কেমন আকাশ দেখালে তুমি
এ কেমন আকাশ জন্মভূমি।
এ যে শুধু কান্না, শুধু কান্না
এ কান্না চাই না আমি চাই না।
এ কেমন কান্না শেখালে তুমি
এ কেমন কান্না জন্মভূমি।

কথাগুলো লেখার সময়ে, সুর করার সময়ে স্বপ্নেও ভাবিনি যে তার কয়েক মাস পরেই আমাকে আমার 'জন্মভূমি' ছেড়ে চলে যেতে হবে। মানুষকে যে এক জীবনেই কতবার কত ভূমিতে জন্ম নিতে হতে পারে, কত সংজ্ঞা যে পালটে যায়, কত ভিন দেশের 'ভিন' যে উবে গিয়ে 'দেশ' হয়ে যেতে পারে, জন্মভূমি যে আসলে সারা পৃথিবীটাই—এটাও ভাবতে পারিনি তখন সেই মুহূর্তে।

১৯৭৫ সালের বারোই মে আমি পশ্চিম জার্মানি চলে যাই। নেহাতই ব্যক্তিগত একটা সংকট থেকে এমনই এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হল, এমনকি আমার কিছু 'হিতাকাঙ্ক্ষী' তখন এমনভাবে এক ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দল এবং কিছু প্রভাবশালী মানুষের শরণ নিলেন যে আমাকে হতে হল পগারপার। ঐ হিতাকাঙ্ক্ষীদের উদ্যোগ সম্পর্কে আমি বাড়িতে বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও জানাইনি, পাছে তাঁরা সন্ত্রস্ত বোধ করেন।

জার্মাননিবাসী আমার এক মাসতুতো দাদা আমার বিপদসংকেতে সাড়া দিয়ে আমাকে কোনওরকমে একটা কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তারই জোরে দেশ ছাড়তে পারলাম আমি। এর কিছুকাল পরে ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

জার্মানিতে যখন গেলাম জার্মান ভাষাটা তখন একেবারেই জানতাম না। কাজেই ওখানে পৌঁছে প্রথম কাজ হল ভাষাটা শেখা। বছরের পর বছর প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা রেওয়াজ করার অভ্যেসটা আমার কাজে লেগে গেল। ঠিক ওইরকম ধৈর্য ও অধ্যবসায় দিয়ে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস লেগে থেকে থেকে জার্মান ভাষাটা আমি শিখে ফেলতে পেরেছিলাম। আমার একরোখা, একবগ্গা স্বভাবের জন্য জীবনে বহু ক্ষতি হয়েছে, তেমনি লাভও হয়েছে কিছু কিছু।

টাকা রোজগারের জন্য আমি মাস ছয়েক থেকে থেকেই কলেজ ফাঁকি দিয়ে দিনমজুরের কাজ করলাম। বিদেশি ছাত্ররা সেমেস্টারের ছুটিতে ছাড়া কাজ করার অনুমতি পেত না। আমার মতো অনেকেই তাই লুকিয়ে কাজ করত। কাজটা বেআইনি বলে ঠিকাদাররা আমাদের মতো অদক্ষ শ্রমিকদের ঠকাত দেদার। তবু যা হোক পাঁচ থেকে দশ মার্ক জুটে যেত সারাদিন খেটে।

প্রথমে কিছুদিন জোগাড়ের কাজ করেছিলাম। জীবনে প্রথম ভারী ভারী জিনিস ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে গিয়ে কী নাকালই না হয়েছিলাম। প্রবীণ জার্মান শ্রমিকরা মশকরাও করতেন আবার সাহায্যও করতেন।

ফলের বাগানে ফল কুড়োনোর কাজও করলাম কিছুকাল। চেরিফল কুড়োনোর সময়ে ইচ্ছেমতো চেরি খাবার অনুমতি ছিল। কলকাতায় চেরি কোথায়? আদেখলের মতো চেরি খেয়ে পেটের অসুখ বাধিয়ে বসলাম।

স্থানীয় এক তরুণ ধর্মযাজকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে তিনি কিন্তু মোটেও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন না। আমি অল্পস্বল্প গান গাইতে পারি জেনে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর গ্রামের গির্জায়। কলকাতা থেকে আমি একটা 'পোর্টেবেল' হারমোনিয়ম সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই গ্রামের গির্জায় আমি দু'বার বাংলা গানের অনুষ্ঠান করলাম। প্রথমে সকলে প্রার্থনা করলেন। তারপর গির্জার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমি একের পর এক রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে শোনালাম। সঙ্গে ছিল সংক্ষেপে জার্মান তর্জমা। গানগুলো লোকে মন দিয়ে, শান্ত হয়ে শুনল।

১৯৭৫ সালের শেষদিকে খবর পেলাম কোলোন শহরে ভয়েস অফ জার্মানির বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছে। একদিন গিয়ে সরাসরি কথা বললাম। কিছু তর্জমার কাজ জুটে গেল। এইভাবে ধীরে ধীরে আমি ভয়েস অফ জার্মানির বাংলা বিভাগের একজন নিয়মিত 'ফ্রি লানসার' হয়ে গেলাম।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের 'ইংলিশ টক্স' বিভাগে আমি 'ক্যাজুয়াল কন্ট্রাক্ট' নিয়ে বছরখানেক কাজ করেছিলাম ১৯৭০ সালে। যাদবপুরে এম.এ পড়তে পড়তেই আমি ঐ কাজে লেগে যাই। ফলে এম.এ-র পাঠ সম্পূর্ণ করিনি। পরীক্ষাও

দিইনি। আকাশবাণীতে আমি ছিলাম 'প্রোডাকশন অ্যাসিসটেন্ট'। সে সময়ে কয়েকটি কথিকা লিখে পাঠও করেছিলাম বেতারে।

জার্মান বেতারে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম ওখানকার কাজের পদ্ধতি অন্য। নানারকম নতুন চ্যালেঞ্জ সামলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে আমার বছরখানেক লেগে গেল। নিয়মিত জার্মান বেতারে কথিকা, খবর ইত্যাদি পাঠ করতে গিয়ে আমার বাচনভঙ্গি , উচ্চারণের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। লেগে গেলাম দুর্বলতা কাটানোর এবং দক্ষতা অর্জনের কাজে।

১৯৭৫ সালের শেষ দিক থেকে শুরু করে ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি আন্তর্জাতিক বেতার প্রচারে যুক্ত থেকেছি। মাঝে দুই কিস্তিতে মোট দু আড়াই বছর কেটেছে কলকাতায়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বছর বারো কাজ করেছি দুটি আন্তর্জাতিক বেতার কেন্দ্রে। এই দীর্ঘ সময়ে মাইক্রোফোন বস্তুটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কোলোন বা ওয়াশিংটনের স্টুডিয়ো-য় বসে কিছু বলছি। হাজার হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে বসে কত মানুষ সে কথা শুনছেন। তাঁদের তো আর দেখতে পাচ্ছি না। তাঁরাও দেখতে পাচ্ছেন না আমাকে। আমার কাজ হল বিপুল ভৌগোলিক দূরত্ব পেরিয়ে শুধু কথা, শব্দ, বাচনভঙ্গি দিয়ে তাঁদের স্পর্শ করা। এ-এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে বাংলা ভাষা, এ ভাষার ধ্বনিময়তা, শব্দ, বাক্য, কথা, বাচনভঙ্গি— প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছি। এগুলো নিয়ে প্রতিদিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

তেমনি সংগীত ও ধ্বনির প্রয়োগ নিয়েও ভাবতে ও কাজ করতে হয়েছে নিয়মিত। অন্য কোনও পেশায় নিযুক্ত থাকলে এই অমূল্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলো আমার হত কিনা সন্দেহ। পরবর্তী জীবনে নতুন করে গান গাইতে গিয়ে, বাজাতে গিয়ে, একটা গোটা অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে গিয়ে ওইসব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আমি সচেতনভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি—বলা বাহুল্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে পালটে নিয়ে।

ধ্বনির একটা আলাদা জগৎ আছে। সংগীত তো সেই জগতেরই অংশ। সংগীতও উচ্চারণ।

সারা জীবন আমি উচ্চারণের প্রেমিক, উচ্চারণের প্রয়াসী। বাচাল ও প্রগলভ হিসেবে আমার দুর্নাম আছে। উচ্চারণেই আমার আত্মপ্রকাশ, আমার মুক্তি। আবার উচ্চারণেই আমার সর্বনাশ।

জার্মানিতে গিয়ে একদিকে আমি জার্মানভাষীদের উচ্চারণ শুনে শুনে

ভাষাটিকে রপ্ত করতে চেষ্টা করেছি। অন্য দিকে বেতারে নিজের উচ্চারণ সম্পর্কে হয়ে উঠেছি সচেতন। আর একদিকে আবার জার্মান সংগীতে ও গানে মানুষের ভাবনাচিন্তা ও সৃজনশীলতার উচ্চারণের সন্ধান করে বেরিয়েছি।

নতুন পেশা ও কাজের চাপে গান গাওয়ার সুযোগ ছিল না তেমন। কিন্তু গানবাজনা শোনার সুযোগ ছিল প্রচুর। পাশ্চাত্যের কোনও দেশে থাকার এই একটা বিরাট সুবিধে যে, ইচ্ছে থাকলে নানারকম বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করা যায় এবং বিভিন্ন দেশের গানবাজনা শোনা যায়।

একধার থেকে শুনতে শুনতে বিশেষভাবে ভালো লেগে গেল পূর্ব জার্মান গায়ক হুলফ বিয়ারমান ও গায়িকা গিজেলা মায়-এর গান। অস্ট্রিয়ান গায়ক আন্দ্রে হেলার এবং পশ্চিম জার্মানির রাইনহার্ড মায়-এর কাজও আমার মনে গভীর ছাপ ফেলল।

গিজেলা মায়-এর কণ্ঠে শুনেছি বের্টল্ট ব্রেখটের গান। সুরগুলি কুর্ট হাইল ও হানস আইজলারের। এইসব সুর প্রচলিত ইউরোপীয় গানের সুরের মতো নয়। হাইল ও আইজলার দুজনেই ব্রেখটের গানে সুর দিতে গিয়ে আমেরিকান জ্যাজের (Jazz) উপাদান ও আঙ্গিক প্রচুর ব্যবহার করেছেন।

আইজলার আবার আর্নোল্ড শ্যোনবার্গের ছাত্র— যিনি ছিলেন সংগীতরচনায় "টুয়েলফ টোন" পদ্ধতির প্রবক্তা। অর্থাৎ 'মেজর' ও 'মাইনর' স্কেলের যে ধ্রুপদী রীতি, শ্যোনবার্গ সেটিকে লঙ্ঘন করে,—আমাদের সংগীতপদ্ধতির পরিভাষায় বলতে লেগে শুদ্ধ, কোমল ও তীব্র স্বরগুলিকে ক্রমান্বয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে একটা নতুন প্রযুক্তি গড়ে নেন। এর ফলে সংগীত রচনার একটা নতুন ভাষাই তৈরি হয়ে যায়।

অনভ্যস্ত কানে শ্যোনবার্গের সৃষ্টিগুলি উদ্ভট লাগতে পারে। তিনি কিন্তু সচেতনভাবেই এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সমাজে ইউরোপীয়দের মনে যে বিরাট পরিবর্তন আসে, সাহিত্য ও শিল্পের নানান ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে। পরিবর্তিত অবস্থায় সংগীতের ভাষা কেমন হবে, সেই চিন্তা থেকেই শ্যোনবার্গের কাজ।

হানস্ আইজলার ও কুর্ট হাইলের সুরচিন্তাও প্রথানুগ নয়। মিষ্টি মিষ্টি, সহজপাচ্য সুর কথা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যার্ট ব্রেখ্টের নতুন আঙ্গিকের লিরিকে সুর করতে গিয়ে তাঁরা দুজনেই তাই সুরের অন্য অনুষঙ্গ, উচ্চারণ খুঁজতে থাকেন। এর ফলে সুর ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে ব্রেখটের অনেক গান এক নতুন ব্যাকরণ ও ভাষার সাক্ষী। এই সুরের ভাষা ও আঙ্গিকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা দরকার নয়তো নিছক গান শোনার মতো করে এই গানগুলি শুনলে হয়তো বিশেষ ভালো লাগবে না।

হুলফ্ বিয়ারমানের গানের সুরও অনেকটা এই জাতের। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী বিয়ারমান পূর্ব জার্মান সরকারের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। মুশকিল হল, সেই সরকারও তো মার্কসবাদী! সরকার বিয়ারমানের পেছনে লেগে গেলেন। বিয়ারমানের গান হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ সমালোচনাধর্মী, তির্যক। সরকারি অনুষ্ঠানগুলো থেকে বিয়ারমানকে বাদ দেওয়া হল, একটা সময় এল যখন বিয়ারমান আর প্রকাশ্যে গান গাওয়ার সুযোগই পেলেন না।

বিদেশে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ ছিল অনেক। পূর্ব জার্মান সরকার বিয়ারমানকে ছাড়পত্র দিচ্ছিলেন না। শেষমেশ বিয়ারমান পশ্চিম জার্মানির কোলোন শহরে গিয়ে গান শোনানোর অনুমতি পেলেন। এ অনুষ্ঠানের টিকিট আমার কপালে জুটল না। আমি তাই টেলিভিশনে 'লাইভ' সম্প্রচার দেখলাম। হুলফ্ বিয়ারমান বহু বছর পর আদৌ কোনও প্রকাশ্য মঞ্চে তাঁর গানগুলি গাওয়ার সুযোগ পেলেন। আর পূর্ব জার্মানির 'কমিউনিস্ট' সরকার সুযোগ পেলেন বিয়ারমানের নাগরিকত্ব বাতিল করার। সেই থেকে একদা পূর্ব জার্মানির অস্তিত্বকর গানের কারিগর ও গায়ক পশ্চিমে ঠাঁই নিয়েছেন।

হুলফ্ বিয়ারমান আমার জীবনে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। মঞ্চে একদম একা গান গেয়ে এতক্ষণ ধরে এত বিপুল সংখ্যক দর্শককে দখল করে রাখতে পারার ক্ষমতা তার আগে অন্য কারোর মধ্যেই আমি দেখিনি।

একটি মাত্র কনসার্ট গিটার বাজিয়ে বিয়ারমান গান করেন। সাদাসিধে পোশাক পরে মঞ্চে একটি চেয়ারে বসে তিনি গিটার বাজান ও গান। রেকর্ডিং-এ অবশ্য বিয়ারমানের গানের সঙ্গে অর্গান আর অ্যাকর্ডিয়নও বেজেছে কয়েকবার, তবে গিটারই তাঁর প্রধান যন্ত্র। তিনি গান, কবিতা, গদ্য সবই লেখেন। অনুষ্ঠানে তিনি গানের ফাঁকে ফাঁকে কবিতাও শোনান মাঝে মাঝে। দু' একবার তাঁকে বই খুলে গদ্য পাঠ করতেও দেখেছি।

বিয়ারমান নিজেই গান লেখেন, সুর করেন। তাঁর সুর ও গাওয়ার আঙ্গিকে জার্মান লোকসংগীতের প্রভাব কম। পরিচিত বা মিঠে সুর দিয়ে তিনি ধরতে চান না শ্রোতাদের। বিয়ারমানের গানের মুখ্য বিষয় রাজনৈতিক ও সামাজিক হলেও, যাঁদের এ-হেন গানের সঙ্গে আমরা বেশি পরিচিত সেই আমেরিকান ও ইংরেজ গানের কারিগর ও গায়কদের সঙ্গে এটাই তাঁর প্রধান ফারাক। ধরা যাক উডি গাথ্রি, পীট সীগার বা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের বব্ ডিলান, জোন বায়েজ তাঁদের দেশের লোকসংগীতের বাতাবরণেই বেশি সুর করেছেন। অনেক সময় তাঁরা প্রচলিত সুরগুলিকে আশ্রয় করেই নতুন গান লিখেছেন।

হুলফ্ বিয়ারমান এই অর্থে 'ফোক সিঙ্গার' নন মোটেও। পূর্বোক্ত শিল্পীদের

মতো তাঁর গানেও আমেরিকান ব্লুজ ও বিশেষ করে জ্যাজের আভাস পাওয়া যায়। গিটারে 'কর্ড'-এর যে কাঠামো তিনি ব্যবহার করেন তা অনেক সময়ে অবিকল জ্যাজে প্রচলিত কাঠামোর অনুরূপ। কিন্তু গানের সুর ও গাওয়ার আঙ্গিকে তিনি জনপ্রিয় সংগীতের ধাঁচ এড়িয়ে যান। সুর ও স্বরগ্রামের একটা নিজস্ব মিশ্র আঙ্গিক তিনি গড়ে নিয়েছেন।

বিয়ারম্যানের নানান বৈশিষ্ট্য যে আমার কাজে প্রভাব ফেলেছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু এখানে তাঁর অনুষ্ঠান পরিবেশনা, তাঁর লিরিক ও সুরের কাঠামো এবং তাঁর গায়কীর প্রভাবের কথাই বলছি।

সংগীত বা গান মতবাদ বা 'আইডিয়া' দিয়ে তৈরি হয় না। তৈরি হয় সংগীত ও গানের বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। স্বর, সুর, তাল, ছন্দ, লয়, শব্দ, বাক্য, ধ্বনি প্রয়োগের আঙ্গিক।

এ প্রসঙ্গে ইগর স্ট্রাভিনস্কির আত্মজীবনীর একটি অংশের কথা মনে পড়ছে। ফরাসি কবি পল ভালেরির কাছে শোনা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সংগীতকার স্ট্রাভিনস্কি। ফরাসি চিত্রকর দেগা শখ করে কবিতাও লিখতেন। একদিন তিনি ফরাসি কবি মালার্মেকে বলেন: 'আমার সনেটের শেষ দিকটা আমি সামলাতে পারছি না। অথচ আমার তো আইডিয়ার অভাব নেই।' মালার্মের নরম উত্তর: 'আইডিয়া দিয়ে সনেট লেখা হয় না, লেখা হয় শব্দ দিয়ে।'

সংগীতের মতবাদ আবশ্যক আছে। কিন্তু মতবাদ যাই-ই হোক না কেন, সংগীত প্রথমত কাজ করে তার উপাদানগুলোর মাধ্যমে। আইডিয়া যত ভালোই হোক, মতবাদ যত 'প্রগতিশীল'ই হোক মাধ্যমটা যদি সংগীত হয় তো সেই মাধ্যমটার ওপর দখল বাড়ানোর লক্ষ্যে খাটছেন তাঁরা।

আমেরিকার এক বামপন্থী গায়িকা ও গানের কারিগর হলি নিয়ার আমাকে বলেছিলেন: 'আমি গিটারে তিনটি কর্ডের বেশি জানি না, আমার গলায় সুর নেই, গানবাজনায় আমি অপটু অশিক্ষিত, অথচ প্রতিটি গানে আমি সাঙ্ঘাতিক বৈপ্লবিক সব কথা বলছি, ভালো ভালো কথা বলছি— অতএব সবাইকে আমার গান শুনতেই হবে— এ দাবি হাস্যকর।'

জার্মান ভাষাটা মোটামুটি দখলে এসে যাওয়ায় জার্মানিতে আমি এমন অনেক লেখকের বই পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম যাঁদের কাজ তখনও ইংরেজি অনুবাদে তেমন ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় না। যেমন হালটার বেনিয়ামিন (Benjamin)। মার্কসবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত ভাবুক ও লেখক বেনিয়ামিন ইহুদি ছিলেন। নাৎসিদের ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

রাজনীতির দিক দিয়ে প্রগতিশীল রচনার গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করতে

পঙ্কজ মল্লিক

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সঙ্গে আমার একাত্মতা দুরূহ। আমার কথাগুলো আমি যদি কবিতায়, নিবন্ধে,গল্পে, আড্ডায়, বিতর্কে বলতে পারি তো গানে কেন বলতে পারব না, চাইব না? আমি নাগরিক। হোক সে অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। পৃথিবী নামে এই গ্রহটাও তো সীমাবদ্ধ। নিজের পরিবেশ, অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই না হয় আমার গানে আমি আমার অস্তিত্ব, সুখ-দুঃখ, ছোটোখাটো লড়াই, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আশা-নিরাশা, বিরক্তি, ঘৃণা, লজ্জা, সাহস, ভীরুতা, বড় বড় ব্যর্থতা, ছিটেফোঁটা সাফল্য,আমার প্রেম, কামনা, মায়া-মমতা, স্নেহ, দুর্বলতার কথা বলতে চেষ্টা করি। চেষ্টা করি আমার শহরটার কথা বলতে। গ্রামকে আমি নগরবাসী মধ্যবিত্ত হিসেবে যেভাবে দেখব, সেভাবেই তুলে ধরব আমার গানে। আমার অস্তিত্ব, শ্রেণিগত অবস্থান, ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনার খুঁটিনাটি দিকগুলো, আমার সময়টাকে আমি ধরতে চেষ্টা করব আমার গানে। তাহলে হয়তো আমার আশপাশের কিছু লোক সে গান শুনবে, হয়তো তার মধ্যে তারা নিজেদের খুঁজে পাবে।

আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার কয়েকটি লাইন অন্ধকার রাতে দূরের নক্ষত্রদের মতো জ্বলজ্বল করছিল, ভরসা পাঠাচ্ছিল আমার চোখে:

'I celebrate myself
I sing myself
And what I assume you must assume,
For every atom belonging to me
Belongs as well to you.'

১৯৭৯ সালেই আমি 'সমতান' ছেড়ে চলে গেলাম। 'সমতান'-এরই প্রাক্তন সদস্য সুভাষ বাগচি , তাপস (সুনীল) মাইতি, শিবশঙ্কর গুপ্ত, গীতশ্রী বসুর সঙ্গে মিলে নতুন একটা 'দল' করা হল। গীতিকার সুরকার গায়ক কমল সরকারের সঙ্গে 'সমতান'-এই আলাপ হয়েছিল। তিনিও এসে গেলেন। গোরা নামে এক সুগায়ক ছিলেন 'সমতান'-এ। তিনিও এলেন। নাকতলা অঞ্চলের এক যুবক চমৎকার অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতেন। ভালো নাম শোভন মুখোপাধ্যায়। ডাকনাম বেবি। তাঁকেও ডাক দেওয়া হল। বেবির তখন নিজস্ব অ্যাকর্ডিয়ন ছিল না। জার্মানি থেকে আমি 'হোনার' কোম্পানির তৈরি একটি অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে এসেছিলাম, আর এনেছিলাম 'মেলডিকা' নামে একটি যন্ত্র। যন্ত্রটি কি-বোর্ডের মতো রিড লাগানো, কিন্তু ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। এই যন্ত্রটা আমি মোটামুটি বাজাতে পারতাম। বেবি ধরল আমার অ্যাকর্ডিয়ন।

মরিয়া হয়ে আমি গান বাঁধার চেষ্টা শুরু করলাম। ১৯৭৫ সালে যে গানের প্রথম ছ'লাইন লিখেছিলাম, সেই গানটি কোনওরকমে শেষ করলাম প্রথমে। তবে

এই সময়ে প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ গানটি বেঁধেছিলাম, সেটি ছিল 'ভালো লাগছে না অসহ্য এই দিনকাল।' —গানটি বন্ধুদের শোনাতে তারা বলল গাইবে।

দলের নাম কী হবে তা নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে লাগল সকলে। গোরা প্রস্তাব দিল। 'স্বতঃস্ফূর্ত অগ্নিবীণা।' আমরা সকলে বাক্‌রহিত। কমল সরকার ছিলেন বয়সে বড়। মহা রসিক মানুষ। কমলদা বললেন —'এ বড়ো খটোমটো। বলতে গেলেই থুতু ছিটকোতে পারে।'—গোরার মনে যাতে ব্যথা না লাগে সেদিকে নজর রেখে, অল্পবিস্তর হাসাহাসির মধ্যে আমরা অগ্নিবীণা ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপারটাকে নাকচ করলাম।

কী গান গাইব, কেন গাইব— এইসব তত্ত্ব তখন সুভাষ (টিটো) সুনীল (যে গান বাজনা করত না, কিন্তু এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল), শিবু আর আমিই সবচেয়ে বেশি আওড়াতাম। আমরা নাগরিক, নগরজীবনকেই সবচেয়ে বেশি ধরতে হবে আমাদের গানে—এই ছিল আমাদের ধারণা। এরই ভিত্তিতে, বোধহয় টিটোর প্রস্তাবেই 'নাগরিক' নামটা গ্রহণ করা হল। কিন্তু 'নাগরিকের গান' কই?

আমি তখন (১৯৭৯ সালে) কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে সবে গান লিখতে শুরু করেছি। আমরা তাই ঠিক করলাম কমলদার রচনাগুলো গাইব। কমলদার গানগুলো গণসংগীত আঙ্গিকের। প্রথম শ্রেণির কিছু গান তিনি সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে একটি 'নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন/ ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না।' এই গানটির কথা এখানে-ওখানে পালটে অন্য এক গীতিকারের নামে 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার' রেকর্ড করেছিল।

কমলদার কিছু গান আমি দু-তিন পার্টে ভাগ করে, 'কাউন্টার পয়েন্ট হার্মোনি'-র মাধ্যমে বন্ধুদের দিয়ে গাওয়াতে শুরু করলাম। বৃন্দসংগীত আমার ভালো লাগত সেই কৈশোর থেকে। এককালে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের রচনায় ও পরিচালনায় আকাশবাণী থেকে 'ভোকাল ড্রিল' পরিবেশিত হয়েছিল। খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম বৃন্দসংগীতের সেই অসামান্য প্রয়োগ শুনে।

১৯৬৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক ক্লাবেও বৃন্দসংগীত পরিচালনা করেছি। পরে আরও দু-একবার এই সুযোগ জুটে যায়। অর্কেস্ট্রেশন সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই আমার দারুণ দুর্বলতা। যন্ত্র তো বেশি পেতাম না। বিভিন্ন কণ্ঠের সাহায্যে তাই ইচ্ছেগুলোকে রূপ দিতে চাইতাম।

'ভালো লাগছে না'র পর একদিন হারমোনিয়মটা এলোমেলো বাজাতে বাজাতে বেঁধে ফেললাম 'তোমার আমার স্বাধীনতা'। ফ্রান্সে থাকাকালে *মাই নেম ইজ নো বডি* নামে একটা 'ওয়েস্টার্ন' ছবি দেখেছিলাম। ছবিটা তো বটেই, আবহসংগীতটাও আমার বড় ভালো লেগেছিল। তখনই মনে হয়েছিল, ঐ সুরের মুখটা নিয়ে একটা

পীট সীগার

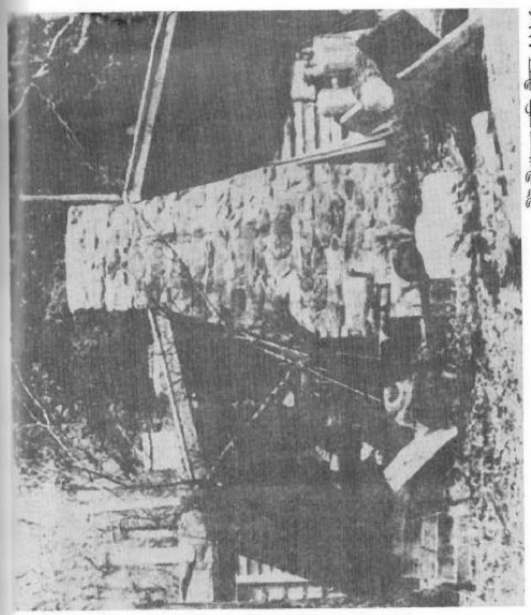

পীট সীগারের বাড়ি, কীকাম, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৫

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের প্রতিবাদ - ওয়াশিংটন, ১৯৮৫

নিকারাগুয়ায় বিপ্লবের সমর্থনে, ওয়াশিংটন, ১৯৮৫

নিয়ে হ্যালটার বেনিয়ামিনও একই কথা বলেছেন। যে কোনও লেখার সাহিত্যমূল্য থেকেই তার রাজনৈতিক মূল্য উঠে আসবে। আমি মনে করি সংগীত, গান সম্পর্কে একই কথা বলা যায়।

মার্কসবাদ নিয়ে অল্পবিস্তর পড়াশুনো করার সুযোগ আমি জার্মানিতে গিয়ে পেলাম অনেক বেশি। মূল জার্মানে মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের লেখা পড়ার একটা ইচ্ছে আগে থেকেই ছিল। তেমনি জার্মান ভাষাটা ভালোভাবে শিখে নেওয়ার দৌলতে হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী গেয়র্গ লুকাচের লেখায় দাঁত ফোটানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম। সবচেয়ে যা বড় কথা, দোকানে দোকানে প্রচুর ভালো ভালো বই, যেগুলো আগে কখনও চোখেও দেখিনি। শুধু তাই নয়, বেতার সাংবাদিকতা করে পয়সা পাচ্ছিলাম ভালোই, সুতরাং বই কেনার রেস্তটাও ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবক সুযোগ পেয়ে একটু আঁতলামোই যদি না করল, তাহলে আর করলটা কী!

মওকামাফিক আঁতলামো করতে গিয়ে এমন অনেক বই পড়ে ফেললাম যেগুলি আমার চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছে, প্রভাবিত করেছে।

প্রভাবিত হয়েছি আমি জার্মানির প্রসিদ্ধ 'কাবারেট' শিল্পরূপেও। আমরা 'ক্যাবারে' বলতে যা বুঝি, 'কাবারেট' কিন্তু তা নয়। জার্মান 'ক্যাবারেট' হল একধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রহসন। কাবারেট শিল্পীরা কখনও একা, কখনও দু'জন মিলে, কখনও আবার সদলবলে সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন টাটকা বিষয় নিয়ে মঞ্চে গান করেন, কবিতা বলেন, ছোট ছোট নাটক বা হাস্যকৌতুক করেন। নাচও থাকে মাঝেমধ্যে। কাউকেই রেয়াত করেন না কাবারেট শিল্পীরা। এঁরা হলেন বিদূষক।

কাবারেটের বিষয়গুলি সমকালীন। অমরত্বের কোনও দাবি 'কাবারেটিস্ট'-দের নেই। সমাজে, রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন যা ঘটছে সেটাকেই বিষয় করে নেন তাঁরা। সুকান্ত ভট্টাচার্যর ভাষায় বলতে গেলে— 'আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।'

তবে জার্মান কাবারেট শিল্পীদের বিক্ষোভ, সমালোচনা,আক্রমণ আসে বিধ্বংসী ঠাট্টার রূপ নিয়ে। শিল্পীরা তাই বলে ভাঁড়ামো বা হাসাহাসি করেন না। সুপরিকল্পিত, সিরিয়াস বিদ্রূপ তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। এটাই ভাষা পায় কাবারেটের গানে, ছড়ায়, ভাষণে, অভিনয়ে। মানুষকে জ্ঞান বা হিতোপদেশ দেওয়া কাবারেটের লক্ষ্য নয়। এক ধরনের স্বাস্থ্যকর, তাজা, বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত বিনোদনই হল জার্মান কাবরেটের লক্ষ্য।

কাবারেট শিল্পীদের অনুষ্ঠান, তাঁদের প্রয়োগপদ্ধতি দেখে দেখে আমি অনেক শিখেছি। সেই শিক্ষা অবশ্য দেখামাত্র— শোনামাত্র কাজে লাগাতে পারিনি। এটা

আমার স্বভাব নয়। নতুন কিছু দেখে শুনে যদি আমার ভালো লাগে তো আগে সেটাকে মাথার ভেতর জারিয়ে নিতে থাকি। লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করতে যাই সেটা নিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় মূল প্রেরণার রূপান্তর ঘটতে থাকে। তারপর কোনও এক সময়ে সেটা আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। জার্মান 'কাবারেট' আমি দেখতে শুরু করি ১৯৭৬ সালে। সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগাতে আমার চোদ্দো-পনেরো বছর লেগে গিয়েছে।

জার্মানিতেই বাংলাদেশের কবি শহীদ কাদরীর সঙ্গে আমার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। কিছুদিন তিনি জার্মানিতে ছিলেন। সে সময়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতাম। এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শহীদের মাধ্যমে তাঁর কবিতা তো বটেই , বাংলাদেশের অন্য কবিদের কাজ সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার সুযোগ ঘটে যায়। সাহিত্য ছাড়াও আরও নানান বিষয়ে শহীদ কাদরীর আগ্রহ ও দখল।

শহীদ কাদরীর সঙ্গে যখন দিনের পর দিন কবিতা থেকে শুরু করে তালাত মাহমুদের গান পর্যন্ত নানান বিষয়ে আড্ডা দিয়েছি তখন একবারও ভাবিনি যে তাঁর কবিতার ধাক্কায় দু-একটি গান বেরিয়ে আসবে একদিন।

১৯৭৯ সালের মে মাসে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম ভয়েস অফ জার্মানির জন্য কলকাতা থেকে মাসে অন্তত দুটি করে লেখা পাঠানোর ফরমাশ। পারিশ্রমিক বেশি নয়, মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো।

ম্যাক্সম্যুলার ভবনের সৌজন্যে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট-এ জার্মান ভাষা শিক্ষকের একটা কাজও জুটে গেল। বেতন সামান্যই, কিন্তু আসল প্রাপ্তিযোগটুকু ছিল নানান বয়সের ছাত্রছাত্রীদের জার্মান শেখানোর এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের আনন্দে।

আমার সাংবাদিক বন্ধু শুভরঞ্জন দাশগুপ্তর একটা চিঠি নিয়ে একদিন চলে গেলাম তখনকার 'আজকাল' পত্রিকার দপ্তরে। 'আজকাল' তখন ভাল করে শুরু হয়নি। 'আজকাল' বলতে তখন কেবল গৌরকিশোর ঘোষ আর অনন্তবাবু। একটা বিশাল ঘরে গৌরকিশোর ঘোষ একা বসে বসে টাইপ করছিলেন। বললেন: 'ভালোই হয়েছে এসে পড়েছেন, নিন কাজ শিখুন।'

মাঝে মাঝে তিনি আমায় কিছু কাজ দিতেন। হামদি বে'র কাছ থেকেও তালিম নিতাম কখনও-সখনও। মনের আনন্দে কাজ শিখতাম, তাঁদের উপদেশ মাথা পেতে নিতাম। আমার মতামতও তাঁরা মর্যাদা দিয়ে শুনতেন।

অন্যদিকে 'দেশ' পত্রিকার জন্য লিখছিলাম একটু আধটু। 'দেশ' পত্রিকায় আমার প্রথম নিবন্ধটি ছাপা হয় ১৯৭৬ সালে। জার্মানি থেকে জার্মান সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ে নানান নিবন্ধ পাঠাতাম 'দেশ'-এ । এ ব্যাপারে সাগরময়

ঘোষের কাছে যে স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়েছি তার তুলনা নেই। কলকাতায় ফিরে একবার 'সংগীত ও ভাবনা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সাগরময় ঘোষকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ওটি রেখে দিলেন পড়বেন বলে, কিছুদিন পরে তাঁর কাছে অন্য একটা কাজে গিয়েছি, জানতে চাইলাম প্রবন্ধটি তিনি পড়েছেন কিনা। তিনি বললেন : 'ওটা তো ছাপতে দিয়েছি।'

১৯৮০ সাল পর্যন্ত আমি দেশ পত্রিকায় 'সুমন চট্টোপাধ্যায়' নামেই লেখালেখি করেছি।

গান নিয়ে কী করা যায়— এই ভাবনা আমার মাথায় অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে লেখালেখির ধান্দার সঙ্গে। এমন সময় আমার এক পুরোনো বন্ধু অমিত রায় আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের গণসংগীতের দল 'সমতান'-এ। গণসংগীতের সঙ্গে আমার কোনওদিনই কোনও নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। তবু গেলাম—অনেকে মিলে গানবাজনা করার টানে। এমনিতে আমি গান প্রায় গাইছিলাম না বলা ভালো। কারণ, পরিচিত গানগুলোর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছিলাম না অনেককাল আগে থেকেই। সমানে মনে হচ্ছিল নতুন গান বাঁধতে হবে, যে গান বলবে আমার অভিজ্ঞতার কথা, সময়ের কথা। অথচ নিজে গান বাঁধার মুরোদ ছিল না। অমিতের ডাকে সাড়া দিলাম, যদি নতুন কিছু ব্যবহারোপযোগী কিছু পাওয়া যায়, এই আশায়।

'সমতান'-এ অমিত রায়, বাবলু নিয়োগী সমেত কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীর দেখা পেলেও গণসংগীত আমার চাহিদা মেটাতে পারল না। 'সমতান'--এর শিল্পীরা ভালো গাইছিলেন। সমবেত কণ্ঠে জোরালো গান। অমিত রায় নিজে সংগীতরসিক ও সুগায়ক। বাবলু নিয়োগী নিষ্ঠার সঙ্গে লোকগীতি শিখেছেন। পরবর্তীকালে 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' যাঁরা দেখেছেন, মূল গায়েন হিসেবে বাবলুর দক্ষতার পরিচয়ও তাঁরা পেয়েছেন। না, সংগীতের প্রয়োগের দিক দিয়ে 'সমতান'-এ কোনও আড়ষ্টতা ছিল না।

আমার অসুবিধে হচ্ছিল অন্য কারণে। যে গান আমি গাইব বাজাব, তা আমার বাস্তব অবস্থার কথা, অবস্থানের কথা বলবে। আমি নাগরিক মধ্যবিত্ত। শ্রমিক কৃষকের নিত্যজীবনে কোথাও আমি তাঁদের শরিক নই। গ্রামে-গঞ্জে আমি কোনওদিন কোথাও আমি তাঁদের শরিক নই। গ্রামে-গঞ্জে আমি কোনওদিন বাস করিনি। নগরজীবনটাই আমার চেনা। এ ব্যাপারে আমার কোনও হীনম্মন্যতা নেই। আমার জন্মের আগে কেউ আমার মতামত নেয়নি—আমি আদৌ জন্মাতে চাই কিনা, কোথায় কোন শ্রেণিতে জন্মাতে চাই ইত্যাদি।

আমার গান যদি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা না বলে, তো সে গানের

গান হতে পারে। 'তোমার আমার স্বাধীনতা'র প্রথম দিকের সুরে ভালোলাগা সেই সুরটির ছায়া পড়ল। অন্তরা থেকে অবশ্য অন্যরকম। গানটা বন্ধুদের শোনাতেই তারা লুফে নিল। সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার জন্য আমি অন্তরায়, বিশেষত দ্বিতীয় অন্তরায় সমান্তরাল 'কাউন্টার পয়েন্ট'-এর লাইন রচনা করেছিলাম। সেই সুরটা মেয়েরা গাইত। ততদিনে 'নাগরিক'-এ ছেলেমেয়ে মিলিয়ে আরও অনেকে এসে গিয়েছে। টুনি নামে এক কিশোরীর মধ্যে প্রথম শ্রেণির সম্ভাবনা দেখেছিলাম। কিশোর নামে একটি প্রতিভাবান ছেলেও এসেছিল।

এরপর একদিন শহীদ কাদরীর 'রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট' কবিতাটি পড়তে পড়তে ঐ কবিতার ধাক্কায় আমি একটি গান লিখে ফেলি।— সেই প্রথম আমি গানের কথাগুলো আগে লিখলাম পুরোটা। গানের মধ্যেই শহীদের কবিতার অংশগুলো জায়গামাফিক লাগিয়ে একটা কাঠামো ও আঙ্গিক আমি তৈরি করলাম, যার কোনও পূর্ব নজির আমার জানা নেই।

'তোমাকে ভাবাবই ভাবাব' তার পরের রচনা। সম্ভবত '৭৯ সালের শেষে বা '৮০ সালের গোড়ায় আমি ব্যার্ট ব্রেখ্‌টের 'জনৈক পড়ুয়া শ্রমিকের প্রশ্ন' কবিতাটি অবলম্বনে আমাদের দেশকালের জন্য প্রাসঙ্গিক একটি গান লিখি, তাতে সুর দিই। আমার গানে 'জরুরি অবস্থা'-র উল্লেখ এল। ব্রেখ্‌টের সেই শ্রমিকের প্রশ্নগুলি ছিল ইউরোপের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। আমার গান শুরু ভারতের ইতিহাসকে সামনে রেখে: 'কে তৈরি করেছিল তাজমহল/ সে কি শাজাহান?'

কথা, সুর, ছন্দ, কথা-সুরের পূর্বভাগ, গানের কাঠামো এবং গাওয়ার আঙ্গিক নিয়ে তখন আমি পুরোদস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছি।

মহড়ায় আমি গানগুলো সকলকে তুলিয়ে দিতাম— কথার উচ্চারণ, সুরের সঙ্গে কথাকে মিলিয়ে অনিবার্যভাবে স্বর প্রক্ষেপ করা, কথার মানে বুঝে গাওয়া সমবেত কণ্ঠে হলেও কথা ও সুরের মর্মার্থ অনুসারে গলা কখনও জোরে কখনও আস্তে প্রয়োগ করা— এইসব দিকে কড়া নজর রেখে।

বব্ ডিলানের 'A Hard Rain' গানটির শেষ লাইন হল:

' I will know my song well, before
I start singing'.

সংগীত ও গানের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই হল আমার দর্শন। আমরা মহড়া দিতাম গড়িয়ায় আমার বাবা-মার বাড়িতে। পাশের ঘর থেকে সেই মহড়া মাঝেমধ্যেই শুনে নিতেন আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু, লেখক সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ। বাবাতে বিনয়বাবুতে তখন বন্ধুত্ব এতই জমে উঠেছিল যে তাঁরা ঠিক করেছিলেন মধুপুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে দুজনে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবেন

আর আড্ডা মারবেন। 'নাগরিক'-এর গানের টানে বিনয় ঘোষ আড্ডা ছেড়ে নেমে আসতেন।

বিনয়বাবুর সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমারও বেশি সময় লাগেনি। সংগীত ও সমাজ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে জোরালো আলোচনা হতে লাগল। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমায় এ-বিষয়ে আরও অনেক চিন্তার খোরাক দিলেন। আমার একটা তত্ত্ব ছিল: প্রত্যেক সমাজেরই লোকসংগীত থাকে। আমাদের নগর-সমাজের বয়স নেহাত কম নয়। অথচ নাগরিক বাঙালির লোকগান নেই। লোকগীতি বললেই আমরা পল্লিগ্রামের লোকগীতির কথা ভাবি। নগর সমাজের নাগরিকরাও তো 'লোক'। তাদের গান কই? উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তখনকার শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণির মধ্যে থেকে যে আধুনিক গান ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, তারই ভেতরে নগরলোকের গানের বীজ রাখা ছিল। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকেই কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানি ও বেতার এসে পড়ায় আধুনিক বাংলা গানের ওপর পণ্য হয়ে ওঠার চাপও বর্তায়। আরও বেশ কিছুকাল সময় পেলে এই আধুনিক গানই হয়তো ক্রমবর্ধমান নাগরিক শ্রেণির বিভিন্ন লোকস্তরে ছড়িয়ে গিয়ে সেখান থেকেই আবার বিভিন্ন রূপ ধরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেত। নাগরিক জীবন, নাগরিক অভিজ্ঞতা ও নাগরিক মানসিকতা বিচিত্র রূপে, কথায় সুরে তালে প্রকাশ পেত। সে-সব গানের ব্যবহারিক মূল্যটাই হয়ে দাঁড়াত প্রধান। কিন্তু বাংলা গানের আধুনিকতার উন্মেষ হতে না হতেই সে-গান পেয়ে গেল একটা বিনিময়মূল্য। ফলে গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের দিকটা ক্রমান্বয়ে গৌণ হয়ে বাজারমুখী চিন্তাই পেল প্রশ্রয়। আমার সিদ্ধান্ত ছিল এই যে নাগরিক বাঙালিকে যদি গানের মধ্যে দিয়ে তার জীবনকে ধরতে ও ফুটিয়ে তুলতে হয় তবে আধুনিক গানকেই হতে হবে তার বাহন—এবং নিরঙ্কুশ পণ্যচরিত্রটাকে প্রথমত দূরে রেখে এ-গানের ব্যবহারিক মূল্যের ওপর জোর দিয়ে। এ থেকেই হয়তো বেরিয়ে আসবে নগরলোকের গান—বিচিত্র রূপ নিয়ে।

আমার এই কথাগুলো শুনে বিনয় ঘোষ খুব উৎসাহ দেখালেন এবং বললেন বক্তব্যটা একটা নিবন্ধ আকারে লিখে তাঁকে দিতে। আমি তাই-ই করলাম। বিনয়বাবুর ইচ্ছে ছিল আমরা দুজনে মিলে আধুনিক বাংলা গানের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে কিছু কাজ করব। সে আর হল না। ১৯৮০ সালে বিনয় ঘোষ হঠাৎ মারা গেলেন।

অল্প সময়ের পরিচয়। কিন্তু অদ্ভুত এক আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে মানসিক স্তরে। আমার নতুন গানগুলি, সংগীত সম্পর্কে আমার চিন্তা—প্রতিটি ব্যাপারে বিনয়বাবু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো মতামত ও উৎসাহ দিতেন। সংগীতই শুধু

নয়, ছাত্র আন্দোলনের দশক ও র‍্যাডিকাল জার্মান ছাত্রনেতা রুডি ডুচকের ওপর একটা বড় প্রবন্ধও লিখতে বলেছিলেন তিনি আমায়। প্রবন্ধটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিনয় ঘোষের মৃত্যুর পর।

'নাগরিক'-এর আখড়া বেশ জমে ওঠার পর খান-দুই অনুষ্ঠানের ডাকও জুটে গেল বন্ধুদের সূত্রে। প্রথমটা হল বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে। বেবি আর আমি দুজনে দুটি অ্যাকর্ডিয়ান বাজালাম। আমি তো ঠিক অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতাম না, বাজাতাম 'পার্‌পেন্‌ডিকুলার' হারমোনিয়ম। যন্ত্রটা বাজিয়ে বাজিয়ে কণ্ঠশিল্পীদের পেছনে ঘুরঘুর করছিলাম যাতে সকলে কানে সুর পায়। বেবি একটা ধার-করা পেল্লায় যন্ত্র বাজাচ্ছিল মঞ্চের এককোণে।

ছেলেমেয়েদের কানে সুর পৌঁছে দেওয়া ছিল এক বিরাট সমস্যা। অতি জটিল সব 'পার্ট' তাদের গাইতে হবে। কেউই তো আর রেওয়াজ করা পাকা গাইয়ে নয়। দু'একজন খুব সুরেলা। বাকি অনেকেই সুরে দুর্বল।

আমি কিন্তু প্রথম থেকেই যন্ত্র বাজাচ্ছিলাম। গানে আমি ছিলাম না। কেউ ভালো গান গাইলে তার সঙ্গে বাজাতে আমার বরাবর ভালো লাগে। সঙ্গতকারী হিসেবে আমি বেশি আনন্দ পেতাম। নিজের গাওয়াটাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখতাম আমি। অনেকদিন নিয়মিত গান গাইনি। একটা সঙ্কোচও কাজ করছিল। তবে তার চেয়েও যা বড় কথা—সংগীত পরিচালনা করে ও বাজিয়ে আমি বেশি সুখ পেতাম।

'নাগরিক'-এর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল গোর্কি সদনে। এবারে মঞ্চ আরও বড়। বেবি আর অ্যাকর্ডিয়ন ধার করতে পারল না, ফলে আমারটাই বাজাল। আমি ছিলাম পরিচালনায় ও মেলোডিকায়। সে-এক সর্বনেশে ব্যাপার। ছেলেমেয়েরা কেউ ঠিকমতো সুর পেল না, তাল পেল না। যা তা ব্যাপার, হয়ে গেল।

খুব মুষড়ে পড়লাম সকলে। দল বেশ বড়, কিন্তু যন্ত্র বলতে একটা অ্যাকর্ডিয়ান, একটা মেলোডিকা, একটা ট্রিপল কংগ। ১৯৮০ সালে এখনকার মতো এত কিবোর্ড ও গিটার শিল্পী পাওয়া যেত না। তাহলে কী উপায়। অনুষ্ঠানের জন্য যন্ত্রী ভাড়া করব, যাঁরা দুটি মহড়া দেবেন, দলের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেন না—এটা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। একখানা ইলেকট্রিক অর্গ্যানের খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়ালাম। পেলাম না। বেশি টাকাও ছিল না হাতে।

আমি তখন পাগলের মতো রাস্তা খুঁজছি। জার্মানিতে তখনকার যুগের ইলেকট্রনিক কি-বোর্ড দেখে এসেছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল এই যন্ত্র খুব কাজে লাগবে। কিন্তু সঙ্গে আনার কথা ভাবিনি। নানান যন্ত্রের প্রয়োগ আমার আবাল্যের স্বপ্ন। ছেলেবেলা থেকে যখনই গান শুনেছি, তখনই কান খাড়া করে রেখেছি

যন্ত্রসঙ্গতের দিকে। কোন গানে, কোন জায়গায় কোন যন্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে, সর্বান্তঃকরণে তার হিসেব রেখে গিয়েছি। নিজে আলাদা করে কোনও যন্ত্র শেখার সুযোগ পাইনি, শিখেছি কণ্ঠসংগীত। কিন্তু যন্ত্রসংগীতের প্রতি আমার টান কণ্ঠসংগীতের চেয়ে কোনও অংশে কম তো নয়ই ক্ষেত্র বিশেষে বরং বেশি।

ছেলেবেলা থেকে আমি কাউকে না বলে একটা খেলা খেলতাম। ফুরসত পেলেই আমি কল্পনা করতাম আমার মাথার ভেতরে নানান যন্ত্রের একটা আস্ত অর্কেস্ট্রা বাজছে। কখনও এ-যন্ত্র, কখনও ও-যন্ত্র। এই খেলা আমি আজও খেলি।

'নাগরিক'-এর গানের জন্য যন্ত্র দরকার। ইলেকট্রনিক যন্ত্র ছাড়া মুক্তি নেই। কারণ, একটা যন্ত্র থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে, গায়ক-গায়িকাদের সামনে 'মনিটর'-এর মাধ্যমে সুর ও তাল জোগানো হবে। তারা সাঁতার কাটবে সুরে।

কোথায় যন্ত্র, কোথায় যন্ত্র করছি—এমন সময় একদিন খবর এল ভয়েস অফ আমেরিকায় আমি একটা চাকরি পেয়েছি। জার্মানিতেই আমি ভয়েস অফ আমেরিকার জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম। চাকরিটা পেতে পেতে অনেক মাস গড়িয়ে গেল। সত্যি বলতে, আমি আশাও করিনি যে চাকরিটা পাব। ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। আমি তখন বরং আজকাল পত্রিকায় পাকা চাকরির চেষ্টা করছি। প্রথম পরীক্ষায় পাসও করে গিয়েছি।

আমেরিকায় চাকরির প্রস্তাবটা আসতেই আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। এই তো সুযোগ! আমেরিকায় গিয়ে যত পারব যন্ত্র কিনব, পাশ্চাত্য সংগীত তালিম নেব, তারপর মালপত্র নিয়ে ফিরে আসব কলকাতায়। প্রাণ ভরে বাংলা গান বাঁধব,গাইব,বাজাব।

গড়িয়ার মোড়ে একটা খাবার দোকানে চা খেতে খেতে আমরা তিন চারজন বন্ধু মিলে পরিকল্পনা করে ফেললাম। ওদের বললাম— তোরা চালিয়ে যা 'নাগরিক'-এর কাজ। মহড়া দিয়ে যা। আমাকে পাঁচ বছর সময় দে। আমি অনেক যন্ত্র নিয়ে ফিরে আসব। আসবই আসব। কোনও কোনও বন্ধুর মনে সংশয় ছিল: তুই কি আর ফিরবি রে! আমেরিকা থেকে কেউ কি ফেরে? সবাই থেকে যায়।

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ওয়াশিংটনে ডিসি-তে ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে যোগ দিলাম। যাবার আগে গৌরকিশোর ঘোষকে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম। তিনি বললেন—'অমন কাজটি করবেন না। এখানেই থাকুন, এখানেই আপনার ভবিষ্যৎ।'

নতুন বাংলা গান, যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, আমেরিকার যন্ত্র কেনা, পাশ্চাত্য সংগীত শেখা, কিছু বছর পর দেশে ফিরে বাংলা গান নিয়ে কাজ করা— এসব

বিষয়ে তাঁকে বললাম যথাসম্ভব। গৌরকিশোর ঘোষের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই অসংলগ্ন ও আজগুবি ঠেকেছিল নিশ্চয়। তিনি ব্যাপারটাকে আমলই দিলেন না। সত্যি বলতে আমার পরিচিত অনেকেই আমার পরিকল্পনাটাকে পাত্তা দেননি।

আমেরিকায় গিয়ে প্রথম মাইনে পেয়েই একটা পোর্টেবল কি বোর্ড কিনে ফেললাম। দু'হাতে বাজানো অভ্যেস করতে লাগলাম। দু'মাসের মধ্যে মাসিক কিস্তিতে কিনে ফেললাম একটা বড় 'ডাবল্‌ডেক' অর্গ্যান। ভারি সুন্দর আওয়াজ। দু'হাতের অনুশীলন চালিয়ে গেলাম হৈ হৈ করে।

আমিও ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে 'ইন্টারন্যাশনাল রেডিয়ো ব্রডকাস্টার' হিসেবে যোগ দিলাম আর একটু নরমপন্থী ডেমোক্রাট রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারকে ভোটে হারিয়ে কট্টর দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকান রোনাল্ড রেগান হলেন নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। রেগান ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ভয়েস অফ আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল তথ্যবিকৃতি এবং অপপ্রচারের প্রধান হাতিয়ার। সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিদিন কোনও-না কোনও বাজে কথা তর্জমা করে ও প্রচার করে দিন কাটতে লাগল। ডলারটাও তো দরকার। বাঁচতে হবে। বাজনা কিনতে হবে।

দিন ও সন্ধের বেশির ভাগটা কেটে যেত রেগানের চাকরামি করে। একরাশ আত্মগ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরেই বসে যেতাম অর্গ্যানে।

আসবাব বলতে আমার ছিল কেবল একটা সস্তা খাট এবং অর্গ্যানের সঙ্গে পাওয়া একটি টুল। রান্নাঘরে কোনওমতে রান্না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিতাম। ১৯৮২ সালে সলিল চৌধুরি আমার কাছে যাবার ঠিক আগে আমি ভদ্রলোকের বসার মতো একটা সোফাসেট কিনি।

কোনওরকমে খাওয়া দাওয়ার জন্য যেটুকু খরচ সেটুকু, বাড়িভাড়া আর হাত খরচ—এ ছাড়া সমস্ত টাকা আমি খরচ করতাম বাজনা, টেপ রেকর্ডার, অন্যান্য যন্ত্র, রেকর্ড ক্যাসেট আর বইয়ের পেছনে।

অর্গ্যানে দুই হাত মোটামুটি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমি কি-বোর্ড বাজনায় তালিম নিতে শুরু করলাম। একজন মাস্টারের কাছে শেখা ছাড়াও কি-বোর্ড, থিয়োরি, কর্ড-পরম্পরা , স্বরলিপি লেখা ও পড়া ইত্যাদি বিষয়ে আমেরিকার নানান জায়গা থেকে বই ও টেপ আনাতে লাগলাম। চাকরির বাইরে যতটা সময় পেতাম তার প্রায় সবটুকুই দিতাম কি-বোর্ড শেখায়, বাজানোয়।

কি-বোর্ড বাজানোর ব্যাপারে আমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অসুবিধে ছিল। ভালো হারমোনিয়ম বাজাতে পারতাম বলে আমার ডান হাতটা ছিল পাকা। বাঁ

হাতটা প্রথমে একবারেই চলত না। ক্রমাগত খেটে বাঁ হাতটা একটু সড়গড় হল ঠিকই, কিন্তু ডান হাতটা হয়ে পড়ল আগের চেয়েও আরও তুখোড়। ফলে আমার দুই হাতের মধ্যে কি-বোর্ডের ক্ষেত্রে—একটা বেয়াড়া ফারাক থেকেই গেল। এ-দুর্বলতা আজও আছে বৈকি।

হারমোনিয়ম তো নিজে নিজেই বাজাতে শিখেছিলাম ছেলেবেলা থেকে। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পিয়ানো বা অর্গ্যান বাজানোর জন্য যেভাবে ডান হাতের আঙুল চালাতে হয়, সেভাবে তো আর শিখিনি। অভ্যেস বা বদ অভ্যেসটা হাতে বসে গিয়েছিল। এবারে ৩০/৩১ বছর বয়সে শিশুর মতো পাশ্চাত্যের স্বীকৃত পদ্ধতিতে আঙুল চালানো শিখতে গিয়ে মহা গেরো। ডান হাত আর কিছুতেই নতুন মাস্টারের কথা শুনতে চায় না। সে ছোটে নিজের অভ্যেসে। এই টানাপোড়েন আমি কোনওদিনই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। শেষে আমি নিজের মতো করেই বাজানো শুরু করলাম। দেখলাম, নতুন করে সব শেখার অপচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিজের মতো এগিয়ে চলাই শ্রেয়। পাশ্চাত্যের পদ্ধতি শিখে কি-বোর্ডে পাশ্চাত্য মার্গসংগীত বাজানোর ইচ্ছে বা স্বপ্ন আমার আদৌ ছিল না। পাণ্ডিত্যও ছিল না আমার লক্ষ্য। আমার দুর্বলতা, বয়স ইত্যাদিকে মেনে নিয়েই পাশ্চাত্য সংগীতের বিভিন্ন প্রকরণ ও প্রযুক্তি যতটা সম্ভব শিখে নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আমেরিকা প্রয়োগের দেশ। কিভাবে হল-র চেয়ে কী হল, আদৌ কিছু হচ্ছে কিনা—সেদিকেই বোধহয় আমেরিকানরা বেশি নজর দেন। এরকম ঘটনা অন্তত বার পাঁচেক ঘটেছে যে আমি কোনও বাজনার দোকানে বসে আপন মনে হ্যামন্ড অর্গ্যানে বা সিন্‌থেসাইজারে কিছু বাজাচ্ছি আর লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এসে বলেছে— 'তুমি তো বেশ বাজাও হে! আমাদের রক্ বা জ্যাজ ব্যান্ডে ভিড়বে নাকি? চলে এসো।'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতাম— 'আরে না না, আমি তোমাদের সংগীতের ব্যাকরণ ভালো জানি না। তাছাড়া বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতটাই বেশি চলে।'

প্রতিবারই উত্তর পেতাম: 'ব্যাকরণ দিয়ে কী হবে। দিব্যি বাজাচ্ছ। শুনতে ভালো লাগছে। আর, তুমি যদি শুধু ডান হাতেই এই খেলা দেখাতে পারো তো বাঁ হাতের দরকারই বা কী!'

একটি দোকান থেকে আমি প্রচুর যন্ত্র কিনেছিলাম। সেই দোকানের বিক্রেতারাও ছিলেন প্রত্যেকে সংগীত শিল্পী। তাঁরা আমায় পছন্দ করতেন, তাছাড়া অনেক জিনিস কিনতাম তাই যখন খুশি ওই দোকানে গিয়ে কি-বোর্ড বাজানোর অনুমতি ছিল। নতুন ভালো যন্ত্র এলেই তাঁরা ফোন করে দিতেন। আমি চলে যেতাম, বাজাতাম। মাঝে মাঝেই দেখতাম কেউ একজন কোত্থেকে একটা

স্যাক্সোফোন নিয়ে এলেন, কেউবা একটা গিটার। ব্যস, সবাই মিলে বাজনা চলত মনের আনন্দে। সে এক অনাবিল অভিজ্ঞতা। কেউ কাউকে চিনি না, কেউ কারোর নাম জানি না, কেউ কাউকে ডেকে আনেনি। অথচ কয়েক মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে বাজানোর মধ্যে দিয়ে এক নিবিড় সম্পর্কের বিকাশ। যে যেখানে যতটুকু পারে যোগ করছে, সুরবিহারে ভেসে চলেছে পরম নিশ্চিন্তে, মহড়াহীন সংগীতের চ্যালেঞ্জ সামলাচ্ছে, ভুল হলে হেসে উঠছে, ভালো লাগলে বা উতরোলে হৈ হৈ করে উঠছে। দেশ, জাতি, মুখের ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি (?)—সব কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। দূর হয়ে গিয়েছে কালো-সাদার বিভেদ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সমস্ত সীমারেখা। আপনমনে বাজিয়ে চলেছে কয়েকটি মানুষ, যাদের ভাষা একটাই: সংগীত। এই অনবদ্য মানবিক অভিজ্ঞতা আমার আর-কোথাওই হয়নি।

আমার সমস্ত শরীর, চেতনা একটা বিরাট মুখের মতো গিলে খাচ্ছিল ঐ বিপুল মহাদেশের বিচিত্র সংগীত। পাগলের মতো শুনছিলাম, চাখছিলাম, বাজাচ্ছিলাম—এমনকি গাইতেও শুরু করেছিলাম। নিঃসঙ্গ ঘরে একাকিত্ব কাটানোর জন্য গলা ছেড়ে গাইছিলাম ফের। গাইতে গাইতেই বেঁধে যেতে লাগলাম একের পর এক নতুন গান। 'আগুন দেখেছি আমি কত জানলায়'।—দুচোখ বুজে যাও'।—'হাজার বছর ধরে জমে থাকা তমসা'। —'আমেরিকাপ্রবাসী বাঙালির গান'। —'সারারাত জ্বলেছে নিবিড়'।—'বন্ধু আমার এই হাত ধরো।

১৯৭৯ সালে নিকারাগুয়ায় সাননিনিস্তা বিপ্লবীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। দেশটা উত্তর আমেরিকার কাছেই। রেগান ও ভয়েস অফ আমেরিকা ক্রমাগত থাবা বসাতে চাইছে ছোট্ট সেই দেশটার ওপর। চূড়ান্ত মিথ্যে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অর্ধসত্য প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছি ডলারের বিনিময়ে নিকারাগুয়া ও কিউবা সম্পর্কে। আমার মাথার মধ্যে এদিকে নিকারাগুয়ায় বিপ্লব তুলে চলে একের পর এক ঢেউ। স্বপ্ন দেখছি নিকারাগুয়ায় যাব। বিপ্লবের সাক্ষী হব। বাংলায় বই লিখব সেই বিপ্লবের ওপর।

নিকারাগুয়ায় যাব বলে ১৯৮১ সাল থেকেই স্প্যানিশ ভাষাটা শিখতে শুরু করলাম। লাতিন আমেরিকার ইতিহাস, লোকনীতি ও সাহিত্য বিষয়ে শুরু করলাম পড়াশুনো। তারই পাশাপাশি নিকারাগুয়ার বিপ্লবীদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘটনাটা মনে রেখে গান লিখে ফেললাম:

'জ্বলছে প্রাণে অনেক জ্বালার চকমকি আজ
এবারে জ্বলবে আগুন।
ঠান্ডা হিমের স্যাঁতস্যাঁতে দিন ফুরোয় দ্যাখো
এসেছে গ্রীষ্ম দারুণ।'

গ্রীষ্মের দারুণ উজ্জ্বলতায়, দাবদাহে বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন:

'এবারে পুরোনো সব উড়িয়ে দেবার দিন এসেছে
যতসব ঝরাপাতা পুড়িয়ে দেবার দিন এসেছে
যত যুগযুগান্তরের আগাছা সব
মুড়িয়ে দেবার দিন এসেছে—
এসেছে গ্রীষ্ম দারুণ।'

ততদিনে আমার ঘরে দুটি সিনথেসাইজার, দুটি অর্গ্যান, একটি কি-বোর্ড, একটি চার-ট্র্যাক টেপ রেকর্ডার, মাস্টার রেকর্ডার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি এসে গিয়েছে। 'ভোয়া'র প্রফেশিল্লীদের খুঁচিয়ে আর বই পড়ে আমি 'মাল্টি ট্র্যাক রেকর্ডিং' এ হাত পাকাচ্ছি। এক ট্র্যাকে গাইছি। অন্য ট্র্যাকগুলোয় বাজাচ্ছি মনের সুখে।

নিজের গানের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা রচনা ও যন্ত্রসংযোজনার কাজ করে চলেছি নেশাগ্রস্তের মতো।

১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে সলিল চৌধুরি এসে উঠলেন আমার বাসায়। ১৯৮০ সালে কলকাতা ছেড়ে চলে আসার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, একটা বড় লেখা লিখতে চাই তাঁর ওপর, তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে চাই। তিনি জানান, দু'এক বছরের মধ্যে তিনিও আমেরিকা যাচ্ছেন, তখন দেখা হবে, একসঙ্গে কিছু কাজও করা যাবে।

নিউইয়র্ক হয়ে মেরিল্যান্ডের 'সিলভার স্প্রিং' শহরে অবশেষে আমার ডেরায় এলেন সলিল চৌধুরি।

একটা খাতা ভর্তি প্রশ্ন লিখে রেখেছিলাম তাঁর জন্য। ছেলেবেলা থেকে যাঁর কাজ আমি ছায়ার মতো অনুসরণ করে যাচ্ছি, তাঁকে এবারে নিজের মতো করে পাব—এই উত্তেজনা, আনন্দ আমায় অস্থির করে তুলেছিল। সলিল চৌধুরির সঙ্গে নিরঙ্কুশ সময় কাটাব বলে সাত দিন ছুটি নিয়ে রেখেছিলাম। 'ভোয়া'-য় যোগ দেবার পর সেই আমার প্রথম ছুটি। মনে আছে, সলিল চৌধুরি এসে পৌঁছোলেন বিকেলের দিকে। সন্ধেবেলা আমি বেরুচ্ছি বাজার করতে, তিনি বললেন সঙ্গে যাবেন। বৃষ্টি পড়ছে। দুজনে জ্যাকেটের কলার উঁচিয়ে, মাথায় টুপি চাপিয়ে পা চালাচ্ছি বাজারের দিকে। আমি মনের আনন্দে গান ধরলাম 'ঝিরঝিরঝির ঝিরঝির বরষা'। 'এল রে ঝড় এলোমেলো' থেকে সলিলদাও গলা মেলালেন।

সাতটা দিন আর রাত কেটে গেল প্রশ্ন-উত্তরে, অবিরাম আলোচনায়, বিতর্কে,বিশ্লেষণে, গানের ওয়ার্কশপ করে। নিজের সম্পর্কে, নিজের কাজ, ব্যক্তিত্ব ও কাজের হয়ে-ওঠা, সংগীত বিষয়ে তাঁর মনোভাব, গানের কথা, সুর, তাল, ছন্দ আর অর্কেস্ট্রেশন সম্পর্কে সলিলদা নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বলে গেলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমি বলিয়ে নিলাম।

একের পর এক গান তিনি গেয়ে গেয়ে দেখিয়ে দিলেন—গাওয়ার আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর ধারণা, আদর্শ। জীবনে সেই প্রথম মালুম হল, তাঁর অনেক গান যেভাবে গাওয়া উচিত, অনেক নামি শিল্পী সেভাবে গাননি।

পরে ফিলাডেলফিয়ায় স্থানীয় ভারতীয়রা সলিল চৌধুরিকে সংবর্ধনা দিলেন। সলিলদার অনুরোধে আমি সেখানে তাঁর কাজ, সংগীতে তাঁর অবদানের ওপর একটি ভাষণ দিলাম। তারপর সলিল চৌধুরি হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইলেন কয়েকটি। সলিলদা সেই অর্থে কণ্ঠশিল্পী নন। কিন্তু গান যে লোকে গলা দিয়ে ততটা নয়, মাথা দিয়েই বরং গায়, তার প্রমাণ রাখলেন তিনি। কী সুঠাম, নির্লজ্জ অভিব্যক্তি, স্বরপ্রক্ষেপে কথা-সুরের উচ্চারণে আবেগের কী বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ, পরিমিতিবোধ, শুধু গলা দিয়েই কি নৈপুণ্যে ও স্ফূর্তিতে ছন্দ তুলে আনা!

এজরা পাউন্ড তাঁর *এ বি সি অফ রিডিং* গ্রন্থে লিখেছেন: 'সংগীত থেকে বেশি দূরে সরিয়ে আনলে কবিতা কুঁকড়ে যায়। আর, নাচ থেকে বেশি দূরে সরিয়ে আনলে সংগীতের হয় মৃত্যু।'

সলিল চৌধুরির অনেক গানে তাল ও ছন্দের যে প্রয়োগ এবং সেই অনুসারে সুরের যে চলন তাতে নাচের ইঙ্গিত রয়েছে স্পষ্ট। নিজের গান গাইতে গিয়ে তিনি যেভাবে স্বরপ্রক্ষেপ, উচ্চারণ ও 'ফ্রেজিং'-এর মধ্যে দিয়ে ছন্দটাকে খেলিয়ে দেন, ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন তা যে-কোনও গায়ক-গায়িকার পক্ষে অবশ্য-শিক্ষণীয় বলে আমার ধারণা।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সলিলদার গান শুনেছি আমার বাসায়। দেখতাম—কোনও একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজের গানের একটি লাইন গাইলেও তিনি কতটা নিষ্ঠা,কতটা একাত্মতার সঙ্গে গাইছেন। গানের ব্যাপারে কী দারুণ নির্লজ্জ তিনি। লাজলজ্জা, আড়ষ্টতা থাকলে অভিনয় ও গান অসম্ভব। গান মানেই তো অভিনয়, অভিব্যক্তি।

একাধিক ব্যাপারে সলিল চৌধুরির সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়েছিল। বিশেষ করে একই গানে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত প্রকরণের ব্যবহার বিষয়ে। শিশুর সারল্যে তিনি বলেছিলেন—'এই ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি তো!' আধুনিক গানে 'কব' 'রব' 'চাহি' 'নাই'—এসব কেন? ক্রিয়াপদের এই প্রকরণ তো আমরা নিত্যদিনের মুখের কথায়, লেখায় ব্যবহার করি না। আর যদি-বা আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়র মতো শুদ্ধ ভাষা, ক্রিয়াপদের সাধু প্রকরণ গানে ব্যবহার করব বলেই ভাবি তো সেই গানে সেটাই নাহয় আগাগোড়া চালিয়ে যাই। সাধু ও চলিত দুটি প্রকরণই একই গানে ইচ্ছেমতো প্রয়োগ করলে সেটা যে উদ্ভট, সাযুজ্যহীন হয়। কই, আধুনিক গদ্যে তো আমরা এই মিশ্রপ্রয়োগ দেখি না। কেউ

যদি এইভাবে সাধু-চলিত প্রকরণ মিশিয়ে গদ্য লেখেন তো আমরা তা বরদাস্ত করব কি? তাহলে গানের বেলা অন্য মাপকাঠি কেন?

একসময়ে বাংলা পদ্যে এই মিশ্রপ্রয়োগ স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এখন তো আর বাংলা কবিতায় এটা দেখতে পাওয়া যায় না সচরাচর। তাছাড়া এককালে কী ছিল-না-ছিল, তার ভিত্তিতে আমরা আজ চলব কেন? এককালে তো বাঙালিবাবুরা ধুতিতে শার্ট গুঁজে, কোমরে বেল্ট লাগিয়ে, বুট জুতো পরে বেরতেন। এখন কি তা চলে?

আমার মনে হয়, আধুনিক কবিতায় ও গানে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ, প্রকরণ একই সঙ্গে প্রয়োগ করার রীতিটা অযৌক্তিক, অনাধুনিক। আমার সঙ্গে আলোচনায়, বিতর্কে সলিল চৌধুরি অন্তত আমার যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন।

নিউইয়র্কে ফিরে সলিলদা 'পুরোনো দিন' গানটি রচনা করেন। এক সন্ধেবেলা তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে ফোন করলেন। 'এই সুমন, নতুন গান বেঁধেছি, শোন দেখি কেমন লাগছে'— বলেই হৈ হৈ করে গানটা গাইতে শুরু করলেন।

বোধহয় নিউইয়র্ক অঞ্চলের কিছু বাঙালি গায়ক-গায়িকা সে-সময়ে নিজেদের খরচে সলিল চৌধুরির পরিচালনায় তাঁর গানের একটি ডিস্ক করেন। আমার প্রস্তাব মতো 'ঝঙ্কারো ঝঙ্কারো রুদ্রবাণীতারে সাম্য-শান্তি-রাগিণী' তাতে রেখেছিলেন সলিলদা। ডিস্কের খাপের পেছনে সলিল চৌধুরি সম্পর্কে আমার ছোট একটি লেখাও ছাপা হয়েছিল।

রেকর্ডিং-এ আমি ছিলাম না। কিন্তু প্রস্তুতিপর্বের মহড়ায় আমি একবার গিয়েছিলাম নিউইয়র্কে। এক আমেরিকান জ্যাজ-পিয়ানো শিল্পী কাজ করছিলেন সেই মহড়ায়। মনে আছে, সলিলদা লুঙ্গি পরে মাটিতে বসে। তাঁর সামনেই আমার দেওয়া কি-বোর্ড নিয়ে মাটিতে বসে আছেন সেই আমেরিকান শিল্পী। সলিলদা তাঁকে মিঞা কি টোড়ি রাগটি বোঝাচ্ছিলেন জ্যাজের কর্ড পরম্পরার সাহায্যে। জ্যাজে এমন সব কর্ড প্রয়োগ করা হয় যার অস্তিত্ব ইউরোপীয় মার্গ সংগীতে নেই। এগুলির স্বরসমষ্টিগত ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, মেজাজটাই আলাদা। পাশ্চাত্যের 'বারোক', 'ক্লাসিকাল' ও 'রোমান্টিক' যুগের সংগীত শুনে যাঁরা বেশি অভ্যস্ত তাঁদের কানে 'জ্যাজ'-এর কর্ড-পরম্পরা এবং সুরের গতিপ্রকৃতি বিসদৃশ ঠেকতে পারে।

কিন্তু 'ব্লুজ' ও 'জ্যাজ'-এ যে ' মোড'গুলি অর্থাৎ স্বরসমষ্টির যেসব মৌল -কাঠামো ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলির সঙ্গে ভারতের রাগরাগিণীর বরং মিল আছে। এক একটি 'মোড' এক একটি রাগের মতো। আমাদের দেশের মার্গ সংগীতশিল্পীদের মতো জ্যাজশিল্পীরাও ঐসব 'মোডে'র ভিত্তিতে স্বরবিস্তার, 'ইম্প্রোভাইজেশন' করে থাকেন।

আমার বরাবর ধারণা ছিল (সলিল চৌধুরির যন্ত্রানুষঙ্গ রচনার নমুনা শুনে শুনে) যে সলিলদার ওপর মোৎসার্ট ও বেঠোফেনের প্রভাবই বেশি। তিনি যে 'জ্যাজ'-এর কর্ড-কাঠামোর দিকটাও গুলে খেয়েছেন তা আমি জানতাম না।

ভারতীয় রাগসংগীত ও 'জ্যাজ'-এর কর্ডগুলিকে নিয়ে সলিল চৌধুরি সেদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপচারীর ভঙ্গিতে যা বললেন, যেভাবে সবকিছু বিশ্লেষণ করে, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে দেখালেন, আমার জীবনে তা একটা বড় শিক্ষা। 'জ্যাজ' ও 'ব্লুজ' নিয়ে ঘাঁটাঘাটি আমিও করেছি। আজও করি। কিন্তু সংগীতের তুলনামূলক আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় সলিল চৌধুরির যে ক্ষমতা সেদিন দেখেছিলাম তার সমতুল্য কিছু আমি অন্য কোথাও শুনিনি, পড়িনি।

সেই আমেরিকান পিয়ানো শিল্পী বোধহয় আমার চেয়েও চমৎকৃত হয়েছিলেন। সেই রাতে তিনি আমাকে নিয়ে বেরোলেন নিউইয়র্কে কিছু নামজাদা নৈশ 'জ্যাজ' ও 'ব্লুজ' ক্লাব দেখাতে। ঐ শহরে এমন কিছু ক্লাব আছে যেখানে প্রায় সারারাত গানবাজনা চলে। লোকে সেখানে যায়, কিছু পান করে আর প্রাণ ভরে গানবাজনা শোনে। সেই পিয়ানো শিল্পী নিজে তরুণ জ্যাজশিল্পী বলেই জানতেন জমাটি আসর ঠিক কবে কোথায় বসে। খুব ওয়াকিবহাল লোক না হলে এটা জানার কথা নয়।

তরুণ শিল্পীটি সমানে বলে গেলেন যে সলিল চৌধুরির মতো এমন তীক্ষ্ণ সংগীতের মেধা তিনি আর কারোর মধ্যে দেখেননি।

শুধু সেই একটি রাতে তিন-চারটি ক্লাবে ঘুরে ঘুরে যে জ্যাজ ও ব্লুজ আমি শুনে নিলাম তার প্রাণবন্ত উৎকর্ষ আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা। যে শিল্পীদের গান ও বাজনা সে-রাতে শুনে ছিলাম তাঁদের কারোরই নাম জানি না। কিন্তু কী তাঁদের দক্ষতা, মুন্সিয়ানা ও নিষ্ঠা। প্রত্যেকেই যেন ওস্তাদ। কৃষ্ণাঙ্গ গায়কদের মধ্যে এমন এক একটা কণ্ঠ থাকে যার তুলনা পাওয়া ভার।

একবার ওয়াশিংটনের কাছে একটি সাবওয়ে স্টেশনে শুনেছিলাম একজন কৃষ্ণাঙ্গিনী প্ল্যাটফর্মটা ঝাঁট দিতে দিতে ব্লুজ গাইছেন আপন মনে। কী দুর্দান্ত গলা, কী অনবদ্য তাঁর গানের মেজাজ!

একদল আমেরিকান তরুণ-তরুণী মাঝে মাঝে আমার ডেরায় আসতেন গান-বাজনা করবেন বলে। আমার ডেরা তো বাজনা আর যন্ত্রের রাজ্য। মনের আনন্দে তাঁরা গাইতেন, বাজাতেন। ছোট একটা ব্যান্ড ছিল তাঁদের। স্বপ্ন ছিল নাম করবেন, রেকর্ড করবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে তাঁদের মহড়া দেখতাম। কী অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা, লেগে থাকার ক্ষমতা। প্রতিটি গান একেবার নিখুঁত হওয়া চাই, নয়তো তাঁরা সন্তুষ্ট নন।

শুধু গানবাজনা করে আমিও সন্তুষ্ট ছিলাম না। ১৯৮২ সাল থেকে আমি প্রতি মাসে দেশ পত্রিকার জন্য একটি করে ফিচার পাঠানো শুরু করলাম। নাম দিলাম দূরের জানলা। অফিসে জানতে পেলাম যে আমরা 'ভোয়া'র বেতার সাংবাদিকরা নাকি বাইরে লিখতে পারব না। 'মানব মিত্র' নামে অগত্যা লেখা শুরু করলাম। ছদ্মনামে নেওয়ার আর-একটা কারণ: সুমন চট্টোপাধ্যায় নামে তখন আর একজন লিখছেন। তিনি আজও লেখেন।

সমর সেনকে চিঠি লিখে ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় লেখার অনুমতি চাইলাম। তিনি রাজি হলেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর জন্যেও নিয়মিত লিখতে শুরু করলাম—প্রধানত রাজনীতি বিষয়ে। এইভাবে সমর সেনের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রতি মাসেই তিনি অন্তত একটি চিঠি লিখতেন আমায়। আমি তাঁকে লিখতাম আরও ঘন ঘন। মিতভাষী সমর সেন লিখতেন ছোট ছোট চিঠি। তবু স্বল্প পরিসরেও যেন অনেক কথা বলে দিতেন তিনি। কদাচিৎ প্রাণের মনের কথা লিখে ফেলতেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই ছোঁয়ানো থাকত অনুচ্চ যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি। মাঝে মাঝেই লিখতেন: 'আজকাল সবকিছু বড় বেখাপ্পা, বিসদৃশ লাগে'। —একবার লিখেছিলেন :'আপনার কলকাতাপ্রীতিটা একটা বদ-অভ্যেস। ওটাকে ঝেড়ে ফেলে ওখানেই থেকে যান, হয়তো জীবনে আরও অনেক কাজ করে যেতে পারবেন।'

বাংলা গান নিয়ে আমার পরিকল্পনার কথাটা সমর সেনকে জানিয়েছিলাম। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি । সেটাই স্বাভাবিক,কারণ আমার সংগীত শিক্ষার দিকটা তিনি তখনও তেমন জানতেন না।

ফ্রন্টিয়ার ও দেশ পত্রিকার জন্য লেখা ছাড়াও অন্য দুটি বড় মাপের লেখার প্রস্তুতি আমি নিতে শুরু করি ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি থেকেই। আধুনিক বাংলা গানের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে গবেষণামূলক কাজ বিনয় ঘোষের সহায়তায় ও নির্দেশে আমি করতে চেয়েছিলাম ১৯৮০ সালে, বিনয়বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে তা একটুও এগোতে পারেনি কলকাতায়। চিন্তাটাকে তাই বলে বাতিল করে দিইনি। আমেরিকায় গিয়ে আমি মাস ছয়েকের মধ্যেই শিল্পের সমাজতত্ত্ব, সংগীতের সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান পরামর্শ পেতাম। তিনি না থাকায় আমাকে একা একা হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হল।

সলিল চৌধুরি কাজের ওপর লেখার ইচ্ছে আগেই ছিল। কিন্তু পরে মনে হল শুধু সলিল চৌধুরির ওপর লিখে লাভ নেই। আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাসই তো লেখা হয়নি এখনও। সলিল চৌধুরির কাজগুলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আধুনিক বাংলা গানের বিবর্তনটা আগে খতিয়ে দেখা দরকার। গানের কথা, সুর তাল, যন্ত্রানুষঙ্গ—সামগ্রিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সাহিত্য সমালোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় যতটা অগ্রগতি হয়েছে, সংগীতের ক্ষেত্রে তা বলতে গেলে কিছুই হয়নি। সংগীত, গান বা বাজনা বিশ্লেষণের ভাষাই তৈরি করে উঠতে পারিনি আমরা। এর পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা পরিষ্কার নয়।

গান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা কথা বা লিরিক নিয়ে কথা বলি বেশি। সাধারণ শ্রোতার পক্ষে অবশ্য কথা, সুর কাঠামো নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ একটা জায়গার পর আর সম্ভব নয়। এটা তাঁদের কাজও নয়। এটা সংগীত সমালোচকদের দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ সংগীত সমালোচকের প্রবণতা বিবৃতি দেওয়া এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ভালো-লাগা খারাপ লাগার ভিত্তিতে দুম করে কিছু চরম মন্তব্য করার দিকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে, বিশ্লেষণ করে তাঁদের সেইসব মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের যুক্তি দেখানোর দায় তাঁদের আছে বলে মনে হয় না।

সুর, তাল, ছন্দ, আঙ্গিক, কাঠামো যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি একান্ত জরুরি। পাশ্চাত্যে এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজ হয়েছে, যদিও সবাই সব ব্যাপারে একমত নন।

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সালে গোড়ার দিক পর্যন্ত আমি সংগীত বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং সংগীতের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যাই। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমি প্রচুর খোরাক পেয়েছি জার্মানির দুই ভাবুক ও লেখক থেয়োডোর আডোর্নো আর মাক্স্ হর্কহাইমারের যুগ্ম সম্পাদনায় সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা-পত্রিকায়।

আডোর্নো ও হর্কহাইমার দুজনেই মার্কসবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা আমেরিকায় পালিয়ে যান। পত্রিকাটি প্রথমে জার্মানিতেই বেরোচ্ছিল। পরে তা আমেরিকাতেও ছাপা হয়।

আডোর্নো আবার দস্তুরমতো পিয়ানো ও কম্পোজিশন শিখেছিলেন আর্নোল্ড শ্যোনবার্গের কাছে। অর্থাৎ তিনি হান্স্ আইজলারের গুরুভাই। দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী আডোর্নো তাই সংগীতের ব্যবহারিক, প্রয়োগ সম্বন্ধীয় দিকগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করে তবেই সংগীত বিষয়ে লিখেছেন।

আপশোশের বিষয় হল, খুব কম মার্কসবাদী ভাবুক, সংগীতের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে লিখেছেন আদৌ। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে সংগীতের সমাজতত্ত্ব পাশ্চাত্যেও একটি উপেক্ষিত ও এড়িয়ে যাওয়া বিষয়। গেয়র্গ লুকাচ নন্দনতত্ত্ব নিয়ে লেখা তাঁর বিশাল গ্রন্থে সংগীতকে প্রায় স্থান দেননি বলাই ভালো। হ্যবার্ট মারকুজে তো নন্দনতত্ত্ব নিয়ে লিখতে গিয়ে সরাসরি স্বীকারই করেছেন যে তিনি সংগীত নিয়ে লিখছেন না। আর্নেল্ড হাউসার অবশ্য তাঁর *সোসিয়োলজি অফ আর্ট* গ্রন্থে 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' এবং আধুনিক সংগীতকেও স্থান দিয়েছেন।

সংগীতের কাঠামো বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্যে যে-সব বই লেখা হয়েছে, সেগুলি নবং সংখ্যায় ঢের বেশি। পাশ্চাত্যের সংগীতকাররা অনেকে বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, নিদেনপক্ষে সংগীত বিষয়ে প্রচুর চিঠিপত্র। সেগুলির সংকলন থেকে অনেক কিছু জানা যায়।

এইসব বিভিন্ন উৎস থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমি আমার ঝোলা ভরতে লাগলাম। এই ব্যাপক অধ্যয়ন সংগীত ও সমাজ সম্পর্কে আমার বোধবুদ্ধিকে পুষ্ট করেছে।

১৯৮২ সালে আমি আমার স্মৃতির ভিত্তিতে বাংলা আধুনিক গানের একটি বিশ্লেষণমূলক বিবরণ লিখতে শুরু করি। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক গানের কথা, সুর কাঠামোর বিবর্তন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে এগিয়েছে তার হদিস নেওয়া। এই কাজটি আমি ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছি।

১৯৮৩ সাল- নাগাদ আমি ঠিক করলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-সব প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক, শিল্পী, ভাবুক, ট্রেড ইউনিয়নকর্মী বিস্তর বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কাজ করে চলেছেন, তাঁদের কয়েকজনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেব। এই সাক্ষাৎকারগুলির একটি সংকলন বের করব দেশে ফিরে গিয়ে। নাম দেব অন্য আমেরিকা।

আমাদের দেশের অনেক প্রথম সারির সাংবাদিক, লেখক আমেরিকায় যান, সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। কিন্তু সেখানকার প্রতিষ্ঠানবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, সে-সম্পর্কে বাংলা ভাষায় লেখেন ক'জন? ফলে আমাদের দেশের অনেক মানুষ আমেরিকা সম্পর্কে কখনওই একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাচ্ছেন না। ভাসাভাসা কিছু ছবি, একপেশে কিছু অভিমত, অলীক অবাস্তব সব ধারণাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক সম্বল।

ভাষাবিজ্ঞানী, মার্কিন সরকারের নীতির প্রবল সমালোচক নোম চমস্কিকে আমি প্রথম চিঠি লিখি। তিনি প্রচুর উৎসাহ দিলেন। ১৯৮৪ সালে আমি বস্টন শহরের ম্যাসচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে গিয়ে নোম চমস্কির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।

এইভাবে আড়াই বছর প্রচুর খাটাখাটনি করে আমি যাঁদের সাক্ষাৎকার নিতে পারলাম তাঁরা হলেন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি, লেখক হ্যারি ম্যাক্ড্ফ্, কবি-নাট্যকার-নাগরিক অধিকার সংগ্রামী লিরয় জোন্স বা আমিরি বরাকা, ভাষাবিজ্ঞানী নোম চমস্কি, নোবেল-বিজেতা রসায়নবিদ জর্জ ওয়াল্ড, র‍্যাডিকাল নাট্যকর্মী ম্যাক্সিন ক্লাইন, সমাজসচেতন গায়িকা হলি নিয়ার, নাগরিক অধিকার সংগ্রামী ও লেখিকা

মায়া এন্‌জেলু, নারী অধিকার সংগ্রামী লেখিকা বারবারা এয়রেনরাইখ, মার্কসবাদী অধ্যাপক ও লেখক বারটেল ওল্‌ম্যান, লেখিকা অ্যানেট্‌ রুবিনস্টিন, গানের কারিগর ও গায়ক পীট সীগার।

এঁরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তবু আমার মতো একজন অর্বাচীনকে এঁরা যে সময় ও সাহস দিয়েছিলেন এবং যে-ভাবে সাহায্য করেছিলেন, তা জীবনে ভোলার নয়। সাক্ষাৎকারগুলি ছিল—একমাত্র আমিরি বরাকার ক্ষেত্র ছাড়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে অনেককেই তাঁদের হয়ে-ওঠা, কাজকর্ম, রাজনৈতিক মতামত, মার্কিন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা, নানারকম সমস্যার কথা বলিয়ে নিয়েছিলাম। এ অতি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু কেউই অধৈর্য হননি। অনেকেই সাক্ষাৎকারের আগে তাঁদের লেখা বইপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার কাছে। আমাকে দিয়েও বিস্তর কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা, যাতে সাক্ষাৎকারটা ভালো হয়।

অন্য আমেরিকার কাজটা করতে গিয়ে কারোর কারোর সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বিশেষ করে পীট সীগারের সঙ্গে। এই সম্পর্ক আমাদের মধ্যে আজও রয়ে গিয়েছে। ১৯৯২ সালে পীট সীগার তাঁর আত্মজীবনী লেখা শেষ করার পর টাইপস্ক্রিপ্টটা সমালোচনার জন্য পৃথিবীর চারদিকে জনা দশ-বারো ব্যক্তির কাছে 'জেরক্স' করে পাঠান। আমিও ছিলাম তাঁদের একজন। আমার মতো একজন মানুষ যে কিনা ঐ বিরাট সংগীতকারের নখেরও যোগ্য নয়, তারও মতামত যিনি জীবনসায়াহ্নে চাইতে পারেন তিনি যে কোনও স্তরের মানুষ তা অনুমান করা কষ্টকর হতে পারে না। পীট সীগার ছিলেন নিউইয়র্ক রাজ্যের 'বিকন' নামে এক ছোট্ট শহরে। আমি ছিলাম মেরিল্যান্ড রাজ্যের সিলভার স্প্রিং-এ। মাঝখানে বিশালদূরত্ব। নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ ছিল অসম্ভব। তাই বেশিরভাগ কথাবার্তা,মত বিনিময় চলত টেলিফোনে আর চিঠিতে।

রাতে টেলিফোন করলে অতটা খরচ হয় না, তাই আমাদের আলাপ-আলোচনা সাধারণত শুরু হত রাত বারোটার পর। মাঝে মাঝে ভোর চারটে পর্যন্তও আড্ডা দিতাম আমরা। পীট ঠিক আমার মতোই আড্ডাবাজ। থেকে-থেকেই গান গেয়ে উঠতেন টেলিফোনে। একবার তিনি 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

পীট সীগার কিভাবে গান লিখেছেন, সুর করেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে সব কথা জেনে নিতাম তাঁর কাছে। জেনে নিতাম তাঁর বন্ধু, লোকসংগীত শিল্পী উডি গাথ্‌রির কথা। উডি গাথরি নাকি সবসময়ে ছোট একটি টাইপরাইটারে গান লিখতেন। প্রতিটি গানের কার্বন কপি রাখতেন।

গান লেখার ব্যাপারে বিরাট উৎসাহ দিতেন পীট। বলতেন—'যে কোনও বিষয় নিয়ে লিখতে চেষ্টা করো। কোনও কিছুকে বাদ দিও না। গান লেখো সাধারণ ভাষায়। 'হিউমর', যেন থাকে। 'হিউমর' রঙ্গরসিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলতেন পীট সীগার। আর বলতেন—'দেখো, গান লিখতে লিখতে হঠাৎ দেখবে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, সমস্যা এসে পড়ছে পথ পাচ্ছ না। তখন কিন্তু সবচেয়ে সরল, সহজ,স্বাভাবিক সমাধানের পথটাই ধরতে চেষ্টা করো।'

বব্‌ ডিলানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পীট সীগারই আমায় বললেন—ও চেষ্টা বৃথা। ডিলানের একটা গোপন ঠিকানাও তিনি দিলেন। তবে বলে দিলেন—'উত্তর কিন্তু পাবে না।' তাঁর কথা ফলে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক মতবাদ প্রসঙ্গে পীট সীগার বলেছিলেন যে, এককালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টির গোঁয়ার্তুমি ও স্তালিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখে তিনি ও পথ ত্যাগ করেন। বারবার বলতেন— 'দ্যাখো কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে 'ইজম' ব্যাপারটাতেই ঘেন্না ধরে গিয়েছে।' শান্তভাবেই বলতেন পীট সীগার এসব। একবার তিনি বলেছিলেন, 'মানুষ ও জীবজগৎটাকে যদি বাঁচাতে হয় তো শেষমেষ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে কট্টরপন্থার রাস্তা ছেড়ে কোথাও একটা আপস করতে হবে।' এককালে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে যেসব কাজ বেরিয়ে এসেছিল, তার কিছু কিছু নমুনা পীট সীগারের শোনা ছিল। একবার তিনি আমায় হারীন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'দইওয়ালা'র বেশ খানিকটা শোনান। মূল কবিতাটি ইংরেজিতেই ছিল।

সলিল চৌধুরি আমেরিকা থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার পর পীট সীগারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নয়তো সলিলদাকে যে-করে হোক পীটের কাছে নিয়ে যেতাম।

১৯৮১ সাল থেকেই তাল করছিলাম নিকারাগুয়া যাব। এই লক্ষ্যে বারবার চিঠি লিখছিলাম নিকারাগুয়ার সংস্কৃতি দপ্তরে। কিন্তু উত্তর আসছিল না। পীট সীগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন— 'হাল ছেড়ো না। নিকারাগুয়ার সংস্কৃতিমন্ত্রী কবি এর্নেস্তো কার্দেনাল আমার বন্ধু। তাঁকে লেখো। আমিও একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

দুটি চিঠি একসঙ্গে পাঠালাম। এর্নেস্তো কার্দেনাল উত্তর দিলেন। শুধু তাই নয়, আমার প্রস্তাবের প্রতি মর্যাদা দিয়ে তিনি আমায় আমন্ত্রণ জানালেন নিকারাগুয়ায়। পীট সীগার আমায় সাহায্য না করলে নিকারগুয়া সফর আদৌ সম্ভব হত কিনা কে জানে।

আমেরিকার নবীন গানের কারিগর ও কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে হলি মিয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। হলি অপেরা আঙ্গিকে প্রশিক্ষণ নিয়েও ধ্রুপদী সংগীতের পেশা ছেড়ে বামপন্থী, নাগরিক অধিকার সংগ্রামী ও নারীমুক্তিবাদীদের দলে মিশে যান। নিজের গান তিনি নিজেই লেখেন, তাতে সুর দেন।

হলি মিয়ার আমাকে প্রথম বলেছিলেন 'নিউ সং' আন্দোলনের কথা। লাতিন আমেরিকার বামপন্থী আন্দোলনগুলির বাতাবরণ থেকে 'নিউ সং' বেরিয়ে আসে। মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, তার চিন্তাভাবনা থেকে এমন গান লিখুক যা তার বাস্তবজীবনে প্রাসঙ্গিক —এই হল 'নিউ সং' আন্দোলনের দাবি। অমরত্ব, স্থায়ী মূল্য—এসবের প্রত্যাশা 'নিউ সং' করে না। সুর, আঙ্গিক ও যন্ত্রানুষঙ্গের ক্ষেত্রে 'নিউ সং' লোকসংগীতের চেয়ে আরও উদার ও নিরীক্ষাপ্রবণ। প্রচলিত সুর, ভিনদেশি সুর, 'রক্', 'পপ', 'ব্লুজ','জ্যাজ'— যে কোনও আঙ্গিক এতে ব্যবহার করা যেতে পারে, বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এতে সম্ভব।

যন্ত্রানুষঙ্গের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের লোকসংগীত দীর্ঘকাল রক্ষণশীল ছিল। বব ডিলান যেদিন প্রথম 'অ্যাকুস্টিক' গিটার ছেড়ে ইলেকট্রিক গিটার হাতে মঞ্চে ওঠেন, দর্শকরা সেদিন দুয়ো দিয়েছিলেন তাঁকে।

'নিউ সং' আন্দোলন কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঢের বেশি সহিষ্ণু, উদার। কিউবার সিলভিয়ো রদ্‌রিগেস নিয়মিত সিন্‌থেসাইজার ব্যবহার করেছেন। নিকারাগুয়ার 'মান্‌কোতাল' শিল্পীগোষ্ঠীও ব্যবহার করেছেন একাধিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

হলি মিয়ারের কথা মতো আমি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন 'নিউ সং' শিল্পীর গানবাজনা শুনতে আরম্ভ করি। এঁদের কাজ, প্রয়োগ পদ্ধতি আমার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। লাতিন আমেরিকান শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের রচনা ও গান আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, ভিকতর হারা তাঁদের অন্যতম। তেমনি মের্সেদেস সোসা, 'ইন্‌তি ঈমানি' শিল্পীগোষ্ঠী এবং আফ্রিকার গায়িকা মিরিয়ম মাকিবার গানও আমায় নাড়া দিয়েছে যথেষ্ট।

আমেরিকায় আমি 'মাল্টিট্র্যাক্ রেকর্ডিং'-এ সড়গড় হয়ে ঘরে বসেই আমার রচনাগুলি রেকর্ড করতে থাকি। নিজেই গাইছি, নিজেই বাজাচ্ছি। নিজের গানের সঙ্গে নিজেই অর্কেস্ট্রা জুড়ে দিচ্ছি। নেশা ধরে গিয়েছিল। সিন্‌থেসাইজার যন্ত্রটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শুরু হয় ১৯৮২ সালে।

আমার খুব কষ্ট হয় যখন শুনি আমাদের দেশে এখন যে-কোনও ইলেকট্রনিক কি-বোর্ডকেই লোকে 'সিন্‌থেসাইজার' বলে। এটা সম্পূর্ণ ভুল।

সিনথেসাইজার হল এমন একটা যন্ত্র যা মানুষকে বিভিন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গ এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক উপাদান নিজের ইচ্ছে অনুসারে মিশিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। প্রচলিত যন্ত্র নকল করা সিন্‌থেসাইজারের একমাত্র কাজ নয়। 'অ্যাকুস্টিক' যন্ত্রে বা প্রচলিত যন্ত্রে সম্ভব নয় এমন ধ্বনি সৃষ্টি করাও সিনথেসাইজারের একটা বড় কাজ।

আমি যখন আমেরিকায় যাই 'ডিজিটাল সিন্‌থেসাইজার' তখনও বেরোয়নি। তখনও বাজারে শুধু 'অ্যানালগ সিন্‌থেসাইজার' পাওয়া যেত। এই যন্ত্রটি ব্যবহার করলে, ঘাঁটাঘাঁটি করলে 'ইলেকট্রনিক সিন্‌থেসিস' বা একটু একটু করে ধ্বনি সৃষ্টির ব্যাপারটা খুব ভালো শেখা যায়। এই শিক্ষা আমার খুব কাজে লেগেছে।

বিভিন্ন যন্ত্রশিল্পীর সহায়তায়, বইপত্র ঘেঁটে এবং নিজে নিজে প্রচুর কাজ করে অর্কেস্ট্রেশন আর ইলেকট্রনিক সংগীতের প্রয়োগ—এই দুটি ক্ষেত্রে আমি আমেরিকাতেই মোটামুটি হাত পাকিয়ে ফেলি।

বাড়িতে বসে বসে অবসর সময়ে আমি ইলেকট্রনিক কি-বোর্ড, সিন্‌থেসাইজার ও মাল্টিট্র্যাক রেকর্ডারের সাহায্যে ছোট ছোট যন্ত্রসংগীতের টুকরোও রচনা ও সৃষ্টি করতাম। ভয়েস অফ আমেরিকার একাধিক বিভাগে এগুলি ব্যবহার করা হত। এজন্য অবশ্য পারিশ্রমিক পেতাম না। কাজটা করতে ভালো লাগত তাই করতাম।

আমেরিকায় তৈরি কিছু গান রেকর্ড করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যাতে 'নাগরিক'-এর ছেলেমেয়েরা তুলে নিতে পারে। আমার গানের কোনও আলাদা অনুষ্ঠান আমি আমেরিকায় করিনি। তবে বন্ধু-বান্ধবদের ঘরোয়া আসরে মাঝে মধ্যে গাইতাম। রাজ্যের আধুনিক গান গেয়ে যেতাম একনাগাড়ে। কখনও-সখনও নিজের দু'একটি রচনাও গেয়ে দিতাম। লোকে পছন্দ করত। দেখতে পেতাম অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরাই যেন আমার তখনকার রচনাগুলো বেশি পছন্দ করছে। সহকর্মীদের ছেলেমেয়েরা খুব উৎসাহ দিত আমায়।

১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকে আমি ভয়েস অফ আমেরিকায় পদত্যাগ করি। ইচ্ছে করলে বাকি জীবনটা ওখানেই কাটিয়ে দিতে পারতাম। সকলেই আমায় পাগল ঠাউরেছিল। আমেরিকার পাকা চাকরি ছেড়ে গানবাজনা করবে বলে দেশে ফিরবে? বলো কি?

যথাসময়ে আমার মালপত্র সব মার্কিন সরকারের খরচে জাহাজে তুলে দিলাম। মালপত্র বলতে কয়েকশো বই আর শুধু যন্ত্র, যন্ত্র, যন্ত্র। হরেকরকম কি-বোর্ড ও সিন্‌থেসাইজার ছাড়াও একটা পুরোদস্তুর স্টুডিয়ো গড়তে গেলে যা যা দরকার হয়, সবই কিনে ফেলেছিলাম আমি। প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমেরিকায় চাকরি

করে যা রোজগার করেছিলাম তার ৯০% ঢেলেছিলাম যন্ত্রপাতি কেনায়। কিছু জমাইনি। কয়েক মাস ছুটি জমানো ছিল। চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর তারই বিনিময়ে টাকা পেয়েছিলাম। সেটাই ছিল সম্বল।

এর্নেস্তো কার্দেনালের আমন্ত্রণপত্র হাতে করে, ক্যাসেট রেকর্ডার, প্রচুর ক্যাসেট, ফিল্ম আর ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে আমি ওয়াশিংটন থেকে নিকারাগুয়া পাড়ি দিলাম। সেকি উত্তেজনা আমার। বিপ্লব দেখব। নিকারাগুয়ার বিপ্লবটাকে বুঝতে চেষ্টা করব। বিপ্লবের ওপর বই লিখব বাংলায়।

যাবার আগে পীট সীগারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বিদায় নিতে গেলাম পীট ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে। একটা গোটা দিন কাটালাম তাঁদের সঙ্গে।

নিকারাগুয়া থেকে কলকাতায় ফিরেই তেড়েফুঁড়ে লেগে গেলাম 'নাগরিক' -এর কাজে। বন্ধুদের বলে গিয়েছিলাম যে পাঁচ বছরের মধ্যে যন্ত্র নিয়ে ফিরব। আমার অনুপস্থিতিতে বন্ধু সুভাষ বাগচির নেতৃত্বে 'নাগরিক' কোনওক্রমে টিকে ছিল। সুভাষ নিজে সংগীত শিল্পী নয়, তবু ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল দলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

আমি ফেরার পর নতুন পুরোনো মিলিয়ে অনেকে এলেন। যন্ত্রের অভাব নেই তখন। বেশ শোরগোল করেই মহড়া শুরু হল।

নতুন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কৌশিক দত্ত (গিটার),তাঁর স্ত্রী মধুঋতা (কণ্ঠ), অলোকেশ রায় (ড্রামস) এবং আরও অনেকে।

বেবি ততদিনে পেশাদার কি-বোর্ড শিল্পী হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠান থাকলে ও আর মহড়া দিতে পারত না। কি-বোর্ডের দিকটা আমার ওপরেই এসে পড়ল।

একের পর এক নতুন গান লিখতে শুরু করলাম আমি। গানগুলি তখন বাঁধছিলাম কিন্তু 'নাগরিক'-এর ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রেখে। অর্থাৎ ধরেই নিচ্ছিলাম যে এই গানগুলো সমবেত কণ্ঠে, পার্ট ভাগ করে গাওয়া হবে। ওই লক্ষ্যটা সামনে থাকায় আমার গানের আঙ্গিকও হচ্ছিল অনুরূপ। তবে তারই মধ্যে আমি এমন কিছু গান বাঁধছিলাম যেগুলো একাও গাওয়া যায়। যেমন 'এ ভাঙা শহরটায়'।

নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপব মুক্ত নিকারাগুয়া বইটা লেখা, অন্য আমেরিকার সাক্ষাৎকারগুলো টেপ শুনে শুনে লিখে ফেলা ছাড়া সময় যা পাচ্ছিলাম তার সবটাই দিচ্ছিলাম গান বাঁধার কাজে। মুক্ত নিকারাগুয়ার পাণ্ডুলিপি শেষ হবার সারা দিন তো বটেই কখনও কখনও সারা রাত কেটে যাচ্ছিল গান বাঁধতে বাঁধতে, গান নিয়ে আলোচনায়।

মহড়ার ওপর খুব জোর দিতাম আমি। উচ্চারণ, স্বর প্রক্ষেপ, উপযুক্ত

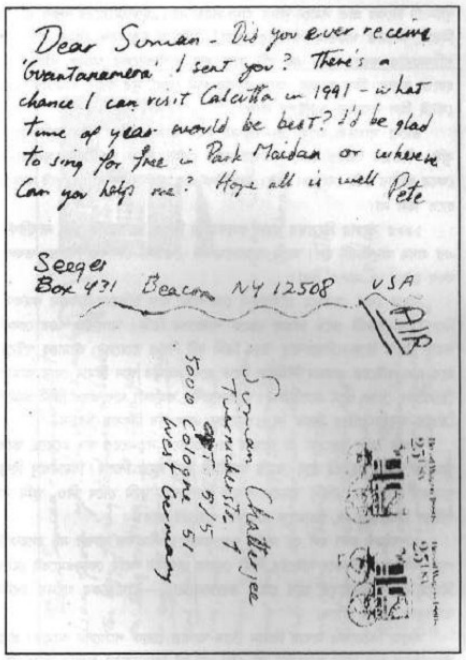
Dear Suman - Did you ever receive 'Guantanamera' I sent you? There's a chance I can visit Calcutta in 1991 - what time of year would be best? I'd be glad to sing for free in Park Maidan or wherever. Can you help me? Hope all is well Pete

Seeger
Box 431 Beacon NY 12508 USA

Suman Chatterjee
Turnhalleste. 7
5000 Cologne 51
West Germany

কোলনে সুমনকে লেখা পীট সীগারের চিঠি

আবেগ দিয়ে গাওয়া, গানের কথা মুখস্থ রাখা, একসঙ্গে গান ধরা ছাড়া—প্রতিটি খুঁটিনাটি দিকের প্রতি সমানে নজর রাখা সহজ নয়। ছেলেমেয়েদের দারুণ খাটিয়ে নিতাম, নিজেও খাটতাম পাগলের মতো। সেইসঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গ কেমন হবে, সে পরিকল্পনাও করতে হত। এই দুটি কাজ বৃন্দ সংগীতদলের অনেক পরিচালকই হয়তো করেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আবার গান লেখা, সুর করার কাজটাও ছিল। সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ভালো সংগঠক আমি কোনওদিনই নই। আমি সংগীত, গান বুঝি,বাজনা বুঝি। কীভাবে গাইতে হবে, বাজাতে হবে সেটাও বুঝি মোটামুটি। সংগঠনের ক্ষেত্রে আমার সেই যোগ্যতা নেই। 'নাগরিক'-এর সাংগঠনিক দায়িত্ব তাই আমার হাতে ছিল না।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বিড়লা একাডেমি হলে নাগরিক'-এর প্রথম অনুষ্ঠানটি হল। আমি বাজালাম কি -বোর্ডস, কৌশিক গিটার। তবলা, কংগ ড্রামস ও নালও ছিল।

বিমান ঘোষ সেসময়ে গ্রামাফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার একজন কর্মকর্তা ছিলেন। অনুষ্ঠানটি দেখে আমায় ডেকে পাঠালেন তিনি। 'নাগরিক '-এর রেকর্ড করার প্রস্তাব দিলেন বিমানবাবু, তবে তিনি দুটি শর্তও রাখলেন: আমাকে গাইতে হবে এবং বাইরের একজন শিল্পীকে নিতে হবে। আমার গান বিমান ঘোষ আমার ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছিলেন। আকাশবাণীর কর্মকর্তা থাকাকালে তিনি আমার বেতার অনুষ্ঠানগুলিও নিয়ম করে শুনতেন এবং খুব উৎসাহ দিতেন।

বিমান ঘোষ বললেন যে আমার রচনাগুলিতে নতুনত্বের স্বাদ রয়েছে, তবে আমাকে নাকি গাইতেই হবে। আমি যথারীতি তর্ক জুড়ে দিলাম। বিমানবাবু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সমানে বলতে লাগলেন 'তুমি দেখে নিও, তুমি না গাইলে ঠিক হবে না, তোমাকে একদিন গাইতেই হবে।'

শেষমেশ রফা হল যে আমি শুধু বাজনায় সীমাবদ্ধ থাকব না, কয়েকটি গানে গলাও দেব। তবে বাইরের শিল্পী নেবার প্রস্তাবটা আমি কোনওমতেই মেনে নিলাম না। বিমানবাবুও আর জোর করলেন না। —নাগরিকের গানের একটা তালিকাও দিলাম তাঁকে।

সপ্তাহ তিনেকের মাথায় বিমান ঘোষ আবার ডেকে পাঠালেন আমায়। প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে তিনি জানালেন যে এইচ এম ভি বিমানবাবুর প্রস্তাবে রাজি নয়। পরীক্ষামূলক বাংলা গানের ব্যাপারে কর্তাদের তেমন উৎসাহ নেই।

বোধহয় ১৯৮৭ কি ১৯৮৮ সালে আধুনিক বাংলা গানের ওপর বিমান ঘোষের একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকায়। তাতে তিনি নতুন

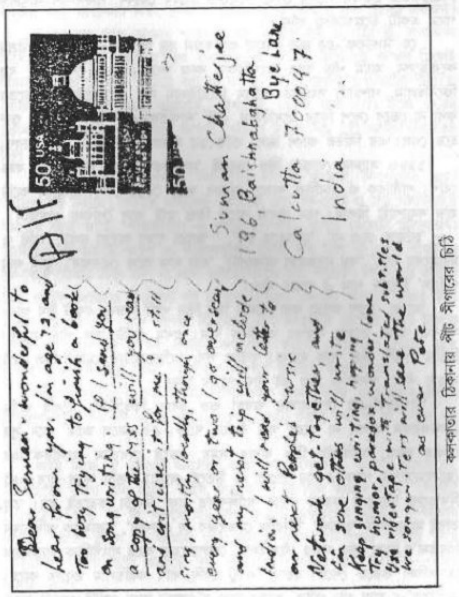

কলকাতার ঠিকানায় পল্টু সীগারের চিঠি

প্রজন্মের আধুনিক সুরকারদের মধ্যে রামানুজ দাশগুপ্ত, জয়ন্ত বসু, 'নগর ফিলোমেল'-এর পাশাপাশি 'নাগরিক' ও আমার নাম উল্লেখ করতে ভোলেননি। জয়ন্ত বসু নিঃসন্দেহে খুব উদ্ভাবনশীল এক সুরকার। আর 'নগর ফিলোমেল' শিল্পীগোষ্ঠীর গৌতম নাগের লেখা 'বিজনের চায়ের কেবিন' সমকালীন আধুনিক গানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যে 'নাগরিক'-এর জন্য আমার কয়েকজন বন্ধু কয়েকবছর অনেক পরিশ্রম করেছিলেন, আমি পাঁচ বছর আমেরিকায় কাজ করে খেয়ে-না-খেয়ে শুধু যন্ত্র কিনেছিলাম, পাশ্চাত্য সংগীতে তালিম নিয়েছিলাম সব ছেড়েছুড়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে দেশে ফিরে এসেছিলাম, সেই 'নাগরিক'-এ নানান গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল একটা বড় কারণ।

১৯৮৬ সালের গোড়ার দিক থেকেই 'নাগরিক' দুলতে শুরু করল বড্ড বেশি। শারীরিক ও মানসিক কারণে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। কিছুদিন আমি প্রায় শয্যাশায়ী ছিলাম। গান বাঁধার কাজে কিন্তু তাই বলে শৈথিল্য দেখাইনি।

'হারিয়ে যেও না', 'তোমাকে চাই', ' আরো বলো আরো কথা', 'মাছি'ও মরামুখের গান,' 'বড় নাজেহাল আকাশটা', 'ধরা যাক আজ রোববার', 'তুমি গান গাইলে' ইত্যাদি গান ঐ সময়ে বাঁধা।

'আরো বলো আরো কথা' গানটি ছিল তিন পর্বে বিভক্ত একটি দীর্ঘ গান। সম্ভবত বাংলা ভাষায় দীর্ঘতম আধুনিক গান। প্রথম পর্বটি ছিল পাঁচ মাত্রায়। দ্বিতীয় পর্বটি ছিল সাত মাত্রায়। তৃতীয় পর্ব, 'গড়িয়াহাটার মোড়' ছিল আট মাত্রায় বাঁধা। কলকাতা ছিল এই দীর্ঘ গানের বিষয়।

'নাগরিক'-এর দোদুল্যমান অবস্থা শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই আমি কোনওরকম আপস না করেই গান বাঁধতে থাকি। এর আগে আমি গানে সুর দেবার সময়, আঙ্গিকটা ঠিক করার সময়, ভেবে দেখতাম 'নাগরিক'-এর ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ-গান গাওয়া ও উতরে দেওয়া কতটা সম্ভব হবে। এই দিকগুলো বিবেচনা করতে গেলে আঙ্গিকগত রফা কিছুটা করতেই হয়। তবু তারই মধ্যে আমি 'ভূপাল', 'তিরিক্ষি মেজাজের যে লোকটা', 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'র মতো দুরূহ গানও বেঁধেছিলাম, ছেলেমেয়েরা যাতে সাংগীতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে শেখে। হয়তো একটু বেশি দাবি করছিলাম তাদের কাছে। 'নাগরিক'-এ যারা গান গাইত, তাদের মধ্যে দু'একজন বাদে কেউই কণ্ঠচর্চা করত না। একসময়ে আমি 'নাগরিক'-এ কণ্ঠচর্চা, সরগম অনুশীলনের তালিমও শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে কেউ রেওয়াজ করত না বোধহয়। আমার ধারণা, আমাদের দেশে অধিকাংশ বৃন্দসংগীত দলের সমস্যা এটা।

১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ দেখা গেল 'নাগরিক'-এর অনেক পুরোনো শিল্পী চলে গেছেন, এসে পড়েছেন কয়েকজন নতুন শিল্পী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'রিদ্‌ম্ গিটার' বাদক ধ্রুব রায়। দল বেঁধে গানবাজনা করতে গিয়ে যে অল্প ক'জন ব্যক্তির মধ্যে সত্যিকার নিষ্ঠা, শেখা ও খাটার ইচ্ছে দেখেছি, ধ্রুব তাঁদের একজন।

নবাগতদের মধ্যে আমার পুরোনো বন্ধু কল্লোল বসু ও তাঁর স্ত্রী, সুগায়িকা নিবেদিতাও ছিলেন। আমরা ঠিক করলাম, যে ক'জন আছি সে ক'জন মিলেই আমার গানগুলো গেয়ে বাজিয়ে ক্যাসেট করব। আমার বাবা-মার গড়িয়ার বাড়িতে দোতলায় আমি যে ঘরে থাকতাম, সেখানেই রেকর্ড করা হল। ইচ্ছে করেই কোনও স্টুডিয়ো ভাড়া করিনি আমরা। ভালো ভালো যন্ত্র তো আমার নিজেরই ছিল।

গানগুলি গাইলেন মধুঋতা, নিবেদিতা, গীতশ্রী, কল্লোল, শিবশংকর, জয়। আমিও কণ্ঠ দিলাম। গিটারে থাকলেন কৌশিক, ধ্রুব, কি-বোর্ড ও সিন্‌থেসাইজারে কিশোর আর আমি, 'পারকাশান'-এ কপাদ (পপাই), পপাই ছেলেটি অসাধারণ। 'নাগরিক'-এ বাজাত কঙ্গো ও পারকাশান। ভীষণ শখ ছিল কী-বোর্ড বাজাবে। কি-বোর্ড কেনার টাকা ছিল না বলে হারমোনিয়মে হাত পাকাত। পিয়ানোর তালিম নিত পপাই। বাড়িতে কি-বোর্ড দুই হাতের আঙুলে চালানো অভ্যেস করার জন্য একটা বড় কাগজে প্রমাণ মাপের কি-বোর্ড এঁকে নিয়েছিল ছেলেটা। যার ইচ্ছের জোর এত, সে একদিন-না একদিন লক্ষ্যভেদ করবেই। দীর্ঘকাল লড়াই করে পপাই আজ কি-বোর্ড শিল্পী হিসেবে সংগীতের বাজারে করে খাচ্ছে।

অনেকদিন আগে এক রোমান দার্শনিকের একটি উক্তি পড়েছিলাম:'প্রথমে নিজেকে বলে নাও কী করতে চাও। তারপর, সেটা করার জন্য যা যা করতে হয় করো।'

আমি নিজে ঐ উক্তিটি অনুসরণ করে বেঁচে থেকেছি। আমার ইচ্ছেমতো, পছন্দমতো বাংলা গান বাঁধব, গাইব, বাজাব— এই ছিল আমার লক্ষ্য। সেখানে পৌঁছানোর জন্য যা যা করতে হয় সব করেছি একগুঁয়ের মতো। —আমার ভাবতে ভালো লাগে যে আমার চেনা-জানার মধ্যে কেউ কেউ সংগীত নিয়ে সেভাবেই বাঁচতে চেষ্টা করেছে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি—যেমন পপাই, ধ্রুব।

'নাগরিক' নামটি সমিতি হিসেবে নথিবদ্ধ করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে ঐ নামেই আর একটি সমিতি আছে। তখন আমরা বাধ্য হয়ে 'নাগরিক'/অন্য কথা অন্য গান' এই নামে সমিতিটি নথিবদ্ধ করি। 'অন্য কথা অন্য গান'— এই সুন্দর নামটি দিয়েছিলেন আমাদের বন্ধু তাপস মাইতি।

আমাদের ক্যাসেটের নামও আমরা দিলাম 'অন্য কথা অন্য গান'। কখনও একটি, কখনও দুটি ট্র্যাকে আমরা গান ও সঙ্গতকারী যন্ত্রগুলো রেকর্ড করলাম। বাকি তিনটি বা দুটি ট্র্যাকে আমি পরে রাত জেগে জেগে অর্কেস্ট্রা জুড়ে দিলাম নিজে সিন্‌থেসাইজার বাজিয়ে। ট্র্যাকগুলি মিশিয়ে স্টিরিয়ো সংস্করণ আমিই তৈরি করলাম।

একই পদ্ধতিতে আমরা পরে নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপর তথ্য ও গানের ক্যাসেট করছিলাম। রেকর্ডিং হয়েছিল গড়িয়ার কাছে ফরতাবাদে, আমার ভাড়া করা ছোট্ট বাসায়। সেই বাড়িতে লালু নামে একটি দিশি কুকুর ছিল। গান ও ভাষ্য রেকর্ডিং-এর সময় লালু ভয়ানক চেঁচামেচি জুড়ে দেওয়ায় আমাদের মধ্যে থেকে একজন গিয়ে লালুকে আমার ভাঁড়ারের বিস্কুট খাওয়াতে লাগল। লালু নীরবে বিস্কুট খাচ্ছে, আর আমরা সেই সুযোগে রেকর্ড করছি।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন নিকারাগুয়ার বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সেনেটকে ভজিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা জোগাড় করেন। তখন জনমত গঠনের লক্ষ্যে আমি নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপর ক্যাসেটটি প্রযোজনা করার সিদ্ধান্ত নিই। এ জন্য নিকারাগুয়ার 'মানকোতাল' শিল্পীদলের কয়েকটি গান আমি বাংলায় অনুবাদ করে তাতে সুরারোপ করি। ধারাভাষ্য ও বাদবাকি গানও আমার রচনা।

মোটামুটি ওই সময় নাগাদ কলকাতায় এক প্রকাশনা সংস্থা 'কে পি বাগচি' আমার মুক্ত নিকারাগুয়া বইটা ছাপতে রাজি হন। অন্য আমেরিকা বইখানি প্রকাশ করতে কেউই রাজি হলেন না।

১৯৮৬ সালের গোড়ার দিক থেকেই এক সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন তরুণ, সুজয় বসুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সুজয় সংগীতশিল্পী না হয়েও আমার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপর তথ্য ও গানের ক্যাসেটের ব্যাপারে তো বটেই, আমাদের সমগ্র ক্যাসেট প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সুজয় একটা বড় ভূমিকা নেয়।

সংগীতে ও গানের ক্যাসেট প্রযোজনায় আমার প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠে কৌশিক দত্ত। কৌশিক মূলত গিটার শিল্পী হিসেবে এসেছিল। দারুণ সংগীতপ্রেমী ও কর্মোদ্যোগী যুবক। অল্পকালের মধ্যেই কৌশিক সংগীত পরিচালনায় আমার সহকারী হয়ে ওঠে।

কৌশিকের উৎসাহেই ১৯৮৬ সালে আমরা দুজনে একটা 'সাউন্ড স্টুডিয়ো' তৈরির কাজে হাত দিই। বাঁশদ্রোণী অঞ্চলে কৌশিকের বাড়ির পেছনদিকে ওদেরই একটি ছোট কারখানা ছিল। কারখানাটি ভালো চলছিল না। সেই বড় ঘরটা

ঠিকঠাক করে নিয়ে, ভেতরে গাঁথনি তুলে পার্টিশন করে তৈরি হয় স্টুডিয়ো 'সিং-টু-লিভ'। স্টুডিয়োর জন্য যা যা দরকার সবই আমি নিয়ে এসেছিলাম আমেরিকা থেকে। স্টুডিয়োটা তৈরির যাবতীয় খরচ আমিই দিলাম। সবমিলিয়ে আমার পক্ষে সে এক বিরাট অঙ্কের টাকা। আমার সঞ্চয়ে যা ছিল, খরচ হয়ে গেল।

১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি ভয়েস অফ জার্মানির বাংলা বিভাগে সিনিয়র এডিটরের একটা চাকরির প্রস্তাব পেয়ে আমি তা গ্রহণ করেছিলাম। তার প্রধান কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম যে উপার্জনের পথ তেমন নেই। দেশে কোনও চাকরি নিয়ে তাতে আটকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। গানের বাজারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার কথাও ঠিক ভাবছিলাম না। '৮৫ থেকে '৮৬ সালের মধ্যে বহু গান বেঁধেছিলাম। সেইসব গানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার মনে কোনও প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু লোকে সেই গানগুলো শুনবে, কিনবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। তাছাড়া আমার গানগুলো আমিই গাইব—এমন ইচ্ছেও তখনও ছিল না আমার। তখনও আমি ভাবছিলাম 'নাগরিক'-এর কথা। ক্যাসেটে আমি উপায়ান্তর না দেখে কয়েকটি গান গেয়েছিলাম। মূল গুঞ্জনটা ছিল কিন্তু সমবেত প্রয়াসের ওপর।

বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত এক যুবক আমাকে দিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য যন্ত্রসংগীতের কিছু কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। কিছু টাকা পেয়েছিলাম। এই কাজগুলো করতে গিয়ে মনে হয়েছিল, ইলেকট্রনিক সংগীতের ক্ষেত্রে যে-সব নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন হচ্ছে তার কয়েকটি জোগাড় করতে পারলে বিজ্ঞাপনের কাজ বেশ ভালোই করা সম্ভব। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে ছোট বড় নানা মাপের অতি জটিল যন্ত্রসংগীত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধ্বনির প্রয়োগে একজন দক্ষ সংগীতকার ও যন্ত্রী একাই সৃষ্টি করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যন্ত্রসংগীত সৃষ্টির ক্ষমতা আমি ততদিনে যথেষ্ট অর্জন করেছি। নতুন নতুন যন্ত্রের জন্য আর একবার বিদেশে গিয়ে ক'বছর চাকরি করে আসতে পারলে মন্দ হয় না—এ ভাবনাটাও মাথা চাড়া দিচ্ছিল।

অন্যদিকে আমার গান। অনেকগুলো বছর বহু কষ্ট করে, একনাগাড়ে খেটে আমি অবশেষে বেশ কিছু গান তৈরি করতে পেরেছি, যে-গুলো আমার জীবন থেকে উঠে আসা। এইরকম গান বাঁধব বলেই তো আমি আবাল্য শেখা যাবতীয় গান, অতিকষ্টে শেখা রাগসংগীত, বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ড সবকিছু থেকে নিজেকে জোর করে সরিয়ে এনেছিলাম। এই নতুন গানের পথই তো আমার পথ। কিন্তু এই গান কি আমায় খাওয়াবে? যতদিন বাঁচব, ক্ষমতায় কুলোবে, ততদিন গান বেঁধে যাব। 'নাগরিক'-এর ছেলেমেয়েরা শিখতে চাইলে শেখাব। নিজেও কিছু গাইব। এ হবে আমার একান্ত অভিব্যক্তি। আর দিন চলে যাওয়ার মতো টাকা

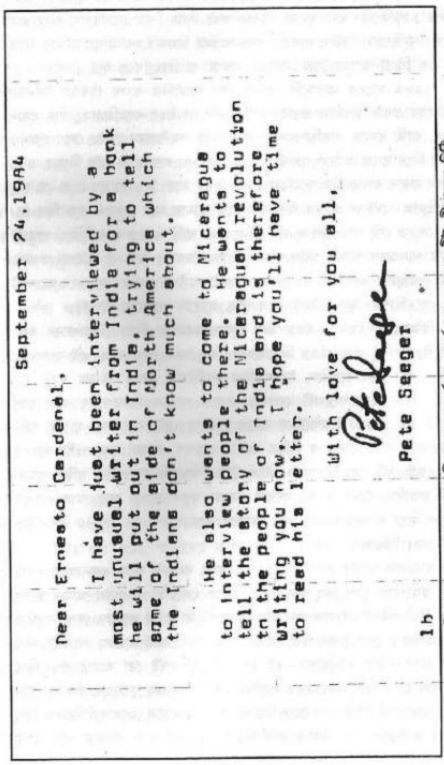

September 24,1984

Dear Ernesto Cardenal,

I have just been interviewed by a most unusual writer from India for a book he will put out in India, trying to tell some of the side of North America which the Indians don't know much about.

He also wants to come to Nicaragua to interview people there. He wants to tell the story of the Nicaraguan revolution to the people of India and is therefore writing you now. I hope you'll have time to read his letter.

With love for you all,

Pete Seeger

Pete Seeger

1h

সুমনের নিকারাগুয়ায় যাওয়ার সুপারিশ করে এর্নেস্তো কার্দেনালকে লেখা পীট সীগারের চিঠি

হয়তো স্টুডিয়োর ব্যবসা থেকে আর ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপনের কাজ করে পাব। এইসব ভেবেই আমি আমার সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে স্টুডিয়োটা বানাই। কৌশিককে করে তুলি সমান অংশের অংশীদার। রেকর্ডিং-এর কাজ শিখিয়ে দিই ওকে, যাতে আমার অনুপস্থিতিতে কৌশিক স্টুডিয়োর কাজ চালাতে পারে।

১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি তিন বছরের চুক্তিতে ভয়েস অফ জার্মানির সিনিয়র এডিটরের চাকরি নিয়ে জার্মানির কোলোন শহরে চলে এলাম। যাবার আগে নবনির্মিত স্টুডিয়োয় রেকর্ড করে গেলাম 'অন্য কথা অন্য গান'-এর দ্বিতীয় সংকলন।

কোলোনে পৌঁছোনোর দু'মাসের মধ্যেই আমি ক্লাসিক্যাল গিটার শিখতে শুরু করলাম। আমার জীবনে সে এক ক্রান্তির মুহূর্ত।

'নাগরিক'-এ কৌশিকের দৌলতে গিটার যন্ত্রটির সঙ্গে মোলাকাত হচ্ছিল নিয়মিত। কৌশিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার সহকারী। ফলে নতুন গান বাঁধার পর আমি যখন মহড়ার জন্য সে গানের কর্ড-পরম্পরা তৈরি করতাম তখন কৌশিকই দিনের পর দিন আমার সঙ্গে বসত তার গিটারটি নিয়ে। আমি কি-বোর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে কর্ডগুলো বলে যেতাম আর কৌশিক সেগুলো লিখে নিয়ে গিটারে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখত কেমন শোনাচ্ছে। এইভাবে নিয়মিত কাজের মধ্যে গিটার যন্ত্রটির সঙ্গে আমার একটা পরোক্ষ সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে।

বিদেশে রাস্তায়-ঘাটে ও মঞ্চে শোনা গানে গিটারের ব্যবহার তো বছরের পর বছর দেখেছি, শুনেছি। বিদেশ থেকে আনা অসংখ্য গানের ক্যাসেটে, রেকর্ডেও অ্যাকুস্টিক ও ইলেকট্রিক গিটারের ব্যাপক প্রয়োগ। প্রথমবার জার্মানিতে গিয়ে হুলফ বিয়ারমানের গান শুনে খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম। তিনিও তো শুধু একটি গিটার নিয়ে গান করেন।

আমার অবচেতন মনে দীর্ঘকাল ধরে গিটারের জন্য একটা বিশেষ জায়গা তৈরি হচ্ছিল নিশ্চয়। কিন্তু অর্কেস্ট্রার প্রতি, রাজ্যের বাজনার জমকালো প্রয়োগের প্রতি আবাল্যের আকর্ষণ, আমেরিকায় গিয়ে ইলেকট্রনিক সংগীতরচনা ও প্রয়োগ পদ্ধতির অনুশীলন—এইসব কারণে আমি অ্যাকুস্টিক গিটারের দিকে আলাদা নজর দেবার ফুরসত পাইনি। আমার সংগীতচিন্তা ও সংগীতরচনা হয়ে পড়েছিল কি-বোর্ড ভিত্তিক।

পেছন দিকে তাকিয়ে, সবকিছু খতিয়ে দেখে আজ মনে হয় অনেকে মিলে গান-বাজনা করার যে প্রবল ইচ্ছে, তার সঙ্গেও অর্কেস্ট্রার প্রয়োগচিন্তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। অর্কেস্ট্রা হল অনেক যন্ত্রের সমবেত উচ্চারণ। সেখানেও আলাদা আলাদা ভাগ থাকে। নানান যন্ত্রের সঙ্ঘবদ্ধতার পটভূমিতে কোনও যন্ত্রের একক

ভূমিকাও থাকে সেখানে। কিন্তু মূলত অর্কেস্ট্রা হল সমবেত প্রয়াসের প্রতিনিধি।

ব্যবহারিক জীবনে, বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ঐ সমবেত প্রয়াসের সন্দেহ লাগছিল আমার ঠোকাঠুকি। আমার সংগীতশিক্ষা দীর্ঘকালের ও ব্যাপক। অধিকাংশ সহযোগীর সঙ্গে সেখানেই ছিল আমার বিরাট ও মৌলিক ফারাক। মতবাদের সাযুজ্য, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, একসঙ্গে মিলে ভালো কাজ করার ইচ্ছে— এগুলো তো খুব সুন্দর। কিন্তু সংগীতের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগুলো আর মুখ্য থাকে না। তখন জরুরি হয়ে পড়ে সাংগীতিক শিক্ষা, দক্ষতা, প্রয়োগক্ষমতা, অভিজ্ঞতা। এইসব মৌল ক্ষেত্রে ফারাকটা এত বেশি ছিল যে দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক।

জার্মান লেখক গ্যুনটার গ্রাস প্রিন্স্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: 'মানুষ আপস করে বাঁচে, কিন্তু কবিতা আপস চেনে না।'

সংগীতের প্রয়োগক্ষমতায় দুর্বল সহশিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি কিন্তু থেকে থেকেই আমার 'কবিতা'কে আপস করতে বাধ্য করছিলাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমাগত ঠকে যাচ্ছিলাম আমি। অন্যদের দক্ষতা বাড়ানোর দিকে অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার দিকে সমস্ত সময়, শক্তি, মনোযোগ দিতে দিতে নিজের বিকাশ হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত শ্লথগতি। ১৯৭৯ সালে দলবদ্ধভাবে গানবাজনা শুরু করার সময় থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যেও আমি সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজের আত্মবিকাশের কথা আলাদা করে ভাবিনি।

একদিকে নানান কারণে দলীয় অশান্তি লেগেই থাকছে। অন্যদিকে আমি মরিয়া হয়ে বাংলা আধুনিক গানের লিরিক, সুর, আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি, বেঁধে যাচ্ছি একের পর এক গান যে-গুলির পরিবেশনা দক্ষতার অভাবে কখনওই ঠিক পূর্ণতা পাচ্ছে না। আমার কাছে কিন্তু বাংলা গানের কাজটা বিলাসিতা, শখ, 'হবি', অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল না। আমার আবাল্যের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন, সঙ্কল্প সব-কিছু আমার সমস্ত অস্তিত্ব কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল আমার গানের কাজে।

এইসব বাস্তব কারণে গানের কারিগর, সংগীতকার, পরিবেশক হিসেবে আমি ১৯৮৬ সালেই ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলাম। অস্থিরতা বেড়েই যাচ্ছিল। আমেরিকায় অর্জিত টাকায় কলকাতায় গাড়ি-বাড়ি বানানো দূরের কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঐ টাকা থেকে বুদ্ধিমানের মতো কিছু সঞ্চয় করার পথেও যাইনি। সব টাকা ঢেলে দিয়েছিলাম যন্ত্র কেনায়। ফলে অমোঘ আর্থিক অনিশ্চয়তাও ছিল। এইসব টালমাটালের মধ্যে আমার তৈরি গানগুলোয় প্রকাশ পাচ্ছিল সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তির কথাই বেশি। তার মানে এই নয় যে ব্যক্তি সমষ্টির বাইরে। বহুর মধ্যে থেকেও, অনেকের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেও ব্যক্তির যে মানুষী স্বাতন্ত্র্য

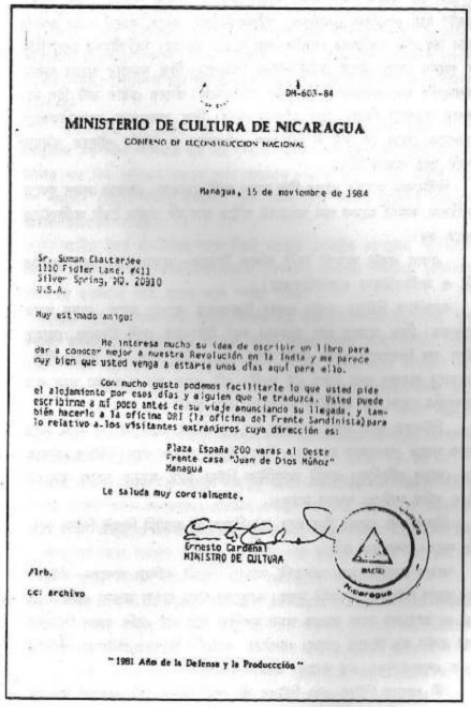

DM-803-84

MINISTERIO DE CULTURA DE NICARAGUA

GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL

Managua, 15 de noviembre de 1984

Sr. Suman Chatterjee
1130 Fidler Lane, #411
Silver Spring, MD. 20910
U.S.A.

Muy estimado amigo:

Me interesa mucho su idea de escribir un libro para dar a conocer mejor a nuestra Revolución en la India y me parece muy bien que usted venga a estarse unos días aquí para ello.

Con mucho gusto podemos facilitarle lo que usted pide el alojamiento por esos días y alguien que le traduzca. Usted puede escribirme a mí poco antes de su viaje anunciando su llegada, y también hacerlo a la oficina del (la oficina del Frente Sandinista) para lo relativo a los visitantes extranjeros cuya dirección es:

Plaza España 200 varas al Oeste
Frente casa "Juan de Dios Muñoz"
Managua

Le saluda muy cordialmente,

Ernesto Cardenal
MINISTRO DE CULTURA

/lrb.

cc: archivo

"1984 Año de la Defensa y la Producción"

সুমনকে লেখা এর্নেস্তো কার্দেনালের চিঠি

সেখানে সে অনেক সময় একা। বাস্তব কারণেই আমার সৃষ্টিতে একার গানের মাত্রাটা হয়ে পড়েছিল জোরালো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে আমি ক্রমশই এমন সব গান বাঁধছিলাম যেগুলি একা গাওয়া দরকার। সহশিল্পীদের মধ্যে যিনি যে গানের যোগ্য, তাঁকে সেটি শিখিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু দক্ষতার অভাব থাকায় আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলাম না তাঁদের কাছ থেকে। তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শেখার ব্যাপারে নিষ্ঠাও ছিল কারুর কারুর। কিন্তু কাজগুলো ব্যবহারিকভাবে সামলাতে গেলে যে দীর্ঘ সংগীতশিক্ষা, রেওয়াজ ও অর্জিত পটুত্বের বনিয়াদ জরুরি তার অভাব ছিল।

দ্বিতীয়বার জার্মানি যাবার ঠিক আগে আমি ভেতরে ভেতরে ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, আমার অনেক গান আমাকেই গাইতে হবে যদি আমার তৈরি অ্যাম্বিয়ান্সকে রাখতে হয়।

একার একটা জায়গা তৈরি হচ্ছিল নিভৃতে—আমার গান বাঁধা, সংগীত সৃষ্টি ও সংগীতচিন্তার ধারাবাহিকতায়।

আকুস্টিক গিটারে একটা একার উচ্চারণের ব্যাপার আছে, যেমন আছে দোতারায়। কিন্তু আমার গান বাজনার জন্য গিটারটাই বেশি উপযুক্ত, যেহেতু গিটার হল পিয়ানোর মতো একটা যন্ত্র। অনেক কিছু করা যায় গিটার দিয়ে। নানাভাবে ব্যবহার করা সম্ভব এই যন্ত্রটি। এটি থেকে সুর ও ছন্দের সঙ্গে কর্ড পরম্পরাও মেলে, যা আধুনিক সংগীতের জন্য জরুরি।

গিটারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, দোতারার মতো এটিকে সঙ্গে নিয়ে অনেক সহজে ঘোরাফেরা করা যায়। কি-বোর্ড বড় আটকে রাখে। গিটারে মানুষকে করে তোলে গতিশীল। একটি আকুস্টিক গিটার নিয়ে অনেক সহজে মানুষের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভব।

এইসব কথা ভেবেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে জার্মানি গিয়েই গিটার শেখা শুরু করব। করলামও তাই।

আমার ইতালীয় গুরু বেল্‌ত্রামি, আমায় প্রথমেই শাসিয়ে রাখলেন: সাঁইত্রিশ বছর বয়সে গিটার শেখা অতি দুরূহ। আঙুলের গাঁটে, ডগায় জড়তা এসে পড়ে। চিন্তা ও আঙুলের মধ্যে সমন্বয় আনা মুশকিল হয়ে যায় বেশি বয়সে গিটারের মতো একটা যন্ত্র শিখতে গেলে। পাশ্চাত্য স্বরলিপি বিশেষত গিটারের স্বরলিপি পড়তে শেখাও দুষ্কর এত বয়সে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কী ধরনের গিটার এবং গিটারে কী শেখা উচিত সেই পরামর্শ চাওয়ায় তিনি বললেন, গিটার যন্ত্রটাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে, জানতে হলে ক্লাসিক্যাল গিটার শেখাই উচিত। তবে তিনি আবার হুঁশিয়ার করে দিলেন: ক্লাসিক্যাল গিটার

কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দীর্ঘকাল নিরন্তর পরিশ্রম করতে হবে। তবে, একবার রস পেয়ে গেলে ক্লাসিক্যাল গিটার হয়ে যাবে সারা জীবনের সঙ্গী। ক্লাসিক্যাল পিয়ানোর মতো ক্লাসিক্যাল গিটারও পাশ্চাত্যের বহু সৃজনশীল সুরস্রষ্টার অসংখ্য রচনায় সমৃদ্ধ। সেগুলির চর্চা করতে হলে বেশ কয়েকবার জন্মাতে হবে একজন মানুষকে।

ক্লাসিক্যাল গিটারেরই পাঠ নেওয়া শুরু করলাম সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। আঙুলের নখ দিয়ে বাজাতে হয় এই গিটার। একটি স্বর ঠিকমতো বের করতেই দিনের পর দিন পরিশ্রম করতে হল। বাজনার পদ্ধতি ভুল হলেই আমার চেয়ে দশ বছরের ছোটো আমার ইতালীয় গুরু স্কেল দিয়ে আমার আঙুলে মারতেন। ক্ষমাও চাইতেন তারপর।

অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি আমায় শেখাতে লাগলেন 'ক্লাসিক্যাল ফিঙ্গার স্টাইল' গিটার বাজানোর পদ্ধতি, কৌশল। শেখাতে লাগলেন ক্লাসিক্যাল গিটারের স্বরলিপি পাঠ, যাকে বলে 'সাইট রিডিং'।

এত বয়সে জীবনে সেই প্রথম কোনও যন্ত্র বাজানো শিখছি একেবারে 'শূন্য' থেকে, প্রথাসিদ্ধ রীতিমাফিক। আমার গুরুর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমিই ছিলাম বয়সে সবার বড়। শিখতাম আলাদাই। কিন্তু ক্লাসের আগে পরে অন্যদের সঙ্গে দেখা হত। অল্পবয়সি ছাত্ররা বোধহয় একটু করুণা করত আমায়। কিন্তু ঠাট্টা-তামাশা করত না কেউ। জার্মানির একাধিক গানবাজনার স্কুলে আমি পঞ্চকেশ ছাত্রছাত্রীদের দেখতাম। নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে তাঁরা নাতিনাতনির বয়সিদের পাশাপাশি বসে বাজনা বাজাতে শিখছেন। একটা জাত বা সমাজ এমনি বড় হয় না।

অফিসের কাজকর্মের বাইরে সবটুকু সময় আমি 'ফিঙ্গার স্টাইল' গিটার শেখার চেষ্টায় কাজে লাগালাম। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু গিটার রেওয়াজ। বেশি বয়সে আঙুলের জড়তা কাটাতে, দুই হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে এবং চিন্তা ও আঙুলের মধ্যে সমন্বয় আনতে, স্বরলিপি পাঠ শিখতে আমায় যে কত কষ্ট করতে হয়েছে, তিনটি বছর কত খাটতে হয়েছে তা আমিই জানি।

ক্লাসিক্যাল গিটার শেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিক্যাল গিটারের বিখ্যাত ওস্তাদের রেকর্ডও শুনতে থাকলাম। নতুন করে আবিষ্কার করলাম আন্দ্রেস সেগোভিয়াকে। খুঁজে পেলাম জুলিয়ান ব্রীমকে। প্রবল ঈর্ষা হত তাঁদের বাজনা শুনে।

গিটারে মার্গসংগীতে তালিমের পাশাপাশি ধীরে ধীরে 'জ্যাজ গিটার' ও 'ব্লুজ গিটার'-এও পাঠ নিতে লাগলাম। 'ব্লুজ'-এর দিকে আমার একটা যেন সহজাত প্রবণতা আছে।

গিটারটা একটু সড়গড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার গান বাঁধা ও সংগীত চিন্তাতেও একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। কি-বোর্ড ছেড়ে গিটারেই সুর করতে

লাগলাম। আমার গানের আঙ্গিকেও গিটার-কেন্দ্রিক চিন্তা ও প্রয়োগপদ্ধতির বিরাট প্রভাব পড়ল। আমার ধারণা, আমার গানের ধারাটাই গেল বেশ কিছু পালটে।

গিটার বাজাতে বাজাতে, সুর নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার মাথার মধ্যে আজন্ম শোনা বাংলার লোকগীতির সুরগুলো, বিশেষ করে বাউল, ভাওয়াইয়া ও কীর্তনের টুকরো আনাগোনা করতে লাগল। গিটারে দোতারার সুর তোলা যায়। তাছাড়া আঙুল দিয়ে তারে তারে ঘা দিয়ে বাজিয়ে সুরের যে মেজাজ আমি আমার বুকের কাছে, কানের কাছে পাচ্ছিলাম তাতে আমার নানা ধরনের গান শোনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্মৃতি যেন নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জেগে উঠছিল। উঠে আসছিল লোকায়ত সুরের টুকরো, রাগ রাগিণীর মেজাজ, অবয়ব।

হিন্দুস্থানি রাগ সংগীতে আমার দীর্ঘ তালিম এবং প্রচুর শোনা অভিজ্ঞতার দরুন আমি ক্লাসিক্যাল গিটারে কিছু কিছু রাগের আদলও ফুটিয়ে তুলতে লাগলাম। নাইলনের তারের আওয়াজের সঙ্গে কোথায় যেন সরোদের আত্মীয়তা। চোখ বুজে কল্পনা করতাম, সরোদ বাজাচ্ছি আমি।

সে সময়ে আমি যেসব গান বাঁধি, যেমন 'হাল ছেড়ো না বন্ধু ', 'গানঅলা', সেগুলো বাংলার লোকায়ত সুরের ছোঁয়ায় ভরপুর। এই মাত্রাটা গিটার শেখার আগে আমার গানে বেশি ছিল না, যদিও কীর্তনের স্পর্শ বরাবরই ছিল এখানে ওখানে।

বাংলার লোকায়ত সুরের টুকরোর সঙ্গে হাত মেলাতে লাগল কখনও কোনও রাগের আদল, কখনও আমেরিকান লোকসংগীতের সুর, কখনও বা 'ব্লুজ'। ১৯৮৬ সালে কলকাতায় 'মাছি ও মরা মুখের গান'-এ আমি প্রথমে সচেতনভাবে 'ব্লুজ'-এর চলন ও আঙ্গিক প্রয়োগ করেছিলাম। গিটারে 'ব্লুজ' আঙ্গিকটি নিয়মিত চর্চা করার পর তার প্রভাব আরও বেশি পড়তে লাগল।

তেমনি গিটারে বাঁধা 'সাফদার হাসমির লাশ' গানটিতে প্রয়োগ করলাম হিন্দুস্থানি রাগসংগীত। সেখানেও 'ব্লুজ' উঁকি দিয়ে গেল।

জার্মানিতে তিন বছর অনেক নতুন গান বাঁধলাম। এইসব গান 'নাগরিক'-এর জন্য বাঁধা গানের ধারা থেকে আলাদা। গান লেখা ও সুর করার কাজ দুটো তখন প্রথমত কয়েক বছরের নিত্য অভ্যেসের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি রপ্ত হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গানের আঙ্গিক আমি তখন সম্পূর্ণভাবে ঠিক করছিলাম আমার ক্ষমতা, দক্ষতার নিরিখে। গানগুলো তখন সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আমি গাইছি।

কলকাতায় নাগরিক-এর মহড়া তখনও চলছিল। আমার নতুন কিছু গান ক্যাসেট করে পাঠিয়ে দিলাম। গানগুলো কীভাবে গাইতে হবে সেই নির্দেশও দিয়ে দিলাম ক্যাসেটে।

'নাগরিক' একটি দুটি অনুষ্ঠান করল। তার রেকর্ডিং শুনলাম জার্মানিতে বসে। দেখলাম দু'একটি গান ছাড়া কোনও গানই ঠিক আঙ্গিকে গাওয়া হচ্ছে না। অথচ কীভাবে গান গাওয়া হবে, বাজানো হবে, সেটাই তো সব।

অন্যদিকে 'নাগরিক'-এর সদস্যদের মধ্যে সদ্ভাব যে নেই, ঠোকাঠুকি যে লেগেই আছে তার খবরও আসছিল থেকে থেকে।

প্রথমদিকে খবর পেতাম স্টুডিয়ো 'সিং-টু-লিভ' বেশ ভালোই চলছে। ধীরে ধীরে আমার অংশীদারের চিঠি বিরল হতে শুরু করল। তবু তার কথা মতো স্টুডিয়োর জন্য আবার বহু খরচ করে যন্ত্র কিনলাম।

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে সংগীতে ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে ঘটে গিয়েছিল একাধিক বিপ্লব। নানান কাজের যন্ত্র উদ্ভাবন হয়ে গিয়েছে ততদিনে। যতটা পারলাম সেগুলির কিছু কিছু কিনে ফেললাম। ইলেকট্রনিক সংগীত নিয়ে আমি জার্মানিতে কাজ করে গিয়েছি।

১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে আবার প্রচুর যন্ত্র, অনেক নতুন গান, গিটার, ঠিক এক লক্ষ টাকা এবং তেড়েফুঁড়ে গান বাঁধার সঙ্কল্প নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

ফেরার আগে ভয়েস অফ জার্মানির পক্ষ থেকে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম কোলোনে। সাংবাদিকতার সূত্রে দেশ-বিদেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসা, তাঁদের সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ হয়েছে। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকারটি আমার জীবনের এক অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা, তিনি বিখ্যাত বলে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কথার জন্য।

কলকাতায় ফিরে 'নাগরিক'-এর সঙ্গে কাজ করতে গিয়েই বুঝলাম আমার পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব নয় ওখানে। দলাদলি তখন চরম পর্যায়ে।

স্টুডিয়োটার দেখলাম বারোটা বেজে গিয়েছে। আমার প্রাক্তন অংশীদার ততদিনে স্বাভাবিকভাবেই যোগ দিয়েছেন অন্য এক কোম্পানিতে, নয়তো তিনি সপরিবারে বাঁচবেনই-বা কী করে। বস্তুত, স্টুডিয়োটা যে আর বিশেষ চলছে না সেই খবর জার্মানিতে বসে পেয়ে আমিই তাকে তাগাদা দিচ্ছিলাম বাঁচার জন্য অন্য কোনও কাজ খুঁজে নিতে।

এবারে, কলকাতায় ফিরে, আমারও কাজ খোঁজার পালা। ভালো ভালো যন্ত্র এনেছিলাম, সেগুলোর সাহায্যে কাজ করার দক্ষতাও ছিল। ভেবেছিলাম বিজ্ঞাপনের কাজ পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞাপন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নানান লোকের শরণ নিলাম। অনেক কথা হল, কিন্তু কাজ হল না।

একদিকে কাজ খুঁজছি, অন্যদিকে বেঁধে যাচ্ছি গান। 'তিন শতকের শহর',

'চেনা দুঃখ চেনা সুখ', ও 'প্রথম স্কুলে যাবার দিন' গানগুলি কলকাতায় ফিরেই লেখা। 'ব্যালার্ড' আঙ্গিকটায় হাত দিয়েছি তখন আমি। ১৯৭৯ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গান লেখার পর থেকে আমি সমানে চেষ্টা করে গিয়েছি নানান আঙ্গিক নিয়ে কাজ করতে।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেল। রাজু বল নামে আমার একটি চেনা ছেলে (নিজেও গায়ক) একদিন ইন্দ্রনীল গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হলেন আমাদের বাড়িতে। তিনি আমার 'তিন শতকের শহর' গানটি শুনে বললেন সল্ট লেক স্টেডিয়ামে কলকাতা উৎসব হচ্ছে, সেখানে আমায় গাইতে হবে।

আমি ব্যাপারটাকে প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু রাজু ও ইন্দ্রনীল গুপ্তর পীড়াপীড়ির চোটে শেষ পর্যন্ত যেতে হল অনুষ্ঠানে।

'হেমন্ত মঞ্চ'-এ আমার গান হবে। ঘোষণায় আমার পুরোনো বন্ধু তরুণ চক্রবর্তী। তিনি তো মহাখুশি। আমি নার্ভাস।

মঞ্চে গান আমি শেষ গেয়েছি ১৯৭৩ সালে। তারপর 'নাগরিক'-এর অনুষ্ঠানে গান তো গাইনি, বাজিয়েছি কি-বোর্ড। ১৭ বছর পর আবার গাইতে উঠেছি। একা। একটি গান গাইব গিটার বাজিয়ে। দুটি গান গাইব কি-বোর্ডে।

আমাকে তো কেউই চেনে না। আমার আগে পরে কত নামজাদা শিল্পী। ভয়ে ভয়ে উঠে, কাঁপা হাতে গিটার ধরলাম, গাইলাম 'তিন শতকের শহর।'

শ্রোতারা অমন উদ্ভট গান এবং অমন অদৃষ্টপূর্ব একক পরিবেশনার জন্য আদৌ তৈরি ছিলেন না। প্রথম গানটি শুনে সকলে কেমন যেন স্তম্ভিত। দ্বিতীয় গানটি ছিল 'তোমাকে চাই'। তৃতীয় গান 'গড়িয়াহাটার মোড়' শেষ হতেই তুমুল করতালি, শোরগোল। অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়, কারণ জনতার দাবি— আমাকে আরও গাইতে হবে। অনেক কষ্টে তাঁদের সামলানো গেল।

জীবনে প্রথম গান গেয়ে এত হাততালি পেলাম। শুধু গান নয়, আমার স্বরচিত গান। কয়েক হাজার শ্রোতার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত তিনটি গান। অথচ কী দারুণ উদারতা, সহিষ্ণুতা এবং সম্প্রীতি দিয়ে তাঁরা সেদিন আমার মতো এক সম্পূর্ণ অপরিচিত সংগীত-পরিবেশককে গ্রহণ করলেন তার গান-বাজনা সমেত।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঐ ঘটনাটি আমাকে অন্তত বলে দিল যে আমার গানের ভবিষ্যৎ হয়তো আছে। অনেক অনেক পথ পেরোনোর পর, অনেক আশা-নিরাশার আবর্ত পেরিয়ে, অনেক ঠোক্কর খেয়ে, অনেক মূল্য-দিয়ে চল্লিশ-ছোঁয়া একটা লোক জীবনে প্রথম টের পেল তার গানের লড়াই একেবারে বৃথা যায়নি।

১৯৯০ সালের জুন মাস নাগাদ কলকাতায় তৈরি একটি ইলেকট্রনিক তানপুরা কিনে আমি শুরু করে দিলাম গলার রেওয়াজ। ১৭ বছর পর আবার কণ্ঠচর্চা। দীর্ঘ অনভ্যাসের দরুন প্রথমে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু আমি ততদিনে মন স্থির করে ফেলেছি যে গান আমি গাইবই এবং সে-জন্য যা যা করা দরকার সবই করব। প্রথমত গলাটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

জয়ন্ত চক্রবর্তী নামে এক উদ্ভাবনপটু যুবকের তৈরি ঐ ইলেকট্রনিক তানপুরাটি না পেলে বড়ই গেরোয় পড়তাম। বিরাট, বেঢপ একটা তানপুরা নিয়ে কাজ করার ফ্যাচাং অনেক। জয়ন্তর যন্ত্রটি কার্যকর, ছোট্ট। ১৯৯০ সাল থেকেই আজ পর্যন্ত দু'বেলা যে রেওয়াজ করে চলেছি তা এই যন্ত্রের আনুকূল্যেই।

সল্ট লেক স্টেডিয়ামের অভিজ্ঞতার পর সত্যি বলতে, আশায় আশায় ছিলাম। কেউ গান গাইতে ডাকল না কোথাও। আমি অবশ্য গলার রেওয়াজে ধাতস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম, গিটার অনুশীলন ও গান বাঁধার কাজ চালিয়ে গেলাম। আশপাশে যা ঘটছে, যেসব ঘটনা আমার মনে দাগ কাটছিল, সেগুলোকে ধরতে চাইছিলাম আমার গানে। এ-চেষ্টা আমি আগেও করেছি, এখনও করছি, পরেও করব। আমার এই গানগুলি মানুষ ভবিষ্যতে মনে রাখবে কিনা সেটা আমার ভাবনা নয়। নানান বিষয়ে আঙ্গিকের গান লিখে চলেছি আমি। তার মধ্যে কিছু গান কিছু যুগমুহূর্তকে ধরতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার লিখেছিলেন সংগীতে এতটা প্রাণ থাকা চাই যাতে তার ওপর সমাজের এবং সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়ে। সমাজের বয়সের সঙ্গে তার বয়স যাতে বাড়ে।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পেশাদার সংগীতশিল্পী হিসেবে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেলাম। সুযোগটি করে দিলেন ডাক্তার বারিন রায়। বেশি শ্রোতা ছিলেন না সেখানে। একই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন—বারিনদারই আমন্ত্রণে-প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও ফাল্গুনী রায়। জনমত জনমত পত্রিকায় অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে একটি সুন্দর রিভিউ লিখেছিলেন আশিস চট্টোপাধ্যায়। আমার গানের ওপর সেটাই প্রথম প্রকাশিত লেখা।

গানের ব্যাপারে ডাক্তার বারিন রায়, গৌরকিশোর ঘোষ, সংগীত সমালোচক আশিস চট্টোপাধ্যায়— সকলে আমায় প্রচুর উৎসাহ দিচ্ছিলেন সে-সময়ে। উৎসাহ পাচ্ছিলাম শুভেন্দু মাইতির কাছ থেকেও। শুভেন্দু মাইতি ঘুরপথে আমার খোঁজ পেয়ে ৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে সোজা আমার বাসায় চলে আসেন। তিনি ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, সংগীত-রসিক ও সুগায়ক।

শুভেন্দুদাও আমাকে কয়েকটি অনুষ্ঠানে গাওয়ার সুযোগ করে দেন।

আমার কয়েকটি গান নিয়ে, বিশেষত বানতলার ঘটনা নিয়ে বাঁধা আমার

গানটিকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও বিতর্ক ওঠে। তবু, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচার অভিযানে অংশ নেবার জন্য আমার ডাক পড়ে এবং আমি রাজিও হই।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রচার অভিযানে অংশ নেবার প্রক্রিয়াটি আমার দীর্ঘকাল মনে থাকবে। একদিন সন্ধ্যের দিকে কয়েকজন যুবক আমাদের বাসায় এসে আমাকে জানালেন: "আপনাকে একটা ইলেকশান মিটিঙে অনুষ্ঠান দেওয়া হয়েছে।"—এই বলে তাঁরা আমাকে একটি চিঠি ধরিয়ে দিলেন। আমি একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম কথাটা শুনে। শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর বাবা নাকি একবার বলেছিলেন: "কখনও অবাক হোয়ো না।" উপদেশটি যে যথার্থ তাতে সন্দেহ নেই। জগতে বোধহয় সবই সম্ভব। অবাক হলে সারাক্ষণ এত অবাক হতে হবে যে কোনও কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। ডাক্তার হও, মোক্তার হও, পুলিস হও, চোর হও, গায়ক হও, নায়ক হও, নেতা হও, অভিনেতা হও যা ইচ্ছে তাই হও। শুধু অবাক হয়ো না বাপু।

"আপনি কি অমুক সভায় গাইতে আগ্রহী?" অথবা "অমুক দিন অমুক জায়গায় আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে, আপনি কি সেখানে গান শোনাতে পারবেন?" ক্ষমতাসীনরা এভাবে কথা বলতে যাবেন কেন? তাঁরা বেশ সাবলীলভাবে বলে দিতে পারেন—"আপনাকে একটা অনুষ্ঠান দেওয়া হয়েছে।"-এটাই তো বলার কথা। এভাবেই। কারণ, সরকার যাঁরা চালান, তাঁরা তো মাঝে মধ্যে 'দিয়ে থাকেন'।

"অনুষ্ঠান দেওয়া হয়েছে" কথাটা আমাকে তার পরেও একাধিকবার শুনতে হয়েছে, কখনও সামনাসামনি। কখনও টেলিফোনে। প্রতিবারই কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক সভা উপলক্ষ্যে। এসব জায়গায় টাকা পয়সার প্রশ্ন ওঠে না।

বেঁচে থাকতে গেলে খুব ভাগ্যবান কিছু লোক ছাড়া সকলকেই নিশ্চয়ই অনেক কিছু হজম করতে হয়। আর দশজনের মতো আমাকেও অনেক অপমান, অবজ্ঞা, কটাক্ষ, গালমন্দ হজম করতে শিখতে হয়েছে। দিনের পর দিন ঘরে বসে রেওয়াজ করতে করতে, গান পাড়তে পাড়তে, সেসব গানে তা' দিতে দিতে আমি এত হদ্দ হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার সেই হদ্দমুদ্দ অবস্থাটাই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল হজমি গুলি, হজমের বড়ি। অনেক ধাক্কা তখন সেই বড়ির জোরে হজম হয়ে যাচ্ছিল।

দুটি মাত্র সভায় গান গেয়েছিলাম আমি একটি দুটি করে। আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিবেচনা ছিল হিন্দু মৌলবাদী বি জে পি-র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে কিছু বলার সুযোগ। তাছাড়া, রাস্তার ওপর সাধারণ মানুষ-জনের মাঝখানে একটা

গিটার হাতে গান গাইব। মানুষ আমাকে এবং আমার গানগুলোকে কীভাবে নেয় তা যাচাই করার অদম্য কৌতূহলও ছিল।

কেউ যদি ভাবেন যে আমি ঐ মঞ্চটাকে ব্যবহার করেছি তো তাঁকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব যে ঐ মঞ্চও আমাকে ব্যবহার করেছে। একটি গানও যদি সেখানে গেয়ে থাকি তো সেই তিন মিনিটের জন্যে অন্তত জনতাকে আমি ধরে রেখেছিলাম। যারা গান বাঁধে বা গান গায়, বাজায়, অভিনয় করে, ছবি আঁকে তাদেরও অবদান থাকে বৈকি।

তাছাড়া, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে, সুনির্দিষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গে গানের বাজার তার সঙ্গে নির্বাচনী সভায় গান গাইতে পারার কোনও সম্পর্ক নেই। এরকম সভায় কয়েকবার গাইতে পারলেই যে গানের বাজারে কোনও শিল্পীর ঠাঁই হয়ে যাবে, তিনি পেশাদার হিসেবে করে খেতে পারবেন, তাও নয়। বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় সংগীতের ব্যবসা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের অনুবর্তী নয়।

তেমনি আমার মতবাদ (যা বদ্ধমূল, কর্তাভজা বা শিবিরভজা নয়), মতামত আমার তৈরি গানে প্রতিফলিত হলেও আমার মগজ, কণ্ঠ এবং আমার দুটি হাত আমি কোনও বিশেষ মতবাদ বা রাজনৈতিক দলের কাছে বাঁধা রাখিনি।

১৯৯১ সালের পাঁচই মে কলকাতার শিশির মঞ্চে আমি জীবনে প্রথম আমার গানের একক অনুষ্ঠান করলাম। আমার বন্ধু সুজয় বসু, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আরও অনেকে। বন্ধুরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে ঊ ঃ ঊ ঃ ঃ ঃ ঃ *আজকাল*, *দেশ*, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, *স্টেটস্‌ম্যান* ইত্যাদি পত্রিকায় অনুষ্ঠানটির সমালোচনা ছাপা হল।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সেই অনুষ্ঠানের বিবরণের শিরোনাম ছিল 'সুমনের গান'। সেই থেকে আমার তৈরি ওই গাওয়া গানগুলি ঐ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

পত্রপত্রিকায় আমার গান সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক অনেক কথা ছাপা হলেও তার ধাক্কায় অনুষ্ঠানের ডাক কিন্তু পেলাম না। '৯১ সালে আর '৯২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত গুটিকয়েক মাত্র অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেলাম নেহাতই বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায়। পারিশ্রমিকেরও কোনও স্থিরতা ছিল না। সব 'স্বাধীন' পেশাজীবীর জীবনেই এটা হয়ে থাকে। তীব্র অনিশ্চয়তার সেই সময়ে কয়েকজন বন্ধু প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন যে-করে হোক আমাকে একটা অনুষ্ঠান জুটিয়ে দিতে। বেঁচে থাকার জন্য আমি বাধ্য হয়েছি আমার যন্ত্র বিক্রি করে দিতে জলের

দরে।

আমার খুব অদ্ভুত লাগে এখন কোনও শিল্পী বাজার পাবার পর তাঁর দর, উপার্জন, জীবনযাত্রার ধরন, সিগারেটের ব্র্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে অনেকে কটাক্ষ করেন, বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁদের ভাব দেখে মনে হয় তাঁরাই এই বাজার-পাওয়া শিল্পীকে আজন্ম খাইয়েছেন পরিয়েছেন। নাম করার আগে শিল্পীদের হাঁড়ি চড়ত কিনা, চড়লে তা কীভাবে চড়ত, নাম চলে যাবার পর তাঁদের ব্যয়ভার কে বহন করবে- এসব কথা তাঁরা ভাবেন কি?

এক শিক্ষিত, 'ইনটেলেকচুয়াল' পরিচালক একটি বিজ্ঞাপন ছবিতে আমাকে দিয়ে আবহসংগীত করিয়ে নিলেন। অনেক খেটে পুরো কাজটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রব্যবস্থায় একাই করলাম, যথা সময়ে জমা দিলাম। মাত্র দুহাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন তিনি। একটি পয়সাও পাইনি।

'৯১ সালের 'লেক্সপো' মেলার 'থিম সং' করে দেবার ফরমাশ পেলাম এক 'বন্ধু' মারফত। মহা উৎসাহে লিখে ফেললাম : "তিনশোর মেলা শেষ একানব্বুই সাল/ কবেকার দিন থেকে আজকের দিনকাল/ অসংখ্য নতুনের জন্মভূমির নাম কলকাতা" ইত্যাদি। লম্বা গান, তাতে 'লেক্সপো' মেলার কথা বলা। সুর দিলাম। নিজেই গাইলাম, বাজালাম। অর্কেস্ট্রা জুড়ে দিয়ে নিজেই রেকর্ড করে দিলাম। গোটা কাজটির জন্য 'মধ্যপদস্থ কর্মধারয়' ধরিয়ে দিলেন আটশো টাকা। তথাস্তু। সপরিবারে মেলায় গিয়ে হাসিহাসি মুখে শুনে এলাম গানটি থেকে থেকেই বাজানো হচ্ছে।

একবার একটি সোনার দোকানের জন্য বিজ্ঞাপন লিখে সেটি পাঠ করে, পেছনে 'মাল্টিট্রাক রেকর্ডার'-এর সাহায্যে অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে, পুরোটা নিজেই রেকর্ড করে পারিশ্রমিক পেলাম আড়াইশো টাকা।

বিজ্ঞাপনের কাজ আর পাইনি। পেলে হয়তো পঞ্চাশ টাকাতেই সব কাজ করতাম। বিজ্ঞাপন জগতের এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি'৯০ সালেই উপদেশ দিয়েছিলেন— "তোমার যা ক্ষমতা, যেসব যন্ত্র তোমার আছে, তুমি বম্বে চলে যাও, ওখানে তবু কাজ পাবে।" যাইনি।

জলসার ডাক পাচ্ছি না, আশায় আশায় বসে আছি, একের পর এক গান লিখে যাচ্ছি, সুর করছি, তেড়ে রেওয়াজ করে চলেছি এমন সময়ে বামপন্থী স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া নিয়ন্ত্রিত একটি কলেজ-ইউনিয়নের ডাক। পারিশ্রমিকের কথা শুনে তাঁরা বললেন: "দাদা, আমাদের শুধু 'পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স' নেবার একটা ব্যাপার আছে, পরে 'কনফার্ম' করব।" —'রাজনৈতিক অনুমোদন' তাঁরা সম্ভবত পাননি।

অল্পবিস্তর নাম করে যাবার পর অবশ্য এস এফ আই নিয়ন্ত্রিত দু'তিনটি কলেজে অনুষ্ঠানের ডাক পেয়েছি।

কাজের ধান্দায় ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে টেলিভিশনেও গিয়েছিলাম। পেশাদার হিসেবে গানের বাজারে করে খেতে চাই। দরজায় দরজায় তো ঘুরতেই হবে। দূরদর্শনে অনুষ্ঠানের দরজাটি অবশ্য খোলেনি আমার জন্য। বিতাড়িত হয়েছিলাম।

বন্ধু তরুণ চক্রবর্তীর তাড়া খেয়ে আকাশবাণীতে আবার গান গাওয়ার জন্য আবেদন করলাম। তরুণ বললেন: 'দ্যাখো সুমন, গানটাকে যখন পেশা করেছ তখন রেডিয়োয় আবার গাও।" আকাশবাণী ভবনে তাঁর সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানেই সাদা কাগজে আমাকে দিয়ে আবেদন লেখালেন। একসময়ে আমি বেতারে 'বি হাই' শ্রেণির গায়ক ছিলাম। তারই জোরে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে আমি আবার বেতারে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলাম। ১৬ বছর পর আবার বেতারে।

সে-সময়ে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যূনতম সৌজন্যও পাইনি, কিন্তু আকাশবাণীর কর্মকর্তারা আমাকে পেশাগত মর্যাদা দিয়েছেন। আকাশবাণীর সংগীত বিভাগের স্বল্প মণ্ডলের তাগাদায় পরীক্ষা দিয়ে আমি কালক্রমে আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার ও সুরকারও হয়ে উঠতে পেরেছি।

১৯৯১ সালেই একবার ঠিক করলাম বাংলা ছবির জগতে কাজ খুঁজে দেখব যদি কিছু পাওয়া যায়। ডাক্তার বারিন রায়ের মাধ্যমে অভিনেতা রবি ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একদিন চলে গেলাম রবি ঘোষের বাড়ি। তাঁর মতো স্নেহশীল, ভদ্র মানুষ কমই দেখেছি জীবনে। তাঁকে অনুরোধ করলাম এমন একজন পরিচালকের নাম বলতে যিনি আমাকে দেখামাত্র দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবেন না। রবিদা আমাকে বললেন তরুণ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে। একটি চিঠিও লিখে দিলেন তিনি।

একদিন গিয়ে হাজির হলাম 'এন টি এস'-এ তরুণ মজুমদারের অফিসে। আমার মতো এক অখ্যাত লোককেও তরুণবাবু যেভাবে আপ্যায়ন করলেন তা জীবনে ভোলার নয়। তিনি জানালেন ছবির লাইনটা ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক, আশা বিশেষ নেই। তবু তিনি আমার গানের কিছু নমুনা শুনতে চাইলেন।

আমি চাকরি খুঁজতে যাওয়ার মতো করে আমার অনুষ্ঠানের রিভিউগুলো, মানে '৯১ সালে র পাঁচই মে-র অনুষ্ঠানের বিবরণগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন সেগুলো তরুণ মজুমদার। গানের কোনও ক্যাসেট সঙ্গে ছিল না। বাড়ি ফিরে কিছু গান টেপ করে সেটি দিয়ে এলাম একদিন তাঁর দপ্তরে।

ওমা, '৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন

'প্রথম স্কুলে যাবার দিন' গানটি তাঁর ভালো লেগেছে। তাঁর একটি নতুন ছবিতে তিনি গানটি ব্যবহার করতে চান— সুর একই থাকবে, 'এই শহরে জানে আমার সবকিছু'র জায়গায় শুধু 'সেই শহর' করতে হবে এবং গানের বাকি কথাগুলো পালটে গল্পের প্রয়োজনে অন্যরকম কথা লিখে দিতে হবে। আমি তাঁকে বললাম বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের নিশান তোলা আর ধর্মের ধ্বজা তোলা ছাড়া, পেশাদার সংগীতকার হিসেবে সবকিছু করতে রাজি আছি আমি। অভয় দিলেন তরুণবাবু। বললেন, ছবির সংগীত পরিচালক এমনিতে অজয় দাস। কিন্তু ঐ একটি গানের জন্য তিনি আমায় আলাদা 'ক্রেডিট' দেবেন।

দু-তিনটি খসড়া করার পর অবশেষে তরুণবাবু সন্তুষ্ট হলেন। '৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'রূপায়ণ' স্টুডিয়োয় রেকর্ডিং হল। "প্রথম চোখ মেলার দিন/ প্রথম চিৎকার।" গিটার বাজিয়ে গাইলাম। আমারই করা তিন পার্টের, স্বরলিপি দেখে 'গ্রুপ ভায়োলিন' বাজল। সিন্থেসাইজারে কর্ডগুলো বাজালেন প্রতাপবাবু। আর 'বেস গিটার' বাজালেন—কী আশ্চর্য—সমীর খাসনবিশ। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ডে তিনিই স্প্যানিশ গিটার বাজিয়েছিলেন। কুড়ি বছর পর গানের জগতে আবার ফিরে এসে ছায়াছবির জন্য প্রথম যে রেকর্ডটি করলাম তাতেও পেয়ে গেলাম এই অসাধারণ শিল্পীকে।

আমার এমন কপাল, ছবিটি ('অভিমানে অনুরাগে') শেষই হল না। কাজেই, যাও-বা একটা ছবিতে একটিমাত্র গান করার সুযোগ পেলাম, মানুষের কানে তা পৌঁছোতেই পারল না।

১৯৯১ সালেই শুভেন্দু মাইতি একদিন অন্য একটি কাজে 'গ্রামাফোন কোম্পানি'তে গিয়ে সেখানকার এক কর্মকর্তাকে আমার কথা বলেন। শুভেন্দুদার অনুরোধে আমি আমার কিছু গান ঘরে রেকর্ড করে দিয়ে এলাম সেই কর্মকর্তাকে। তাঁর নাম সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

'এইচ এম ভি'র 'প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন'-এর প্রধান রবি কিচ্‌লু যখন আমায় সাদরে আপ্যায়ন করে জানালেন যে তিনি আমার গান রেকর্ড করতে চান, আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আমার এইসব গান এত বড় একটা সংস্থা সত্যিসত্যিই রেকর্ড করবে, এটা আমি ভাবতেও পারিনি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন রেকর্ড করতে চান তিনি আমার গান। রবি কিচ্‌লু আমায় বলেছিলেন: "আই উইল বি ডুইং আ সার্ভিস টু ইন্ডিয়ান মিউজিক।" কথাটি আমি জীবনেও ভুলব না।

জ্ঞান হবার পর থেকে আমি তো সংগীতের, গানের, বাংলা গানের গোলাম, সেবক। জীবনে যদি একটি জায়গাতেও বিশ্বস্ত থেকে থাকি তো সংগীতেই, গানেই।

বাঙালি হিসেবে আমার গর্ব একটিমাত্র জায়গায়: আধুনিক বাংলা গানের সুরে-তালে-ছন্দে-আঙ্গিকে আধুনিক বাঙালি যে ঔদার্য, যে নেওয়ার ও দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছে সারা বিশ্বে তা তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আধুনিক বাঙালি তার আধুনিক গানে অন্তত শুচিবায়ুর পরিচয় দেয়নি, ধ্বজা তোলেনি কোনও অন্তঃসারশূন্য জাতীয়তাবাদের। আধুনিক বাংলা গানের দেহে সারা বিশ্বের সংগীত এসে মিশে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "যে মন গ্রহণ করিতে জানে না সে মন দান করিতেও জানে না।"— দেশ-বিদেশ থেকে প্রাণভরে গ্রহণ করেছে আধুনিক বাংলা গান। রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের কথা একটু অদলবদল করে আধুনিক বাংলা গান দাবি করতে পারে: 'নিয়েছি যত দিয়েছি তার বেশি।'

আমার হয়ে ওঠার শুরু তো আধুনিক বাংলা গানেই। জন্মের পর থেকে বাবা মায়ের মুখে যেমন বাংলা ভাষা শুনেছি, তেমনি শুনেছি বাংলার আধুনিক গান। রবীন্দ্রনাথের গান, হিমাংশু দত্তর গান, নজরুলের গান, মুখে বোল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠেছি আধুনিক গান আপন মনে।

এই গানের উদার গতিপ্রকৃতি, কথা, ভাব, সুরতালছন্দের বিভিন্ন উপাদান নিজের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার স্বভাব আমাকে ঠেলে দিয়েছে অন্যান্য সংগীতের দিকে। এই গানেরই দেহ থেকে হাতছানি দিয়েছে কখনও কীর্তন, কখনও বাউল, কখনও ভাওয়াইয়া, কখনও রাগের আদল, কখনও বিলিতি সুর। গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—মানুষের মধ্যে অবিরাম মিশেল চলছে। বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই।

আমার গর্ব এখানেই যে আধুনিক বাংলা গান বনমানুষের বিশুদ্ধ অবিমিশ্রতাকে পাত্তা দেয়নি। আধুনিক জীবনের মিশ্র চরিত্র অনুসারে এ-গানের সুরতালছন্দ, আঙ্গিক অবধারিতভাবেই মিশ্র।

এই পাঁচমিশালির মধ্যেই আমার হয়ে ওঠা। আর, আমার হয়ে ওঠা থেকেই আমার গানের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলবে ততদিন।

গান আমি বাঁধি, না-বেঁধে পারি না বলে। চেষ্টা করি, আমার কথাগুলো, ভাবনাগুলোকে গানের দেহে, কথায় সুরে তালে ধরতে। প্রতিটি গানই একটি চেষ্টা। কখনও হয়তো সে-চেষ্টা পাঁচজনের ভালো লাগে, কখনও হয়তো লাগে না।

আমার গান অনেক মানুষ শুনবেন, এ আমি ভাবিনি। তবু শোনাতে চেয়েছি মানুষকে—সংগীত আর মানুষের ওপর ভরসা রাখি বলে। আগেও মনে করতাম, এখন মনে করি যে আমার কোনও গানের একটি অংশও যদি কোনও মানুষকে

এক মুহূর্তের জন্যেও স্পর্শ করতে পারে তো আমার মানবজন্ম সার্থক। এই বিশ্বাস এবং গান বেঁধে-গেয়ে-বাজিয়ে করে খাওয়ার, বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে পেশাদার সংগীত-পরিবেশক হয়েছি। অনেক ভেবেচিন্তে আমার মনে হয়েছিল যে কোনও কিছুই উৎপাদন করতে না জানা এই আমি অন্তত একটি কাজ সেই কাজটির প্রতি সৎ থেকে, অর্জিত শিক্ষার জোরে, নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার দক্ষতা ক্রমাগত বাড়িয়ে করে যেতে পারব।

গান বেঁধে-গেয়ে-বাজিয়ে করে খাওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা গেল গড়িয়ে।

ছেলেবেলা থেকে যাঁদের গান শুনে শুনে বড় হয়েছি আজ তাঁদের অনেকেই নেই। তাঁদের গানগুলো, গাওয়ার ধরনগুলো এখনও কানে লেগে আছে যে! গান গাইতে উঠে সুর লাগিয়েই বুঝতে পারি তাঁদের মতো হয়ে উঠতে পারলাম না আজও। জীবনে একবার যদি পারতাম।

সংগীতের বিন্দুবিসর্গও জানা নেই অথবা ধারণা ও ক্ষমতা খুবই সীমিত এমন কত মানুষ গায়ে পড়ে কত সমালোচনাই না করেন আমার। কত মানুষ গোড়া থেকে ধরেই নিয়েছেন যে আমি কিছু পারি না, কিছু জানি না। কত বিদগ্ধ ব্যক্তি আমাকে খাটো করার জন্য কতরকম কথাই না লিখেছেন, বলেছেন, আরও লিখবেন, আরও বলবেন। কিন্তু তারই মধ্যে যখন দেখি কোনও কোনও মানুষ আমার গানবাজনা শুনছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন তখন মনে হয় আমার গান হয়তো বা কারুর কারুর কাছে হয়ে উঠল। কিন্তু সেই সঙ্গে, এত পরিশ্রম সত্ত্বেও যখন প্রতিনিয়ত ভুল করে ফেলি, নিজের ভুল, অক্ষমতা, ব্যর্থতার নজিরগুলো যখন নিজের কানে ধরা পড়ে তখন মনে হয়—আমার গান হয়তো হয়ে উঠল, আমি হয়ে উঠলাম কতটা?

কবীর সুমনের জন্ম ১৬ মার্চ ১৯৪৯, কটকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি বিভাগে স্নাতকোত্তর। প্রথমে আকাশবাণীতে কর্মজীবন শুরু, পরে একটি ব্যাংকে। এরপর জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেরো বছর বেতার সাংবাদিকতা। ১৯৯১ সাল থেকে পেশাদার সংগীতশিল্পী। প্রবাসজীবন থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলা ও ইংরাজিতে লেখার সূত্রপাত। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোটি।

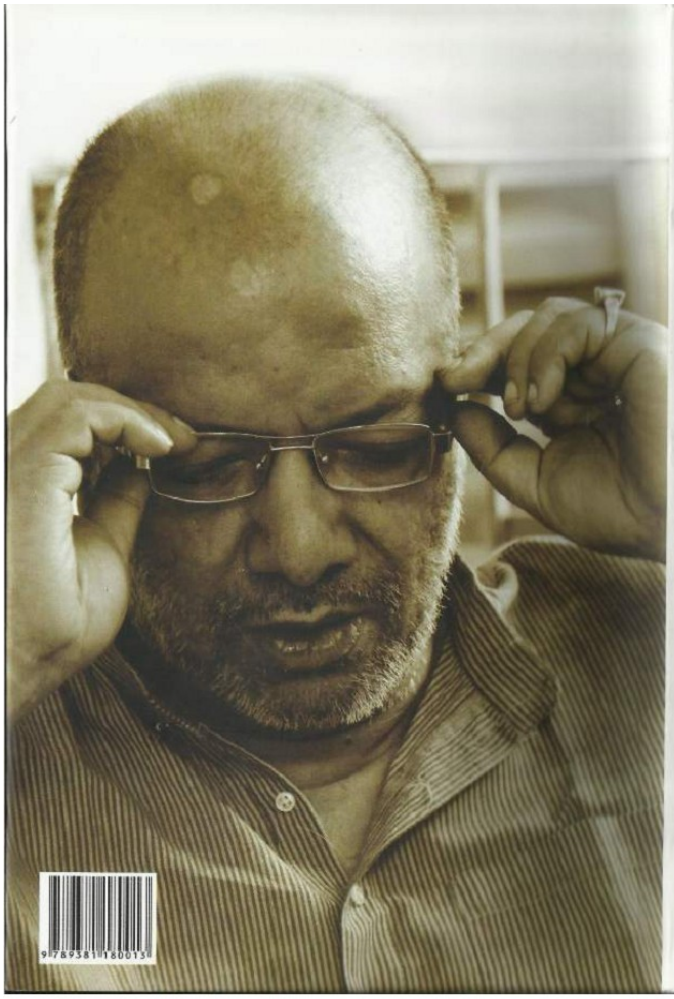

9789381180013

হয়ে ওঠা গান | কবীর সুমন

সপ্তর্ষি

হয়ে ওঠা গান
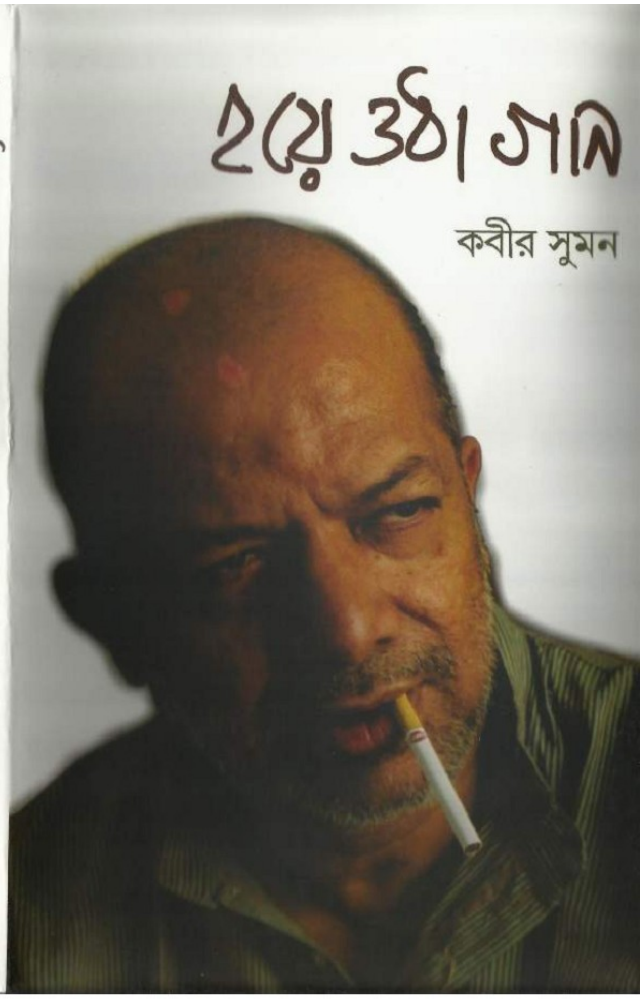
কবীর সুমন